সারস্বত-গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ১৩

শিক্ষা

প্রথম সংস্করণ—বোধন ষষ্ঠী—১৩৩৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—মহাবিষুব সংক্রান্তি—১৩৫৬

সর্ব্বস্বত্ব-সংরক্ষিত ।

প্রকাশক :—স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী
সারস্বত মঠ (আসাম)

সূচী

প্রশস্তি … … …

প্রথম পর্ব্ব—আদর্শ

শিক্ষার লক্ষ্য … ১
শিক্ষার প্রাচীন আদর্শ … ৫
ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা … ৮
সংযম ও তপস্যা … ১৭
শিক্ষায় আধ্যাত্মিকতা … ২৪
তপোবনের শিক্ষা … ২৯
সহজ শিক্ষা … ৩৬

দ্বিতীয় পর্ব্ব—সমস্যা

শিক্ষাসমস্যা … ৪৫
শিক্ষাবিভ্রাট—পরিবারে ৫২
শিক্ষাবিভ্রাট—রীতিতে ৬০
শিক্ষাবিভ্রাট—নীতিতে ৬৭
শিক্ষার গলদ … ৭৫
সন্তানের শিক্ষা … ৮১

তৃতীয় পর্ব্ব—সমাধান

শিক্ষার বনিয়াদ …
আধ্যাত্মিক শিক্ষার পন্থা
শিক্ষায় অন্তর্দৃষ্টি …
শিক্ষায় নবচেতনা …
শিক্ষায় ব্যক্তিত্ব …
শিক্ষার্থীর স্বাবলম্বন …

চতুর্থ পর্ব্ব—প্রয়োগ

শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্য … ১
শিক্ষায় বহিরঙ্গ … ১
শাসনে দ্বিধা … ১
শাসনের স্বরূপ … ১৬
শাসক ও নায়ক … ১৭

মুদ্রাকর :—শ্রীপুলিনবিহারী চাট
এইচ, এস, প্রেস ; কলিকাতা—৩৬

প্রশস্তি

নিঃশব্দে নিজকে দান করতে হবে—এই হচ্ছে আচার্য্যের ব্রত। চারদিক হতে সকল রকম উচ্ছ্বাসকে সংযত করে আনতে হবে, নিজের মাঝে অবিচলিত হয়ে সমস্ত বিক্ষোভ গ্রহণ করতে হবে—এই হবে দিনের পর দিন আচার্য্যের সাধনা।

চারিধারের পারিপার্শ্বিককে এমনি সহজ, এমনি অনায়াস করে তুলতে হবে যে, তাতে ঊষার কিরণস্পর্শে পদ্মকোরক যেমন তার অরুণরাগের দলগুলি মেলে ধরে, তেমনি করে তরুণ জীবনও তার আনন্দের দলগুলি বিকসিত করে তুলবে।

এর জন্য চাই তপস্যা। আবার চিত্তের একাগ্রতা না জন্মালে তপস্যা হয় না। বিচিত্র কর্ম্মের আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হয়েও একটা একাগ্র সাধনাকে সমস্ত দিনের সম্মুখে অবিশ্রান্ত পরম আনন্দে বহন করা—এই হল তপস্যার পরিচয়। এক দিকে তুমি কাজ করছ, আর এক দিকে অন্তরে ভাবব্যূঢ় হয়ে সমাহিত রয়েছ—এ যদি না ঘটে, তাহলে ঠিক কোন পথে যে তুমি চল্‌বে এবং অপরকে চালাবে, তা কিছুতেই ধরতে পারবে না।

আর চাই আনন্দ। ওরে মূঢ়, কেবল কামনা করে, হতাশা নিয়ে এ কূলে তুমি পাড়ি জমাবে? আঘাত করে তুমি ফুল ফোটাবে? তা তো হবার নয়। ব্যথার ভার যে তোমাকেই বইতে হবে। এক হাতে বুক চেপে আর চোখের জল মুছে, আর এক হাতে সত্যের পতাকা নিয়ে তোমায় এগিয়ে যেতে হবে।

যদি এ কথা মনে না ধ্রুব হয় যে, এ জীবনে আর তোমার কোন সাধ নাই, আহ্লাদ নাই—শুধু এই বিলিয়ে দেওয়ার ব্রত,

এই একটী মাত্র ফুলের কলিকে বিশ্বেশ্বরের আলোর ভাণ্ডার হতে প্রসাদ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা—এই তোমার জীবনের একমাত্র কাজ; তবে তোমার সমস্ত চেষ্টাই বিশৃঙ্খল ও বৃথা হবে।

পেছনপানে চেয়ো না মোটেই। যে আনন্দের সঞ্চয়ে তোমার বুক ভরে আছে, সে ফুরাবে না কোনও দিন—যদি অকুণ্ঠিত চিত্তে তা দান করে যেতে পার। তোমার পূর্ণতা নিয়েই তুমি কাজের আসরে নেমেছ, এইমাত্র তোমার ভরসা। তারপর সে আনন্দ যে কি করে কোন্ কাচফলকের মাঝে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়বে—তার ভাবনা তোমার কেন? সে তো আলোই—তার শুভ্রতা যদি বিকৃত হয়, তবে তা রঙ্গের বৈচিত্র্যেই ফুটে উঠবে। এই সত্য, এই তোমার সঞ্চয়। এগিয়ে চল হে বীর!

কিছুতেই তোমাকে দমলে চলবে না—বা আপন ইচ্ছাটাকেই বড় করে দেখলে হবে না। হয়ত তোমার পরিণত চিত্ত যেখানে সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় উৎসাহী হয়ে উঠেছে—সেখানে তোমার অপরিণতচিত্ত অনুবর্ত্তী তার সাধ্যের পরিমাণ ঠিক বুঝতে পারছে না। সেখানে দূর হতে বাক্যবাণে বিদ্ধ করে তো তুমি তার প্রাণ জাগাতে পারবে না; তোমাকেও তার কাজের মাঝে নেমে আসতে হবে—অতি সন্তর্পণ স্নিগ্ধতায়। এমনি করে ভালবেসে, আনন্দ দিয়ে, বোঝা হাল্কা করে, দরকার পড়লে দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে কাজকে দৃঢ় করে নিতে হবে।

কিন্তু এ সমস্ত হল নীতি—সত্যের এরা পোষাক মাত্র। আসল কথা হচ্ছে আনন্দ। যদি নিজকে হারিয়ে ফেল, তবে আনন্দকেও হারাবে। তখন কর্ম্ম হয়ে উঠ্‌বে জঞ্জাল—আর কিছুতেই তা এগুতে চাইবে না।

তাই, যাই কর না কেন, আনন্দের মাঝে যেন কোনও মালিন্যের স্পর্শ না লাগে—এইটাই তোমার সর্ব্বপ্রথম সাধ্য। ভালমন্দ সফলতা-বিফলতা আছেই—শুধু দেখে যাও—রঙের খেলা।

কুঁড়ি পেয়েছ, তাকে ফুলে ফুটিয়ে তুলতে হবে—মাতৃস্নেহের আলোকে। ভেবেছ কি আচার্য্য শুধু পুরুষ? তা নয়; স্নেহে, মমতায়, সেবায় সে যে করুণাময়ী জননী। যারা মা-হারা হয়ে তোমার কোলে এসেছে, তাদের মায়ের অভাব তোমাকে মিটাতে হবে। শুধু কতকগুলি কর্ত্তব্য পালন করেই মনে করো না স্নেহের পরিচয় দিয়েছ। মমতা কর্ত্তব্যেরও বাড়া। আশ্রিতেরা যে তোমার নাড়ীছেঁড়া—এই বোধটুকু যতদিন তোমার সমস্ত কর্ত্তব্যকে ছাপিয়ে না উঠবে, ততদিন নিজকে কেবলি নত করে রেখো, কর্ত্তৃত্বের অভিমানে উদ্ধত হয়ে উঠো না।

যে ভালবাসে সে জানে ভালবাসার দরদ কতখানি। কি করে যে সে নিজকে তার ভালবাসার ধনের মাঝে বিলিয়ে দেবে, তাই তার আকুল চিত্তের একমাত্র ভাবনা। সে ভাবনা যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই অনায়াস, বিরামহীন। জীবে-দয়ার বড়াই করতে পার, কিন্তু সে কেবল নিজকে বাঁচিয়ে সময় মত একটু আহা-উহু করা তো নয়—সে হচ্ছে অহরহ ব্যাকুল বিরহের সন্তাপে দগ্ধ হওয়া। এই দয়া দিয়ে তোমায় বুঝতে হবে, ভগবান জীবকে কতখানি ভালবাসেন—আর সেই ভালবাসার গৌরবে পরকে প্রাণের মমতা বিলিয়ে দিতে হবে।

তোমার ভালবাসা ফুটবে কিসে?—বীর্য্যে। ভালবাসা তো মায়িক কিছু নয়—অন্তরের অনাহত অনাবিল আনন্দ সে। প্রতিদিনের সরল নিষ্ঠাপূর্ণ কর্ম্মের মাঝে সেই আনন্দ যাতে ব্যক্ত হয়ে

তারি জন্ম প্রাণপাতী প্রয়াস তোমায় করতে হবে। যারা কাছে এসেছে—কত দুর্ব্বল তারা, কত নির্ভরশীল। এই নির্ভরতাটুকুকে মমতা দিয়ে সমস্ত কঠিন সঙ্কটে বাঁচিয়ে চলতে হবে—ক্ষমাস্নিগ্ধ সকরুণ ভালবাসার সম্মোহন মন্ত্রে—এ কি তোমার পক্ষে কম পৌরুষের কথা!

শুধু মনে করো না, বাইরে থেকে চেপে ধরলেই তুমি অপরের প্রবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করতে পারবে। তা পারা যায় না কখনই—তাতে অন্যায়ে অন্যায়টাই আরো বেড়ে যায়। কিন্তু ভালবাসার আলো যদি ছড়িয়ে দিতে পার, তাহলে দেখবে, সূর্য্যমুখী ফুলটার মত ওই তরুণ চিত্তগুলিও তোমার চিত্তের পানে মুখখানা তুলে ধরেছে—শাসন দ্বারা যে উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করতে পারনি, সে যেন কিসের সম্মোহনে কোথায় উড়ে গিয়েছে। তাই হৃদয়ে হৃদয়ে যে অমোঘ শক্তির বিদ্যুৎসঞ্চারণ চলতে পারে, সে কথায় বিশ্বাস করে হৃদয় পাবার আর হৃদয় দেবার তপস্যা আরম্ভ করে দাও।

যারা তোমার সহায় হবে, তাদের বীর্য্যবন্ত করে তোল। আগে তারা শিখুক নিষ্ঠা—অভ্যাস তাদের দৃঢ় হোক। তার পর চিত্তে ভাবের বীজ বপন করে দাও—জীবন নিতান্তই বৃথা যাবে না।

মানুষের জীবন নিয়ে, বিশেষতঃ যাদের গড়ন এখনো শেষ হয়নি, তাদের নিয়ে নাড়াচাড়া করাটা যে কত বড় দায়িত্ব—এ বোঝা বইতে হলে যে কতখানি শক্তির প্রয়োজন, আগে তাই বুঝতে হবে। শুধু পড়ানো আর হুকুম হাঁকানো তো নয়—এ যে রীতিমত প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এমনি সন্তর্পণে নিজকে বিলিয়ে দেওয়া যে, যাকে দিচ্ছ, সে কিছুই বুঝতে না পারে। অথচ তোমার আশাটাই যে ফলবে, এমন দুরাশা মনের ত্রিসীমাতেও ঠাঁই দিতে পারবে না—কেননা যা নিয়ে কারবার করছ, তার সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা আর ক'টাই

বা তুমি বলতে পার?—আঁচে আন্দাজে যতটুকু বুঝতে পেরেছ, ততটুকুর উপরেই না তোমার কারিগরি!

নিস্তব্ধ শান্ত করে নিজকে আগে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তারপর অন্য কথা। তুমি তো শুধু আচার্য্য নও—একাধারে তুমি যে এতগুলি প্রাণের শাস্তা পিতা আর ধাত্রী মাতা। হরগৌরীর সম্মিলন যে তোমার মাঝেই সার্থক হয়েছে, এই ভাবটুকু ধরে যদি বহির্জীবনের সঙ্গে অন্তর্জীবনও ফুটিয়ে তুলতে পার, তবে শুধু তৃপ্তি নয়—একটা রসের সাধনার সার্থকতাও তোমার মাঝে অনুভব করবে।

হে আচার্য্য, এই রসময় পুরুষের স্পর্শ—যিনি এক হয়েও চণকবৎ দ্বিদলে বিরাজ করছেন—তাঁর অমৃতময় স্পর্শ তোমার জীবনে তুমি লাভ কর—সে তোমার শুভ্র শুচি ললাটতটে জ্যোতির্ম্ময় রাজটীকার মত জল্ জল্ করে উঠুক—তোমার আগুন ছুঁয়ে হাজার প্রাণে আগুনের হল্‌কা বয়ে যাক।

মহৎ কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে। নির্ভয়ে বুক পেতে দাও। বুক ভেঙ্গে যাবে? যাক না! একদিন তো যেতই—মমতা দিয়ে তুমি তাকে আর ক'দিন বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পার্‌তে? তাই বলি আজ নির্ভয়ে সাহসবিস্তৃত বক্ষপট নিয়ে এসে সম্মুখে দাঁড়াও! তোমার ধৈর্য্যে, তোমার সেবায় জগতের কর্ম্মশৃঙ্খলা কতটুকু নিয়ন্ত্রিত হবে তার হিসাব করো না—তার মাঝে তোমার সার্থকতা নয়। শুধু এই জেনো—তুমি নিঃশেষে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছ, এই তোমার চরম সার্থকতা! তোমাকে যারা পাবে, তারা অন্তরে ধ্রুবসম্পদরূপেই পাবে—বাইরে তার হিসাব যত ছোটই দেখাক না কেন। দেশের সেবা তো এই—এই আত্মপ্রসারণেই তো দেশ জেগে উঠ্‌বে, তোমার প্রাণের বিদ্যুৎস্ফুরণে চম্‌কে উঠবে!

হে আচার্য্য ! স্তব্ধ তুমি—দীপ্ত তুমি। বিদ্যুজ্জ্বালাবিচ্ছুরিত তোমার উদার ললাট—তার মাঝে সন্ধ্যাতারার মত স্নিগ্ধ আঁখি দুটী সুধার স্পর্শে সমস্ত গ্লানি ক্ষয় করে দিচ্ছে—এই তো তোমার মানস রূপ ! জান তো, গহন তোমার পথ—আঁধার তাহে রাতি ! হে সঙ্গীহীন, অনন্তকাল ধরে চিরসঙ্গী যে, তাকেই খুঁজে এসেছ—আজ এই কচি মুখের কমলবনে আবার তাকেই খুঁজে ফিরো—এই তো তোমার ব্রত। যদি কাঁটার ঘায়ে ব্যথা পাও, তোমার নয়ন যদি বা অশ্রুসজল হয়ে ওঠে—হৃদয় যেন তোমার অমৃত ক্ষরণ করে।

দিনের পর রাত্র, আবার রাত্রের পর দিন—এই আবর্ত্তনই প্রকৃতির জপের মালা। এর প্রত্যেকটী অবকাশ তোমাকে অমৃত দিয়ে পুরে দিতে হবে—তোমার আভাস পেয়ে অতি নিবিড় ব্যথাও যেন প্রশান্ত হাসিতে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

দীপালির উৎসব হবে দেশে—সে কোন নবযুগের তোরণদ্বারে ? কিন্তু হে দীপক, সেই উৎসবদিনের আলোক শিখাকেই আজ তোমার ঘরের কোণের এই অনাড়ম্বর মৃৎপ্রদীপের বুকে জ্বালিয়ে তুল্‌তে হবে। এর চেয়ে বড় কামনা আর তোমার জীবনে কি হতে পারে ? খ্যাতির হাটে যারা সস্তা দরে বিকিয়ে গেল, তাদের 'পরে তুমি লোভ করো না—অখ্যাতির আবর্জ্জনার মাঝেই তোমার লুকানো মাণিক ! তোমার অসাধ্যসাধনের ঋণ আনন্দের অফুরন্ত পসরা দিয়েই তোমার অন্তর্য্যামী শোধ কর্‌বেন—কর্‌ছেন। তুমি শুধু তাঁরি দক্ষিণ মুখের হাসিটীর জন্য ঊর্দ্ধমুখ হয়ে থেকো।—তাঁর সাড়া একদিন পুলকে পুলকে সারা গায়ে শিউরে উঠবেই।

শিক্ষা

প্রথম পর্ব্ব—আদর্শ

শিক্ষার লক্ষ্য

প্রাচীন যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল—নিবৃত্তি। এই জন্যই তখনকার শিক্ষাব্যবস্থাতে নিয়ম-সংযমের খুবই কড়াকড়ি ছিল। আজকাল আমরা নিতান্ত বিলাসী হয়ে পড়েছি। শুধু ত্যাগের বুলিতে এখন আর মুখে রুচি হয় না। তাই তার সঙ্গে একটু ভোগের রসান থাকা চাই। ভোগের কথাটা যদি ভাবের আব্রুতে ঢাকতে পারা যায়, তা হলে আরও নিরাপদ। তাই আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাতা বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে—অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ। কথাটাতে মন্দ কিছুই নাই; এ-ও যে মানবজাতির সার্ব্বভৌম আদর্শ হবার যোগ্য, তাতে কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু এর মাঝে একটু ভাবের ঘোর লেগে আছে বলেই ভয়, কে তার কেমন অর্থ করবেন। সন্ধ্যার আবছায়াতে "স্থাণু না পুরুষ"—এ ভ্রম পণ্ডিতেরও হয়ে থাকে। তাই এই অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে কেউ যে প্রবৃত্তির পথ প্রশস্ত করবে না, এমন কথা বলতে পারি না।

একটু ভাবলেই বুঝি, নিবৃত্তির অর্থও যা, অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের অর্থও তা। এর মাঝে একটা উপায়কে প্রকাশ করেছে, আর একটা প্রকাশ করছে ফলকে। যদি বলি, নিবৃত্তি অবলম্বন

করলেই অন্তরের শক্তি ফুট্‌বে, তা হলে সব গোল মিটে যায়, প্রাচীনে নবীনে দ্বন্দ্ব থাকে না। কিন্তু নবীন বোধ হয় এ কথায় সহজে রাজী হবেন না। কেননা ওই নিবৃত্তি কথাটা বড় শুষ্ক, আকাঠার মত; ওর অর্থটা এত স্পষ্ট যে, ওকে ভাবের আচ্ছাদনে ঢেকে রাখা যায় না। কিন্তু "অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ" কথাটার মাঝে অনেক খানি রস আছে, কেননা ওটা ভাবরাজ্যের বস্তু, ওর বাস্তবতা কতটুকু, তার হিসাব আমরা কোনও দিন কষে দেখি না। শক্তির বিকাশ তো আমরা অহরহঃই দেখছি। মানুষ কি না করছে? শিল্প-বিজ্ঞান-কলাতে তার দিন দিন কত উন্নতিই না হচ্ছে। এই-গুলো হচ্ছে মানুষের শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয়। এ পরিচয় এ জন্মে এ জগতে পাচ্ছি। সুতরাং অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ বলতে যদি ঐহিকের পুষ্টি বুঝি, তাতে তো নিতান্ত দোষ হবে না।

নবীন আরও বলবেন, "এর মাঝে যদি কেউ আমাদের ভোগলোলুপতার অপবাদ দেয়, তবে তারও ক্ষালনের উপায় আছে। আমরা বলতে পারব, অন্তর্নিহিত শক্তির স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়, বাইরে তার যতটুকু বিকাশ দেখছি, ততটুকুকেই আমরা শ্রেয়ঃ বলে স্বীকার করছি। কিন্তু তা বলে এ শক্তি যে আধ্যাত্মিকতাবর্জ্জিত, এমন কথাও তো আমরা বলছি না। তবে কিনা আধ্যাত্মিকতার মহিমার চেয়ে আধিভৌতিকতার মহিমা যে সুপ্রত্যক্ষ, আমরা সেই কথাটাই একটু বিশেষ করে বলছি। আধ্যাত্মিকতার বনিয়াদের উপর আমরা অধিভৌতিকতার মন্দির গড়ব। সর্ব্বত্রই বনিয়াদ যেমন চোখের আড়ালে থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাই হবে—আধ্যাত্মিকতা অলক্ষ্যে থেকে আমাদের মাঝে শক্তির সঞ্চার করবে, কিন্তু চর্চ্চাটা আমরা আধিভৌতিকতারই করব।"

নবীন যুগের এই সমস্ত যুক্তির মাঝে যে দুর্ব্বলতা কোথায়, তা প্রাচীনপন্থীর দীর্ঘদর্শী চোখে সহজেই ধরা পড়ে। স্পষ্টই দেখা যায়, ঐহিকের ভোগ আমাদের মুগ্ধ ও লুব্ধ করছে, অথচ চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমরা প্রাচীনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছাড়াতেও পারছি না, কেননা ভারতের আর সব গেছে, এখন কেবল আধ্যাত্মিকতার সুনামটা বজায় আছে মাত্র—অন্ততঃ নিজের কাছে। সুতরাং ভোগের শিক্ষা প্রচলন করাই সঙ্গত বটে, তবে তার উপর এক পোঁচ আধ্যাত্মিকতা থাকা চাই। "শিক্ষা অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ"—সূত্রের এই হল নবীন ভাষ্য।

এখন প্রাচীনের পক্ষ ধরে আমরা দু'টা কথা বলতে চাই। প্রাচীন যে বলেছিলেন, "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"—নিবৃত্তিকেই শিক্ষার লক্ষ্য করে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ দেশে প্রচার করেছিলেন, তার মাঝে কোথাও অস্পষ্ট কিছু নাই। তাঁরাও বলছেন, অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশই প্রয়োজন। কিন্তু তার পথ কি? শক্তির যদি স্বরূপ না দেখতে পাই, তবে কি করে পথ নির্ব্বাচন করব? শক্তির অনন্ত রূপ। তার কোন্ রূপ যে বরেণ্য, তা কি করে চিন্‌ব? ফল কথা, মানুষের শক্তির সীমা কত দূর, তা বুঝে তবে তার পথ নির্দ্দেশ করতে হবে। যদি বুঝে থাকি, জড়রাজ্যের উপর আধিপত্য করাই মনুষ্যশক্তির চরম বিকাশ, তবে তাকে লক্ষ্য করেই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি দেখি, একটা জীবনের মাঝে মানুষ যতটুকু করতে পারে, ততটুকুতেই তার শক্তির সীমা, তবে এই জীবনটাকেই যাতে সকল রকমে শোভন ও উপাদেয় করা যেতে পারে, তার উপযোগী শিক্ষাই প্রচার করতে হবে।

কিন্তু এই জায়গাতেই প্রাচীনেরা একটা নূতন রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁরা দেখলেন, এই যে স্থূলতঃ প্রত্যক্ষ জড় জগৎ,

শুধু এর উপর আধিপত্যই তো মনুষ্যশক্তির চরম সীমা নয়; বা এই একটা জীবনের মাঝেই তো মানুষ চরম পরিণতি লাভ করছে না। মানুষ শুধু জড় জগৎ কেন, অন্তর্জ্জগৎ, বৌদ্ধজগৎ, আধ্যাত্মজগতের উপর পর্য্যন্ত আধিপত্য করতে পারে—সে যেমন বলতে পারে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্", তেমনি আবার এমনও বলতে পারে—"অহং ব্রহ্মাস্মি!" এই মহাসত্যের বিকাশ তার মাঝে হবে। তার জন্য শুধু একটা জীবনই পর্য্যাপ্ত নয়। এই বৃহৎ ভাব ধারণা করবার জন্য যে অভ্যাসের প্রয়োজন, তার উপযোগী অবকাশও তাকে দিতে হবে। তাই তার জীবন জন্মজন্মান্তরে ব্যাপ্ত।

এমনি উদার আদর্শ যদি চোখের সামনে জাগে, শুধু কল্পনায় নয়, এ আদর্শ প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য যদি কারু হয়, তবে সে কি ছোট জিনিষে কখনও তৃপ্ত থাকতে পারে? যে ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ নিজকে এমনি বিরাট ভাবে উপলব্ধি করেছেন, তাঁর প্রাণ জগৎকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে। জগৎ যদি ক্ষুদ্র শক্তির আলোচনায়, ক্ষুদ্র বাসনা-কামনার তৃপ্তিতে মুগ্ধ হয়ে থাকে, তবে তিনি আকুলতাভরা উদাত্তকণ্ঠে তাদের ডেকে বলবেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥

তখন তাঁহার চক্ষে শিক্ষার কোন্ আদর্শ জেগে উঠবে? তিনি দেখবেন—মানুষের অন্তরে ব্রহ্মশক্তি নিহিত রয়েছে, তার বিকাশই তার পরম পুরুষার্থ। তার পথ—নিবৃত্তি; ভূমৈব সুখং—নাল্পে সুখমস্তি। সুতরাং নিবৃত্তিই শিক্ষার নিয়ামক, অল্পের নিরসনে জীবনে ভূমার প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ্য।

শিক্ষার প্রাচীন আদর্শ

জীবনে যাকে ফলিয়ে তুলতে চাই, জীবনের গোড়া হতেই তার ভিত্তি পাকা করে তুলতে হবে এবং প্রথম হতে তা করতে চাইলেই, সাধনার যেটা সরল ও স্বাভাবিক আদর্শ সেইটাকে আবিষ্কার করে, তাকেই বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। এ হতেই প্রশ্ন ওঠে, শিক্ষার প্রাথমিক সরল আদর্শ কি এবং কেমন করেই বা তরুণ-জীবনের সঙ্গে তাকে গেঁথে নেওয়া যায়? প্রাচীন ভারত এই প্রশ্নের মীমাংসা করেছিলেন—**ব্রহ্মচর্য্য ব্রত** দ্বারা। ব্রহ্মচর্য্যকেই তাঁরা জীবনব্যাপী সাধনার প্রথম সোপানরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাতেই মনুষ্যত্বের যা বিশ্বব্যাপী সরল আদর্শ, তাকে অটুট রাখ্‌তে পেরেছিলেন। প্রাচীন ভারত শিক্ষাসমস্যার যে মীমাংসা করেছিলেন, তার চেয়ে সহজ এবং ব্যাপক মীমাংসা মানুষের পক্ষে আর সম্ভবপর হয়নি, একথা এ মত-বিপ্লবের দিনে বললে কে কি ভাবে গ্রহণ করবেন তা বলা শক্ত। কিন্তু তবুও সংস্কারমুক্ত চিত্তে কথাটা আমরা সকলকেই চিন্তা করে দেখ্‌তে অনুরোধ করি। যা সত্য, তাকে কোনও বিশেষ দেশের, সমাজের বা কালের গণ্ডীর মাঝে আটকে রাখা যায় না। যা বদ্‌লায়, তা মানুষের সংস্কার—সত্যের সেটা পোষাক মাত্র। কাজেই আধুনিক সংস্কারের সঙ্গে না মিল্‌লেই যে সত্যকে বর্জ্জন করতে হবে, অথবা পুরাতন পোষাক-শুদ্ধ না পেলে যে সত্যকে পাওয়া যাবে না, একথা কি করে বলা চলে? প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শকে আমাদের এই হিসাবে বিচার করে দেখ্‌তে হবে। প্রাচীন বলেই তা অচল কিম্বা দুঃসাধ্য, এ রকম মনে করাটা কুসংস্কার বই কিছুই নয়।

দেহের উপর আত্মার আধিপত্য স্থাপন করে যে শিক্ষার প্রতিষ্ঠা, আমরা তাকেই সার্ব্বভৌম বলছি, কেননা বিশ্বমানবের জীবন-চেষ্টা ওই একটী সত্যকে লক্ষ্য করে যাত্রা করেছে—অন্য পথ দিয়ে সে আনন্দের কাছে পৌঁছাতে যতই চেষ্টা করেছে, ততই তাকে প্রতিহত হয়ে ফিরে আস্‌তে হয়েছে। জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক ধরতে না পেরে গতানুগতিকতা বা সংস্কারের অনুযায়ী যে সমস্ত বিকৃতির জঞ্জাল মানুষ তার চারিদিকে জড়িয়ে তোলে, সে সকলের ভার মোচন করবার একমাত্র সঙ্কেত রয়েছে আত্মার প্রতি শ্রদ্ধায়। কৃত্রিম জীবনের মাঝেও সে শ্রদ্ধাকে আমরা পোষণ কর্‌ছি, কিন্তু তাকে বুঝতে পারিনি বলে তার সত্যরূপটীকে আমরা এত ভয় পাই। মানুষ যে দেহের মমতায় এত অন্ধ, তা শুধু অভ্যাসের দোষে। গোড়া হতেই যদি দেহের আনুগত্য শিক্ষা না পেয়ে তাকে জয় করবার জন্য চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করবার শিক্ষা আমরা পেতাম, তাহলে শিক্ষা আমাদের পক্ষে সহজও হত, সত্যও হত।

দেহের প্রলোভনগুলিকে জয় করবার শিক্ষাই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্য। স্বেচ্ছায় এদের একবার বাড়তে দিয়ে পরিণত বয়সে যদি আবার দাবিয়ে রাখতে যাই, তবেই ব্রহ্মচর্য্য আমাদের পক্ষে কৃচ্ছ্রসাধন হয়ে উঠবে। মানুষ যে যুগে আরামের লালসায় মুগ্ধ, সে যুগে কৃচ্ছ্রতাকে সে কিছুতেই প্রীতির চক্ষে দেখ্‌বে না। সাধারণতঃ ব্রহ্মচর্য্য বল্‌তে যে একটা বিভীষিকার ছবি আমাদের সামনে জেগে ওঠে আর সন্তানের কল্যাণকামী বাপ-মায়েরা যে সে বিভীষিকা হতে ছেলেমেয়েদের যথাসাধ্য বাঁচাতে চেষ্টা করেন, তার মূল কারণই হচ্ছে বহুদিনের অভ্যস্ত সংস্কার। অথচ ছেলেমেয়েরা বলিষ্ঠ এবং প্রতিষ্ঠ হোক্‌, পিতামাতা যে এ কামনাও না করেন, তাও নয়; কিন্তু তবুও তার বৈজ্ঞানিক উপায় যে ব্রহ্মচর্য্য,

এ কথাটার ওপর তাঁরা তত জোর দেন না। তারপর, শুধু দৈহিক উন্নতির দিক দিয়েই ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠাকে আমরা তত বড় স্থান দিই না। আত্মাতেই আমাদের প্রকৃত বিশ্রাম; দেহের উপরে আত্মাকেই আমাদের জয়ী করে তুলতে হবে। সেজন্য দেহের স্পর্দ্ধাকে কখনও আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি না। অতি শৈশবেই, মনের উপর যখন কোনও কৃত্রিম সংস্কারের ছায়া পড়েনি, তখনই প্রাণের স্ফুরণের কাছে দেহের আরাম আপনা হতেই এমন নুইয়ে পড়ে যে, সংস্কারান্ধ লোক যেটাকে কৃচ্ছ্রসাধন বলে ভয় করে, মানবশিশু সেটাকে মনের আমলেই আস্‌তে দেয় না। এই যে প্রাণের স্বাভাবিক বীর্য্যসিদ্ধি, কৃত্রিম সামাজিক জীবনের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চল্‌লে কালে এটাকে প্রচণ্ড আত্মিক বলে পরিণত করা যেতে পারে। কিন্তু আসল কথাই হচ্ছে—সেই আত্মিক বল। স্বাভাবিক সুরে জীবনকে পরিচালিত করে দেহে অসুরের মত শক্তি সঞ্চয় করা যায়—অসভ্যদের জীবন তার প্রমাণ; কিন্তু ওটাই কখনও মানবজাতির কাম্য নয়। পশুবলকে বিলোপ করে নয়, তাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মবশ করে যে সিংহবাহিনী শক্তির আবির্ভাব, তাকেই জীবনে বরণ করতে হবে। এই জন্য শুধু দেহের বিলাসবর্জ্জনেই ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা নয়—বাস্তবিক তার প্রতিষ্ঠা আত্মশক্তির উদ্বোধনে। দেহ-মন শুধু সে শক্তির বাহন হবে। তাদের অক্ষমতায় যেমন আত্মশক্তির উন্মেষের পক্ষে তারা বাধাস্বরূপ হবে না, তেমনি উগ্র লালসার ধূমে আত্মার আগুনকেও তারা আচ্ছন্ন করে রাখবে না, সম্পূর্ণরূপে তারা আত্মারই অনুগত হবে—ব্রহ্মচর্য্যের এই হল আদর্শ। আত্মাই হল এর লক্ষ্য; তার সঙ্গে যে দেহের সম্পদ্ আর মনের সম্পদ্ এসে জুটবে, সে জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি—তা আত্মারই মহিমা মাত্র।

এই লক্ষ্যটুকু যদি আমাদের সামনে থাকে, আর এই শিক্ষার যেটা উপযুক্ত বয়স, কুশিক্ষায় যদি সেটাকে আমরা নষ্ট হতে না দিই, তবে জীবনের মহিমা অতি সহজ এবং স্বাভাবিক উপায়েই আমাদের ছেলে-মেয়ের মাঝে আমরা ফুটিয়ে তুলতে পারি। শিক্ষার মাঝে এটাই হবে খাঁটী প্রকৃতির অনুবর্ত্তন। এই শিক্ষা-জীবনের বাইরে যে একটা ভোগের জীবন রয়েছে, সেটাকে বর্জ্জন কর্‌তে হবে কি গ্রহণ করতে হবে—সে সমস্যা তো যারা পৃথিবীতে নূতন এসেছে, সেই শিক্ষার্থী শিশুদের নয়। যার মাঝে তারা প্রকৃত রস পাবে, যা সংসারের গহন-পথে তাদের সত্যকার পাথেয় হবে, যা বিশ্বের লক্ষ্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে জীবনকে পরিচালিত করবে, তার পরিচয়ই তো তাদের আগে দিতে হবে। বিচিত্র অবস্থার সঙ্ঘর্ষণে যার উদ্ভব, সেই কৃত্রিম জীবনে তাদের অভ্যস্ত করা কেন? তাকে গ্রহণ করতে হবে কিনা, আর গ্রহণ কর্‌লেও বা কি ভাবে কর্‌তে হবে, সে সমস্যা তাদের বলিষ্ঠ হৃদয়ের নিকট একদিন আপনা হতেই তো উপস্থিত হবে—তখন তারাই স্বাধীনভাবে তার মীমাংসা করবে।

ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা

ব্রহ্মচর্য্যকেই আমরা শিক্ষার ভিত্তি বলেছি। এই ব্রহ্মচর্য্যেরও দুটা দিক আছে, একটা তার সাধনার দিক, আর একটা ভাবের দিক। সাধনার দিকে ব্রহ্মচর্য্যে কৃচ্ছ্রতা আছে, আবার ভাবের দিক দিয়ে তার মাঝে আছে ঔদার্য্যের, মহত্ত্বের হিল্লোল। এ দুটাই আমাদের একসঙ্গে

প্রয়োজন। পূর্ব্বেই আমরা বলেছি, দেহের উপর আত্মার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্‌যাপন। এই জন্য কৃচ্ছ্রতা দ্বারা যেমন দেহের লোলুপতাকে পীড়িত করতে হবে, আবার তেমনি ভাবের মাঝে এমন একটী অবাধ মুক্তির ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে আত্মার যথার্থ মহিমাকে আমরা বাস্তবরূপে অনুভব করবার অবসর পাই। আমরা যে বাস্তবিকই কোনও বন্ধনের মাঝে সঙ্কুচিত নই, জীবনের এই পরম উদার সত্যকে আমাদের বাস্তবের সংসার প্রতিনিয়তই দলিত করে ফিরছে—তাই আমরা সুখ চাই, শান্তি চাই, কিন্তু কিছুই পাই না। বাইরের চেয়েও যে ভিতরে আমরা বড়—শৈশবের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই এই ভাবটা আমাদের মজ্জাগত হয়ে গেলে জীবনের দুর্ব্বিপাকগুলিকে অনায়াস বীর্য্যের সঙ্গে জয় করে সংসারকে সহজভাবে গ্রহণ করবার পক্ষে আমাদের আর কোনও বাধা থাকে না। এই জন্য দেহের ঔদ্ধত্যকে খর্ব্ব করবার জন্য কৃচ্ছ্রতা এবং আত্মার মহিমাকে জাগ্রৎ করবার জন্য ভাবের ঔদার্য্য—এই দুটীকেই শিশুকাল হতে শিক্ষার গতি-নিয়ামক করা একান্ত আবশ্যক।

ভাবের ঔদার্য্য সম্বন্ধে কারও মতভেদ না থাকলেও ব্রহ্মচর্য্যের মাঝে যে কৃচ্ছ্রতার বিধান রয়েছে, তার সম্বন্ধে অনেকের দার্শনিক বা কবিজনসুলভ নানারকম আপত্তি হতে পারে। এ যে শুধু আমাদের অনভ্যাসলব্ধ কুসংস্কার, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু তা ছাড়াও একটা কথা আছে। মানুষের মাঝে গোপন রয়েছেন যে পরম পুরুষটি, তিনি কখনও তপস্যাকে বর্জ্জন করে আত্মপ্রকাশ করেন নি—তাঁর তেজ সর্ব্বজনবরণীয় হলেও দুর্জ্জয় শক্তির দুঃসহ বীর্য্যে স্ফুরিত। সে বীর্য্যের স্পর্দ্ধা আমরাও অন্তরে অন্তরে অনুভব করি বলেই, জগতে যা কঠিন, যা দুর্লঙ্ঘ্য, তাকে উল্লঙ্ঘন করে আমরা

একটা সার্থক উল্লাস আস্বাদন করে থাকি। আরামের নেশায় যতই মুগ্ধ হই না কেন, বিজয়ীর গৌরব যে আমাদের চিত্তকে উন্নমিত করে না, এ কথা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারব না। সুতরাং অন্তরের এই সুপ্ত বীর্য্যের উপর নির্ভর করে কৃচ্ছ্র সাধনার ভিতর দিয়ে অমৃতকে লাভ করাই যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচয়—আর মানুষের মনুষ্যত্ব কখনও তার এই মর্ম্মান্তিক রহস্যের বিরোধী হতে পারে না। এই কৃচ্ছ্রসাধনা যে প্রাণহীন হবে না, তার হেতু হচ্ছে, বাধাবিপত্তিকে বা চিত্তের লোলুপতাকে জয় করবার যে শক্তি আমরা পাই, তা আমাদের অন্তর্গূঢ় আনন্দের উৎস হতেই। চিত্তকে কতকগুলি সাংসারিক প্রয়োজনের কঠিন শিকলি পরিয়ে সঙ্কুচিত করে রাখলে অতি সহজেই সে নির্ব্বীর্য্য হয়ে পড়ে, চারিদিকের অনিবার্য্য বাধা-বিপত্তির তরঙ্গাঘাতে সে দিশেহারা হয়ে ওঠে। এই শঙ্কাকুল, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে অহংসর্ব্বস্বতার ভাবই প্রবল হয়ে দেখা দেয়, এবং তার দরুণ নিজের আমিত্বকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে সম্ভব অসম্ভব সকল প্রকার বিপত্তির হাত হতে তাকে বাঁচাবার চেষ্টাটাই আমাদের উগ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু উদার ভাবের স্পর্শে আমিত্বের সঙ্কোচ যদি কেটে যায়, তাহলে সেই বৃহৎ আমির স্পর্শে নিখিলের সুখ-দুঃখ সকলই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—তখন যে "আমি" আগে কাঙ্গালের মত কেবল সঞ্চয়ের লোভেই দিন কাটাত, সেই "আমি"ই আপনার সঞ্চয়ের ভাণ্ডার উজাড় করে বিশ্বের বুকে বিলিয়ে দিতে চায়—অপরের চোখে যা ক্ষতি, তার কাছে তাই পরম লাভ বলে মনে হয়, আপনাকে রিক্ত করেই সে আপনার সার্থকতা অনুভব করে। আপনাকে ছাড়তে হবে বা পীড়ন করতে হবে—এমনিতর কোন ভয়ই আর তার হৃদয়ের কবাটকে রুদ্ধ রাখতে

পারে না; যে অফুরন্ত আনন্দের লীলা তার মাঝ হতে তখন উৎসারিত হতে থাকে, তাকে জেনেই সে আর—ন বিভেতি কুতশ্চন।

এমনি করে আনন্দ দ্বারাই আমাদের ভয়কে জয় করতে হবে, তাহলেই সাধনার মাঝে কৃচ্ছ্রতা থাকবে না। আর সে আনন্দের প্রধান নিশানা আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে। লুব্ধ, সঙ্কীর্ণ ভোক্তা আমি নই —কিন্তু আমার এই দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি সেই বিরাট পুরুষের ভোগরূপে নিবেদিত হয়ে আছে, আমার কর্ম্মচেষ্টা শুধু আমার মাঝে অবরুদ্ধ না থেকে তাঁর আনন্দ-লীলাতেই প্রাণময় হয়ে উঠ্‌ছে— এই যে বিরাট বোধ, এই বোধে জীবনকে দ্যুতিমান করতে পারলে আর কোন ক্ষতিই আমাদের পীড়িত করতে পারে না, কোন আকাঙ্ক্ষাই লুব্ধ করতে পারে না, কোন ভয়ই আত্মাকে সঙ্কুচিত করতে পারে না। কৃচ্ছ্র সাধনার মূলে যদি এই আত্মবিসর্জ্জনের মন্ত্র না থাকে, তাহলে তাকে চিরদিন বিভীষিকা বলে আমরা মনে করবই এবং তা আমাদের শক্তিকে উদ্বুদ্ধ না করে তার উল্লাসকে আড়ষ্ট করবেই।

গতানুগতিকের মত কেবল কঠোরতা করব বলেই কঠোরতা করা কিম্বা পুণ্যের লোভে বা শাস্ত্রের অনুশাসনে আপনাকে পীড়ন করা কখনই আত্মার পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না—এমন প্রাণহীন সাধনায় আত্মশক্তি কখনও উদ্বুদ্ধ হতে পারে না। যা আমাকে করতে হবে, তা অত্যন্ত সচেতন হয়েই করতে হবে, তার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করে আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা করতে হবে। এই জন্য আমাদের জীবনের লক্ষ্য বৃহৎ হওয়া চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে এই জগৎটাকে বড় করে দেখবার জন্যও দৃষ্টিকে প্রসারিত করা চাই। এই উদার দৃষ্টির মূলেই আনন্দের নির্ঝর। আমরা যাকে সঙ্কীর্ণ করে দেখি, তার সঙ্কীর্ণ কল্পনা আমাদের আত্মাকেও সঙ্কুচিত করে

তোলে, এবং তা হতেই জীবনে দুঃখের সূত্রপাত হয়। তাই গোড়া হতেই জীবনটাকে কৃত্রিম বন্ধন হতে মুক্ত অথচ নিখিল বিশ্বের মর্ম্মগত সার্থকতার সঙ্গে যুক্ত বলে জান্‌তে শিখে সুখ-দুঃখকেও সহজে সহ্য করে আনন্দকে তার উপরে ছাপিয়ে তোলা যায়।

আপনাকে বন্ধনহীন বলে মনে করতে হবে, অথচ বিশ্বের সঙ্গেও আমাদের যোগ থাকবে—এই হল ব্রহ্মচর্য্যজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার প্রধান ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিত সেবার মাঝেই সার্থকতা লাভ করে। তাই দেখতে পাই ব্রহ্মচারীর জীবন প্রকৃত পক্ষে সেবকের জীবন। সেবার অর্থই হচ্ছে আপনাকে উৎসর্গ করে দেওয়া—আপনাকে চালিয়ে নেওয়া শুধু নিজের গরজে নয়, পরের প্রয়োজনে। বিশেষতঃ এই সেবা যখন বিরাট ভাবের ঘনবিগ্রহ কোনও মহাপুরুষের নিকট আত্মবিসর্জ্জনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়, তখন মানুষের হৃদয়ের সজীব স্পর্শে তার যথার্থ কল্যাণরূপটী অতি উজ্জ্বল হয়েই আমাদের মাঝে ফুটে ওঠে। অনাসক্ত হয়ে আমাদের এ সংসারে বিচরণ করতে হবে, অথচ সে অনাসক্তির দায়ে সমস্ত কর্ম্মচেষ্টাকে রুদ্ধ করলেই বা চলে কি করে? কাজেই কর্ম্মকেও অনাসক্তভাবে অনুষ্ঠান করতে হবে। এই অনাসক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানই সেবা; তার মাঝে নিষ্ঠা আছে, ভালবাসা আছে, সমবেদনার দৃষ্টি আছে, মানুষের সঙ্গে সহজভাবে সমান ভূমিতে দাঁড়াবার অবকাশ আছে—অথচ কোন পঙ্কিল আসক্তির বন্ধন নাই। শুধু আপনাকে নিঃশেষে কোথাও বিলিয়ে দিয়েই আমরা এমন অবস্থা লাভ করতে পারি, যার মাঝে আমাদের চিত্তের পুরুষোচিত সকল শক্তিগুলিই স্ফূর্ত্তি পায়, অথচ তারা আমাদেরই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে না। মানুষের যে স্বাভাবিক কর্ম্মচেষ্টা, বিঘ্ন বিপত্তিকে লঙ্ঘন করবার পক্ষে যে স্বাভাবিক বীর্য্যসিদ্ধি, মানুষে-

মানুষে—জীবে জীবে যে স্বাভাবিক মৈত্রীর বন্ধন, এই সমস্ত স্বভাবানুকূল বৃত্তিগুলি সেবার ভিতর দিয়ে আপনা হতেই জেগে ওঠে, অথচ তাদের অতিক্রম করেও সমস্ত সংসার-সম্পর্কের অতীত এক মহান্ আনন্দ-লোকের বিদ্যুচ্ছটা জীবনকে সমুজ্জ্বল করে রাখে।

পূর্ব্বে গুরুগৃহে অর্থাৎ কোনও মহান্ ভাবের কেন্দ্রস্থলে জীবনের প্রারম্ভেই ব্রহ্মচারীর জীবন এই সেবাব্রতে দীক্ষিত হত। শৈশব হতে সে পরের জন্য খাট্‌তে শিখ্‌ত। আবার সে খাটাও শুধু বেগার শোধ দেওয়া নয়, বা আত্মপ্রবঞ্চনের দাসত্ববৃত্তিও নয়; আর সে পরও সর্ব্বপ্রকারে মমত্বসম্পর্কশূন্য, সঙ্কীর্ণ এমন কিছু নয়, যার কাছে আত্মবিসর্জ্জন করলে আমাদের আত্মাকে সঙ্কুচিত করতে হয়। তা ছাড়া, শুধু ভাবের সঙ্গে পরিচয় লাভ না করে ভাবের মানুষের সঙ্গ করতে পারলে, ভাব আরও সহজে আমাদের ভিতর প্রতিষ্ঠা লাভ করে—সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের স্নিগ্ধ সৌকুমার্য্যের স্পর্শে ভাবের সাধনায় সকল প্রকার অস্বাভাবিক উত্তেজনার আশঙ্কা হতেও আমরা সহজে নিস্তার পাই। মানুষকে ঠিক মানুষের যোগ্য শিক্ষা দিতে হলে এই সমস্ত প্রভাব যে কতখানি কার্য্যকরী, তা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন।

সমস্তটা জীবনের একটা সুসঙ্গত পরিণাম হোক্, এটা সকলেরই ইচ্ছা। কিন্তু সে সঙ্গতির জন্য আমরা ঠাঁই রাখি কোথায়? আমরা উপদেশ পাই অনাসক্তির, অথচ কাজে দেখাই ঘোর বিষয়াসক্তি; পরকে আপন করতে হবে, একথা শাস্ত্রে শুনি, কিন্তু কাজের বেলায় বিশ্বজগৎকে ঠেলে ফেলে আপন গণ্ডির বেড়াটাই যথাসম্ভব শক্ত করে তুলতে চেষ্টা করি। আদর্শ বলে আমরা যা পাই, তাকে শিক্ষার অঙ্গ করতে, বাস্তবক্ষেত্রে তার পরিচয় পেতে আমাদের অবকাশ মিলে

কোথায়? অথচ এত সব বিরুদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষার মাঝ থেকেও যে পরার্থপরতা আমাদের কারু প্রাণে জাগে না, তা নয়, কিন্তু সেটা আমাদের জাতীয়জীবনে নিতান্তই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত। এই জন্য এর মাঝে খাঁটী জিনিষটী পাওয়াও বড় দুর্ঘট; কেননা, উত্তেজনা, না গূঢ় স্বার্থ, না আর কোন নিমিত্ত এর জন্ম দিয়েছে, তা কি করে বলা যায়? তাই অনাসক্ত সেবার ভাব যাতে গোড়া হতেই জীবনে বদ্ধমূল হতে পারে, তার একটা সুযোগ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই দিতে হবে। আবার সে সেবা কোনও ভাবঘন বিগ্রহকে আশ্রয় করে অনুষ্ঠিত হলে তবে তা দিয়ে যথার্থ চিত্তের প্রসার হবে। কর্ম্মই জীবনের অনেকখানি জুড়ে থাকবে সত্য; কিন্তু কর্ম্ম যদি উদার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, বিরাট বিশ্বের আমিও একটী অঙ্গ—এই যোগোপলব্ধিকে যদি কেবলই বাধা দেয়, তাহলে জগতে তো কেবল অস্বস্তির ভাবই বৃদ্ধি হবে। এই জন্যই জীবনে চাই সেবা, চাই অনাসক্তি, চাই ভাবুকের সঙ্গ।

আমরা বলতে চাই, সেবার ভিতর দিয়েই ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠে। সেবার মাঝে যেমন কৃচ্ছ্রতা আছে, তেমনি আবার কমনীয়তাও আছে—তা শুধু আত্মনিপীড়নের পক্ষেই মানুষকে সাহায্য করে না, তার আত্মশক্তির স্রোতোবেগকে কল্যাণের পথে, আত্মবিসর্জ্জনের পথে পরাবর্ত্তিত করে দেয়। এই সংযম আর সুষমা—এ দুয়েতেই মানুষের জীবনকে শ্রীসম্পন্ন করে তুলে। কিন্তু এটা হল ব্রহ্মচর্য্যের "হাঁ"র দিক, এর আবার একটা "না"র দিকও আছে। কি করে আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করব, তার সঙ্কেত আমরা এর মাঝে পাই—কিন্তু শক্তির উদ্বোধনের নয়, শক্তির নিগ্রহেরও একটা প্রয়োজন আছে। পরের দাবী যদি আমার কাছে বড় হয়ে ওঠে, তাহলে তার জন্য নিজকে কষ্ট দিয়েও আমরা আনন্দ পাই। কিন্তু মানুষের নিজের দাবীই যে

নিজের কাছে কত সময় কত উগ্র হয়ে দেখা দেয়, সে কথা জীবনের বাস্তব দিকের আলোচনা যাঁরা করেছেন, তাঁরাই জানেন। সুতরাং শক্তিকে সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত করবার সাধ্য যেমন আমাদের থাকবে, তেমন তার উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমিত করবার সামর্থ্যও প্রচুর পরিমাণে থাকবে। ভাবের আবেগে সুশৃঙ্খলা খুবই সুসাধ্য হতে পারে, কিন্তু তার মাঝে নৈসর্গিক বাধাগুলোও যে কখন এসে পড়বে, তারও তো স্থিরতা নাই। বিশেষতঃ যা ভাব, তা হল আদর্শ; ঠিক তাই নিয়েই যে আমি জন্মেছি, তা নয়। বরং জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমি যা পেয়েছি, তা অনেক অংশেই হয়ত এই ভাবের বিরোধী। সুতরাং তাদের দমিয়ে রাখতে হলে ভাবের আদর্শকে যেমন কোনও রকমে চোখের আড়াল হতে দেওয়া উচিত নয়, তেমনি আবার বাস্তবের বিভীষিকাগুলিকেও কঠিন হস্তে নিপীড়ন করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ঐ বাস্তব উৎপাতগুলির দিকেই বিশেষ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে, যাতে আমার ভাবকে তারা পণ্ড করে না দেয়। ভাবকে সামনে রেখে যে বাস্তবকে খর্ব্ব করি, তার মাঝে একটা অনায়াস আনন্দ আছে, কেননা পীড়নের কঠোরতা তখন ভাবাবেশেই লঘু হয়ে যায়। কিন্তু ভাবকে ছাড়িয়েও যদি বাস্তব মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, তখন তো সাক্ষাৎভাবে তারই সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে। তাই কেবল কঠিন দুঃখকে কোমল করবার কৌশলটী আয়ত্ত করলেই আমাদের চল্‌বে না—ব্যথা যতই তীক্ষ্ণ হবে, তার অনুপাতে তিতিক্ষাকেও তেমনি প্রবল করে তুল্‌তে হবে অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবেও কৃচ্ছ তাকে জীবনে ঠাঁই দিতে হবে—অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবেও আত্মপীড়নকে কোনও ভাবের আবরণে আবৃত না করে তার নগ্ন কঠোর মূর্ত্তিতেই তাকে গ্রহণ করতে হবে।

এর জন্যই আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন এবং সে শিক্ষার পত্তনও শৈশবেই কর্‌তে হবে। শুধু স্বভাববশতঃই যে আমাদের কথায়, কাজে, আচারে, ব্যবহারে একটা অসঙ্গতি থাকৃতে পারে, তা নয়। অনেক সময় উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে বা কাজকর্ম্মের ব্যস্ততায় মনের এমন সব বৃত্তি চাপা থাকৃতে পারে, যারা সুযোগমত আত্মপ্রকাশ কর্‌লে পর তাদের স্পর্দ্ধা দেখে আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। তা ছাড়া উচ্ছ্বাসের মত্ততায় অনেক বিকৃতি হয়ত আমাদের চোখেই পড়ে না, কিম্বা তাদের বুঝতে গিয়েও আমরা ভুল করে হয়ত তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে বসি। এই সমস্ত সূক্ষ্ম আত্মপ্রবঞ্চনা বা অতর্কিত মোহের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য আগে হতেই আমাদের আটঘাট বেঁধে রাখা উচিত। এর দরুণ যদি কঠোরতার দিকে একটু বিশেষ করেই ব্রহ্মচারীকে ঘেঁসে দাঁড়াতে হয়, তাহলে তাতে তার উপকার বই অপকার হবার কোনও সম্ভাবনা নাই। অন্ততঃ আর কিছু না হলেও মনের মাঝে সূক্ষ্মজাতীয় কোন বিলাসিতা কোথাও আনাচে কানাচে লুকিয়ে আছে কিনা, সেটাও তার নিজের কাছে ধরা পড়তে পারে। খুব বড় করে ভাবতে গেলে মানুষ যে বাস্তবিকই অমৃতের পানেই ছুটে চলেছে, সে কথাটা নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু তবু ক্রমোন্নতিতে যেটাতে বেশী রকম বিলম্ব হত, সেটাকে সংক্ষেপ রাস্তার নিয়ে আসার জন্যই সাধনা। কাজেই সাধনার গোড়াতেই প্রকৃতি সঙ্গে একটা "যুদ্ধং দেহি"র ভাব দাঁড়িয়ে যায়—এই কথাটুকু স্বীকার করে নিজের প্রকৃতির উপর অকুণ্ঠিত চিত্তে শাণিত অস্ত্র প্রয়োগ কর্‌বার জন্য আমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে—চিত্তকে যেমন কুসুম হতেও সুকুমার, তেমনি বজ্র হতে কঠোরও করে তুলতে হবে।

সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যব্রতে ভাবের মাধুর্য্য আর কৃচ্ছ্রতার কাঠিন্য—এ দুটীকেই বিশেষ বিবেচনা করে অঙ্গীভূত করে নিতে হবে।

সংযম ও তপস্যা

যদি বলি, সংযম ও তপস্যা শিক্ষার মূল, তা হলে কথাটার মানে বুঝ্‌তে আমাদের একটু দেরী হয়—কেননা আধুনিক শিক্ষার কৃপায় ও-দুটীর সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত একটু বিকারগ্রস্ত। দোষটা আধুনিক শিক্ষার উপর চাপাতে চাই এই জন্য যে, সংযম আর তপস্যাও যে অশ্রদ্ধার বিষয়, এ শিক্ষা আমরা বিলাতী কেতাব হতেই প্রথম পেয়েছি। আমাদের আচার-ব্যবহারের মাঝে যে কৃচ্ছ্র সাধনা রয়েছে, তাকে কুসংস্কার বলে ঝেড়ে ফেলবার উপদেশ ওই কেতাবওয়ালারাই প্রথমে আমাদের দিয়েছেন। তার পূর্ব্বে তপস্যা আমাদের জীবনে যতটুকু সত্য হউক না কেন, ওটা যে অশ্রদ্ধার বিষয়, এমন ভাবনা আমাদের মনে স্থান পেত না। বড় জোর নিতান্ত দুর্ব্বলচেতার মত ও যে আমাদের সাধ্য নয়, এইটুকু বলেই আমরা নিশ্চিন্ত থাকতাম। কিন্তু আজকালকার শিক্ষার গুণে সংযমকে উপহাস কর্‌তেও আমরা শিখেছি—কেননা হালে যাঁরা আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার গুরু, তাঁরা উপস্থিত লাভটাকেই বড় করে দেখেন। এমন স্থলে নিজকে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত করবার উপদেশ দিতে যে যায়, তার বিপদ ঘটা বিচিত্র নয়।

কিন্তু কৃচ্ছ্র সাধনার প্রতি মনের এমন বিরূপ ভাব দূর কর্‌তে না পারলে আমরা জীবনের তাৎপর্য্যটাই ধর্‌তে পারব না। এ সাধনাতে যে দুঃখ আছে, এ কথাটাকেই যদি সত্য বলে ধরে নিই, তবুও দুঃখ বলেই জীবনের মাঝে তার একটা স্থান আমাদের নির্দ্দেশ

করতেই হবে। দৈবের কৃপায় যার জীবনে সুখের বরাতটাই খুলে গিয়েছে, এ সংসারে সে-ই আদর্শ, একথা আমরা কিছুতেই স্বীকার কর্‌তে পারি না। যেমন সুখ খুঁজে বেড়ানোটাই জীবনের উদ্দেশ্য নয়, তেমনি কেবল দুঃখ পাওয়াটাই সব সময়ে বরণীয় না হতে পারে। জীবনকে শক্ত কর্‌তে হলে সুখের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে দুঃখের খাদও মিশাতে হবে। সুখদুঃখ দুটাই জীবনে আসবে বটে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য থাক্‌বে অন্তঃশক্তির প্রভাবে এ দুয়েরই ঊর্ধ্বে নিজকে স্থাপন করা। আর তা করতে হলেই, এমন অনেক নিত্য-পরিচিত বিষয়ের প্রতি আমাদের মমতা ত্যাগ কর্‌তে হয় যে, অল্পবুদ্ধি মানুষ তার কথা শুনলেই আঁৎকে ওঠে। কিন্তু তা বলে যা সত্য, তা থেকে নিজকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌লে শেষে ঠক্‌তে হবে যে আমাদেরই। একটা বৃহৎ কিছু লাভ করব বলে ছোটর প্রতি মমতা যদি আমাদের ছাড়তে হয়, তাহলে স্বেচ্ছায় সে দুঃখ মাথায় তুলে নেবার শ্রদ্ধাটুকু চাই। কৃচ্ছ্র সাধনায় যদি কোনও দুঃখের বিভীষিকা থাকে, তাহলে তা হচ্ছে এই অল্পকে তুচ্ছকে ত্যাগ করবার দুঃখ। এই দুঃখটুকু স্বীকার করে নিতেই হবে এবং আনন্দে অমৃতে তার রূপান্তর ঘটাতেই হবে—নইলে জীবনের মাঝে যে বৃহৎ কোনও সত্যের ইঙ্গিত রয়েছে, তা কোথাও আমাদের চোখে পড়বে না।

খাই-দাই, রোজগার করি, অবসরমত একটু আধটু Charityও করি, এতেই জীবনের সব দায়িত্ব মিটে যায় না। এ হচ্ছে গতানুগতিকের পন্থা। এ পথে চলতে গেলে ভাবনা চিন্তার কোনও ধার ধারতে হয় না। কিন্তু না ভাবলে জীবন ফুটবে কি করে? আর ভাবতে গেলেই তো দেখব, গতানুগতিকের বিধান আমাদের জন্য যে পথ কেটে রেখেছে, তার সবটুকুই সত্যের সঙ্গে রেখায় রেখায়

মিলে না। তখন যদি গতানুগতিকের পথ ছেড়ে সত্যের পথ ধরতে যাই, তা হলে সংসারের সঙ্গে আর বনবে না—বাধ্য হয়ে তার কিছু না কিছু তখন ছাড়তেই হবে। এই যে ভাবনা-চিন্তার ফলে কিছু ছাড়তে হয়, এটাই হল তপস্যার ভিত্তি। এই ভাবনাটুকু থাকলেই আর নিজের ক্ষুদ্রত্বকে আঘাত করতে মমতায় কোথাও টান পড়ে না—বাইরের লোকে যাকে বলে দুঃখ, সেটাও তখন নিজের কাছে সহজ বলেই মনে হয়। সংযম আর তপস্যার নামে যে আমরা ভয় পাই বা চটে উঠি, তার কারণ এই যে আমরা জীবনকে তলিয়ে এ দুয়ের স্বরূপ বুঝতে চাই না—আমরা ভাবনা-চিন্তা করতে নারাজ। নইলে দুঃখ সইতে যতটুকু নিরঙ্কুশ আনন্দ, নিরবচ্ছিন্ন সুখের মাঝে ততটুকু আনন্দ নিশ্চয়ই নাই।

ভাবতে শিখাটাই জীবনের একটা মস্ত বড় কর্ত্তব্য। যে পরিমাণে মানুষ ভাব্‌তে পারে, সেই পরিমাণ বাইরের বাধাকে সে জয় কর্‌বার শক্তি লাভ করে। যে সমস্ত কঠিন বিধিনিষেধের বাঁধন দিয়ে মানুষ বহির্ম্মুখীনতাকে সংযত কর্‌বার চেষ্টা করে, তা যদি তার মন থেকে জন্ম নেয়, তাহলে তার মাঝে দুঃখ বলে কিছুই থাকে না। কিন্তু মনের যেখানে যোগ নাই, বাইরের আঁটা-আঁটিটা সেখানে নিজেও যেমন ব্যর্থ, দেখ্‌তেও তেমনি কুৎসিত। আমাদের আচার ব্যবহারে গলদ এইখানেই। আপন ঘরে খোঁজ করে দেখছি, ভাণ্ডারে বিফলতা আর দৈন্য ছাড়া আমাদের পুঁজি কিছু জমেনি। তাই আপনাকে সার্থক করবার আকুল তৃষ্ণায় আমরা চাইছি—শক্তি। কিন্তু সে শক্তি কি বাইরের দান? বাইরের দানের ভরসা কি? যা লাভ কর্‌তে হবে, তা অন্তরের শাশ্বত সম্পদরূপেই লাভ কর্‌তে হবে। তা হলেই আবার ঘুরে ফিরে সেই ভিতরের দিকেই মুখ ফিরাতে

হয়—আবার সেই মননের ভিতর দিয়ে প্রাণশক্তিকে অর্জ্জন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে হয়।

অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিকে ফুটিয়ে তুল্‌বার পথই হচ্ছে সংযম ও তপস্যার ভিতর দিয়ে। তরুণ জীবনের সম্মুখে এই আদর্শই আমাদের উজ্জ্বল করে ধরতে হবে। তার জন্য চাই, নিজকে বড় করে জানা —এত বড় করে জানা যে, অতি ক্ষুদ্রতম পরমাণুটুকুও সে বৃহত্ত্বের মাঝে উজ্জ্বল হয়েই স্থান পায়। যথার্থ শক্তি এই পথেই মিলে—এর সঙ্গে জগতের কোন বস্তুরই বিরোধ হতে পারে না। এই নির্ব্বিরোধ পরম প্রশান্ত ভূমি হতে যে কর্ম্ম আমরা স্পর্শ কর্‌ব, তাই মহিমায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে।

তার জন্যই খুব গভীরভাবে তলিয়ে সব দিক থেকে নিজকে নেড়ে-চেড়ে দেখ্‌তে হবে। তার ফলে নিজের মাঝে যেটুকু ক্ষুদ্রতা বা দুর্ব্বলতা খুঁজে পাওয়া যাবে, সেইটুকুর সঙ্গেই সবার আগে লড়াই কর্‌তে হবে। এই লড়াইটাই সংযমের আরম্ভ। প্রথমতঃ আত্মশাসনটা চলে নীতির উপর দিয়ে, কিন্তু ক্রমে তা অন্তঃকরণের নীচের কেন্দ্রগুলি ছেড়ে ক্রমেই উপরে গিয়ে পৌঁছায়। এমনি করে যখন অহংএর সঙ্গে লড়াই বেধে যায়, সংযমের শক্তি তখনই ফুটে উঠে।

অহং-ই হচ্ছে আমাদের সকল দুর্ব্বিপাকের গোড়া। অভিমান নিয়ে যা করি, তাতে শক্তির অভিনয় করা হয় বটে, কিন্তু তার প্রাণভরা পরিচয় কোনও দিনই মিলে না। তাতে মূঢ় গতানুগতিকের ভার বহন করাটা অভ্যস্ত হয়ে যায় সত্য, কিন্তু ভারের অস্বস্তি হতে তো বাঁচ্‌বার কোনও পথ থাকে না। তাই নিজের ভিতর একবার তলিয়ে গিয়ে একেবারে প্রাণের ভিত পর্য্যন্ত খুঁড়ে দেখ্‌তে হয়,

সেখানে বালি না পাথর। অন্তরের শক্তি জাগাবার জন্য যদি সংযমের প্রয়োজন হয়, তাহলে তার পথটাও অন্তরের ভিতর দিয়েই করতে হয়—নইলে বাইরে থেকে ঠেকা-ঠোকা দিয়ে তা করতে গেলে কেবল আত্মপীড়নই সার হয়। আত্মানুসন্ধানের প্রগাঢ়তার সঙ্গে যোগ রেখে যে সাধনাই করি না কেন, তার মাঝে কষ্টসাধ্য বলে কিছু দেখতে পাব না। কাজেই ভিতরের সঙ্গে সুর বজায় রেখে সংযমের যে সাধনা, তা সহজ জীবনেরই সাধনা।

নিজকে বাঁধতে হবে—তার জন্য নিজকে খুঁজতে হবে। কিন্তু এ খোঁজাও বাইরের খোঁজা—এর দৌড় অভিমান পর্য্যন্ত। নিজের সঙ্গে সুর ঠিক রেখে যদি নিজকে বাঁধতে পারি, তাহলে আবার আর একরকমের খোঁজা আরম্ভ হবে—সেই খোঁজাই হল তপস্যা। আগে ভেবেছি, শুধু নিজের জীবনের বাস্তব দিকটার কথা; এইবার দেখতে হবে, সকল বাস্তবের আড়ালে কোন্ পরম সত্য লুকিয়ে থেকে জীবনে রসের যোগান দিচ্ছে। এ খোঁজা যেন সন্ধিহীন অনন্তপ্রসার প্রান্তরপথে যাত্রার মত—চারদিক থেকেই আনন্দভরা আলোর পরশ পাচ্ছি, কিন্তু তবু এখনো যেন তার মর্ম্ম-উৎসটীর কূলে পৌছাতে পারিনি, তাই ঔৎসুক্যে আকুলতায় পথ চলেছি। এ চলায় ব্যাকুলতা আছে কিন্তু আশঙ্কা নাই—মর্ম্মের গোপনে গোপনে তার আনন্দ সঞ্চারিত করে সকল বাধার ওপরই এ অন্তরকে জয়যুক্ত করেছে। পাওয়ার জন্য যে এমনি ঐকান্তিক মর্ম্মবাহী আনন্দসমুজ্জল প্রচেষ্টা, তাই হচ্ছে তপস্যা। যদি সংযমে শক্তি জেগে থাকে, তাহলে এ তপস্যার মাঝে বিন্দুমাত্র দুঃখ কষ্ট বা সঙ্কোচের ঠাঁই থাকবে না, কেননা দুঃখকষ্টের বা সঙ্কোচের নিমিত্তগুলির বাসা বাইরে; বাইরে থাকতেই যদি তাদের উপর হাত পড়ে, তাহলে ভিতরে আর

তাদের স্পর্দ্ধা প্রকাশ হবার সুযোগ থাকে না। কিন্তু তাই বলে বাইরের আর ভিতরের কাজগুলির মাঝে যে একটা বাস্তবিক ভাগাভাগি রয়েছে, তা-ও নয়। তপস্যার মাঝে সংযম যেমন জল-জল করতে থাকবে, সংযমের সাধনায়ও তেমনি তপস্যার আনন্দময় সুরটী সকল সময় বাজতে থাকবে। এর উভয়েরই তাৎপর্য্য হচ্ছে জীবনকে বড় করে দেখা, অর্থাৎ তাকে সাধারণ্ দৃষ্টির উলটা দিক হতে দেখা। অপ্রবুদ্ধ চিত্ত যে বাইরে শক্তির জাঁক দেখায়, সেটা ভূমা, আসল শক্তি বাইরের সঙ্কোচে, অন্তরের সংহতত্বে। সংযম আর তপস্যাতে এই সত্যই জীবনে প্রত্যক্ষ হবে। খোলা হাওয়ায় প্রদীপের পল্‌তে ধরিয়ে দিলে আলো যতটুকু হয়, তার অনুপাতে ধোঁয়া আর কালির পরিমাণটাই হয় বেশী। কিন্তু সেই আলোতেই স্বচ্ছ একটি চিমনী পরিয়ে দিলে ধোঁয়া আর কালিটাও পুড়ে গিয়ে আলোর শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে। জীবনকে বাঁধবার তাৎপর্য্যও এই। বেঁধে আমরা তাকে কুৎসিৎ করব না—তার সৌন্দর্য্য আরও বেশী করে বিকশিত করে তুলব। এই বিশ্বসংসারকেও ভগবান্ এমনি করে সত্যের শৃঙ্খলায় সুন্দর করে বেঁধেছেন—তাই সত্যের মাঝে থেকে এর নিজকে ফুটিয়ে তুলবার কৌশল যুগে যুগেই সার্থক হয়ে উঠছে। যদি এই কল্যাণের বন্ধন জগতে না থাকৃত, তাহলে প্রবৃত্তির অন্ধতাড়নায় এ জগতে প্রাণময় সৌন্দর্য্য লাঞ্ছিত পরাভূত হয়ে থাকৃত। যেমন করে ভগবান্ এই জগৎকে বেঁধেছেন, তেমনি আমাদের নিজকে বাঁধতে হবে—তবেই তাঁর শক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ হবে—তাঁর সত্যে, জ্ঞানে, আনন্দে আমরা তাঁর সঙ্গে এক হতে পারব।

জীবন যখন সবে ফুট্‌তে আরম্ভ করে, তখন কি করে সংযম আর তপস্যার শিক্ষা সহজ হয়, সেটাই বিশেষ ভাববার কথা।

আমরা বলি, ভালবাসার সোণার কাঠি ছুঁইয়ে সেখানে সংযম আর তপস্যার ভাব জাগাতে হবে। ভালবাসার মাঝে একটা মস্ত সঞ্চারক শক্তি রয়েছে; একটা ফল বা ফুল যেমন হাতে ধরে একজনকে দেওয়া যায়, ভালবাসার মাঝ দিয়ে তেমনি অধ্যাত্মসম্পদও একজনের ভিতর হতে আর একজনের মাঝে সংক্রামিত করা যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এমনি গুরু হতে শিষ্যে আচার্য্য হতে ছাত্রে প্রাণের আলো ঢেলে দেওয়া যায়—শুধু ভালবাসার জোরে। এ যেমন নিজকে আর একজনের মাঝে পূরে দেওয়া। তার জন্য দাতা সম্পূর্ণ আত্মস্থ হবে —নিজকে বিপুল শক্তিতে কেন্দ্রে সংযমিত করে, বিপুল বীর্য্যে অপ্রতিহত প্রেমে আগুন-শিখার মত পরিধির দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। বাইরের বিধিনিষেধ আর অনুশাসন যে এ ক্ষেত্রে থাকবে না তা নয়; কিন্তু প্রাণের জোরটাই হবে তার চেয়ে বেশী। আর তরুণের মাঝে এ সম্পদ সঞ্চারিত করতে হলে প্রবীণের সাধনা একবারে অকুণ্ঠিত নিষ্কলুষ হওয়া চাই; তাঁকে এমনি হতে হবে যে, সংযম যেন তাঁর কাছে স্বরূপভূমিতে অনায়াস বিশ্রামের মত, তপস্যার দীপ্তি যেন তাঁর অন্তরে বাহিরে সমুজ্জ্বল। এমনি হলে ভালবেসে তিনি তরুণকে যা দিতে যাবেন, তাঁর প্রাণের দান হবে বলেই তা তরুণের প্রাণকেও আনন্দস্পর্শে সঞ্জীবিত করে তুলবে। এই দানই হচ্ছে সাধনার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা, অথচ এ দান সঙ্কল্পহীন, স্বতঃ-উৎসারিত। সংযমী আর তপস্বী যদি প্রাণের দানে এমনি করে শিক্ষার মন্দিরকে পবিত্র করে তোলেন, তাহলে সত্য আর শক্তি সেখানেই জেগে উঠবে। শিক্ষার মাঝে ভূমার আলো এসে পড়ুক—স্নিগ্ধ, প্রশান্ত, অপ্রতিহত দীপ্তিতে—তবেই শিক্ষা ধন্য হবে।

শিক্ষায় আধ্যাত্মিকতা

আজকাল দেশের অধিকাংশের মতে শিক্ষার অর্থ লেখাপড়ার চেয়ে বেশী কিছু নয়। কেউ কেউ মানবজীবনের বিচিত্র চেষ্টাগুলিকেও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিক্ষার সামিল করে নেবার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু তবু মনে হয় গোড়ার গলদের দিকে এখনো কারু তেমন করে নজর পড়েনি। মানুষের জীবনটাকে কেটে ছেঁটে খুবই খাটো করে দেখার অভ্যাস আমাদের সবারই মজ্জাগত। জীবনের আদি আর অন্ত বাদ দিয়ে উপস্থিত তাড়াহুড়োর সময়টা ধরেই যদি তার বিচার করতে যাই, তাহলে তার আসল উদ্দেশ্যটাই ঢাকা পড়ে যায়। তা ছাড়া তাড়াহুড়োর মাঝে থেকে আমরা যে আদর্শ রচনা করি, সেটাও সঙ্কীর্ণ ও অব্যবস্থিত হয়ে পড়ে। জীবনের এমনিতর ক্ষুদ্র আদর্শকে সামনে রেখে শিক্ষার যে ছকটা আমরা আঁক্‌ব, তা দিয়ে মানুষকে সব দিক থেকে ফুটিয়ে তোল্‌বার আশা কখনই করা যেতে পারে না।

আমাদের ধরণটাই হয়েছে উল্টো। এমন কি বৈচিত্র্যকে যেদিন জীবনে স্বীকার কর্‌তে শিখেছি, সেদিনও আমরা বৈচিত্র্যকে কেবল বৈচিত্র্য হিসাবেই দেখেছি—তার মূলে কোনও ঐক্য আছে কিনা, তার সন্ধান নিইনি। শিক্ষার মাঝেও বৈচিত্র্যের গবেষণা করে, রকমারী নিয়ম খাটিয়ে, মনস্তত্ত্ব ঢুকিয়ে আমরা নূতন একটা কিছু খাড়া কর্‌তে চাইছি বটে কিন্তু ঐক্যবোধের অভাবে সে চেষ্টাও সফল হচ্ছে না। বৈচিত্র্য, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব সবই থাক্‌বে, কিন্তু

তাদের দেখতে হবে ঠিক তাদের মাঝে থেকে নয়—দ্রষ্টার মত বাইরে থেকে। শুধু শিক্ষার বেলায় নয়—সমস্ত জীবন সম্বন্ধেই আমাদের ওই কথা। ঘূর্ণিপাকের মাঝে ঘুরপাক খেতে খেতে গতির নিয়ম আবিষ্কার করাটা শক্ত; জীবনের সমগ্র রহস্যটুকু জানতে হলেই তার খণ্ড অংশগুলি হতে নিজকে দূরে সরিয়ে নিতে হয়।

শিক্ষায় পূর্ণতা খুঁজতে গেলে আমাদের সকল প্রয়োজনের গণ্ডী পার হয়ে একেবারে মূল শক্তি আর আনন্দের উৎসে অবগাহন করতে হবে। এই উৎস আত্মা; এঁকে আগে স্বীকার করে তারপর যদি বৈচিত্র্যের বিজ্ঞানকে শিক্ষায় জীবনে প্রয়োগ করতে পারি, তবেই আমরা পূর্ণ রস, পূর্ণ আনন্দ পাব। বৈচিত্র্য তখন জীবন থেকে বাদ পড়বে না, আবার অর্থহীন আতিশয্যে জীবনের পক্ষে গুরুভার হয়েও উঠবে না। যদি জিজ্ঞাসা কর, যাঁকে ধরে আমরা শিক্ষাকে বা জীবনকে উৎসারিত করব, সেই আত্মা কি, তা হলে এক কথায় তাঁর সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন হবে। এর জন্য যে অনুসন্ধান, যে আকুলতা প্রয়োজন, তা প্রত্যেকের পক্ষে ব্যক্তিগত সাধনার বিষয়। চোখ বুজে থেকে যদি আবদার কর, আমায় আলো কি বুঝিয়ে দাও, তাহলে হাজার জন বৈজ্ঞানিক এসেও তো তোমায় বোঝাতে পারবে না। তেমনি এই আত্মতত্ত্ব।

আমরা বললাম, এঁকে ধরে শিক্ষার পত্তন করতে হবে—কিন্তু এ বলাটাও কেবল দিগ্‌দর্শন মাত্র। আমাদের মন অন্তর হতে বিমুখ হয়ে বাইরের দিকে ফিরে রয়েছে, তাকে শুধু ভিতরের দিকে তাকাতে আমরা বলছি—আর বলছি, এই অন্তরের অন্তরে যিনি রয়েছেন, তাঁকে জেনে তাঁকে মেনে তবে বাইরের অন্য কাজ। এঁর নাম শুধু বলেছি আত্মা; কিন্তু এঁকে বুঝতে হলে কেবল কথার ভরসা করলে চলে না—

নিজের জিজ্ঞাসাকে তার জন্য জাগ্রৎ করতে হয়। আত্মশক্তির কেন্দ্র হতে যদি আমরা শিক্ষার পত্তন করতে চাই, তাহলে স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছি, শুধু বিজ্ঞানের আইনে আর শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করা চলে না —বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম ছেড়ে শিক্ষা তখন ব্যক্তিগত সাধনার ক্ষেত্রে এসে পড়ে। কি শিক্ষায়, কি জীবনে ব্যক্তিপ্রাধান্যই আমরা সবার আগে চাই, যদিও সেটা সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্ব নয়—সে কেবল একটা কেন্দ্র ধরে পরিধির দিকে আত্মপ্রসারণ। এমনিতর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের উপর শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হলেই শিক্ষা আন্তর ব্যাপারে পরিণত হবে—আত্মার সঙ্গে তার যোগ তখনই সম্ভবপর হবে।

কি করলে যে শিক্ষার ভিত্তি আধ্যাত্মিক হবে, তা হয়ত সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা ধরতেই পারব না। এ সম্বন্ধে উপনিষদের প্রাচীন কাহিনীর কথা আমাদের মনে পড়ে। শিষ্য সমিৎপাণি হয়ে আচার্য্যের কাছে এলেন, ব্রহ্মবিদ্যা লাভের আশায়—আচার্য্য তাঁকে কতকগুলি গরু দিলেন চরাবার জন্য—বলে দিলেন, এ গুলো হাজারের ঘরে না উঠ্‌লে ফিরে এসো না। শিষ্য তাই স্বীকার করে গরু নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর কতদিন চলে গেল। একদিন পালের প্রধান ষাঁড়টা শিষ্যকে ডেকে বল্‌ল, আমরা তো হাজারটা হয়েছি, এইবার আমাদের আচার্য্যের কাছে নিয়ে যাও; তা ছাড়া আমি তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদের কথা বল্‌ছি; মদ্‌গু নামে এক পাখীর কাছে তুমি আর এক পাদের কথা জান্‌তে পার্‌বে। এই বলে ষাঁড়টা শিষ্যকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিল।—

এমনি করে কাহিনীর সূচনা। আজকালকার লোকে হয়ত একে উপহাসই করবে; কিন্তু আমাদের মনে হয়, ঐ যে আচার্য্য ব্রহ্মবিদ্যার একটা কথাও মুখে না বলে শিষ্যকে গরু চরাতে পাঠিয়ে দিলেন, আর

শিষ্যও দ্বিধাহীন চিত্তে তাই মেনে নিলেন, আর তা থেকে বিনা মুখের কথায় ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ শিষ্যের মাঝে ফুটে উঠ্‌ল, এর মাঝে এমন একটা গূঢ় রহস্য রয়েছে, যার মর্ম্ম ঠিক বিজ্ঞানের বিধানে বা মনস্তত্ত্বের আইনে ধরা পড়ে না। এই রহস্যনিবিড় শক্তি-সঞ্চরণটুকুই আধ্যাত্মিকতার প্রাণ। শিক্ষার মাঝে আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা এই দিক থেকেই আসবে—তার জন্য সরকার ইস্কুল কলেজে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করলেন কি না করলেন, সে তর্ক তোলবার প্রয়োজন মোটেই নাই। আসলে এ ব্যাপারটাই সংসারভূমির কথা নয়। তা বলে এটা একটা আজগুবি কিছুও নয়। এই যে চির-রহস্যে ঢাকা অথচ প্রতি মুহূর্ত্তে সচেতন পরম তত্ত্ব—এর কথা আর কি করে মুখ ফুটে বলা চলে? এ কথা যারা বল্‌বে, যারা শুন্‌বে, তাদের স্তব্ধ হতে হবে।

অজানার দীক্ষা মিলে মানুষের কাছে নয়—অতিমানুষের কাছে। মানুষের সাড়া প্রাণের মাঝে পাই—কিন্তু অতিমানুষের স্পর্শ একেবারে প্রাণ মন ছাপিয়ে ওঠে। তাঁর প্রেরণায় আমাদের মাঝে যে সৃষ্টির লীলা চলে, তা বুঝি আমাদের নিজের কাছেও সঙ্গোপন, রহস্যময়। শিক্ষার ভূমিতে যদি এই অতিমানুষের বিভূতি নেমে আসে, তাহলে আর তার মাঝে আড়ম্বরের কিছুই থাকে না—জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তই তখন আনন্দরসে নিবিড় হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই অনুভূতিকে জাগাবার উপযুক্ত ক্ষেত্র কোথায়?—যেখানে ঈর্ষ্যা-দ্বন্দ্বের কোলাহল, অপ্রবুদ্ধ সংস্কারের ভ্রূকুটী—সেই "অগ্নিপরীতং গৃহমিব" কৃত্রিম লোকসমাজের মাঝে?—না, এর জন্য চাই শান্ত সুসমাহিত তপোবন। সে তপোবন শুধু ভাবুকের কল্পনা নয়—মর্ত্ত্য মানবের অনধিগম্যও নয়। মানুষ সেখানে রয়েছে, কিন্তু কৃত্রিম সংস্কারের বাঁধনে আপনাকে সে অচল করে ফেলেনি—সরল উদার

উন্মুক্ত প্রাণের উদ্বোধনে সেখানে আপনাকে সে আপনার মাঝে ফিরে পেয়েছে। শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এর মাঝেই আমাদের গড়্‌তে হবে; বাস্তবের জড়ধর্ম্মী আইনের চেয়ে অতিমানুষের প্রাণময় স্পর্শকেই আমরা বড় বলে জান্‌ব।

ভারতবর্ষ যে একদিন তার শিক্ষার মন্দিরকে তপোবন করে তুলতে পেরেছিল, তাতেই সে আপনার মাঝে এমন কিছু সম্পদ সঞ্চয় করেছিল, যা জগৎকে দেবার অপেক্ষায় সহস্র নির্য্যাতন সয়ে আজ পর্য্যন্ত তাকে বেঁচে থাক্‌তে হয়েছে। লোকাতীত কিছু যে তার মাঝে আছে, এ আর তার স্পর্দ্ধা নয়—এ তার অন্তশ্চর জীবন্ত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে সফল কর্‌বার সাধনাই আমাদের বর্ত্তমান যুগের একমাত্র লক্ষ্য।

শিক্ষার ভিতর দিয়েই এ সাধনা সফল হবে। যত আয়োজন আড়ম্বর, সকলকে আচ্ছাদিত করে তপঃশক্তিকেই জাগ্রত করে তুলতে হবে। দু'দণ্ডের সংসার-অভিনয় দিয়ে জীবনের পরিমাপ করলে চলবে না—নিত্যকালের সঙ্গে যুক্ত রেখে অন্তরের অন্তর মন্থন করে তার মর্ম্মরহস্যটী আবিষ্কার করতে হবে। শিক্ষার এইরূপ নিরঙ্কুশ সার্ব্বভৌম ক্ষেত্রই চাই। কৃত্রিমতার অসংখ্য অত্যাচারে মানুষের জীবন আজ আর্ত্ত, নিষ্পিষ্ট, কুৎসিৎ—ধুলায় লুটিয়ে পড়া এই জীবনকে পরম সন্তর্পণে কুড়িয়ে নিতে হবে—প্রচলিত সংস্কারের বিপরীতে একেবারে উজানমুখে তাকে ঠেলে নিতে হবে। তার জন্য যে অপার্থিব শক্তির প্রয়োজন, শিক্ষামন্দিরেই তা সঞ্চিত হবে। এ শক্তি পশুবল নয়—এ আত্মবিসর্জ্জনে অর্জ্জিত তপঃশক্তি। যুগে যুগে অতিমানুষেরা জগতের মাঝে তাঁদের বিপুল শক্তির সঞ্চয় দিকে দিকে বিচ্ছুরিত করে গিয়েছেন—অতি নিঃস্তব্ধ, অতি প্রশান্ত মাধুর্য্যে। তাঁদের মন্ত্র

তপস্যার শক্তিকে সংহত উদ্দীপ্ত করে তুলে এক জীবন হতে শত শত জীবনে সঞ্চারিত করবার সামর্থ্য চাই। এই চেষ্টা যেখানে সত্য হয়ে জাগবে, শিক্ষার ভিত্তি সেখানে দৃঢ় হবে, সেখানেই অন্তর হতে মানুষকে বিকশিত করা চলবে। তাই সেখানে আমরা পাব খাঁটী মানুষ—যে মানুষের আগাগোড়া সকলই স্বচ্ছ স্বচ্ছন্দ। বুদ্ধির জোরে এমন মানুষ গড়ে উঠ্‌বে না—সে ফুটবে আত্মার প্রেরণায়। জীবনের প্রারম্ভক্ষণ হতেই তাঁর দিব্য মহিমার স্পর্শ তাকে দিতে হবে—তার জন্য আজ আবার শিক্ষার তপোভূমি প্রতিষ্ঠা করা চাই।

তপোবনের শিক্ষা

প্রাচীন ভারতের তপোবনের কথা কি যেন একটা মোহে আমাদের আবিষ্ট করে দেয়। তার বাস্তব রূপটী ঠিক কেমন ছিল, তা আমরা কেউই হয়ত জোর করে বল্‌তে পারব না, কিন্তু শ্রদ্ধা ও আনন্দ দিয়ে তার যে ছবিটী এঁকেছি, সে যে আমাদের জীবন আর সাধনার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে! দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষ যত বিচিত্র হয়েই দেখা দিক না কেন, সকল দেশের সকল কালের মানুষের মাঝে এমন একটা আত্মীয়তার যোগ রয়েছে, যাকে সমস্ত মানুষ-ভাবের মূল বৃন্ত বলা যেতে পারে। এই আদিম সত্যকে না দেখে বাইরের আবেষ্টনকেই যে আঁকড়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করেছে, সে ভুল করেছে নিশ্চয়ই। প্রাচীনকে আমরা বুঝ্‌তে পারি না বা মান্‌তে পারি না—তার একমাত্র কারণই হচ্ছে, আমাদের চিত্তের বহির্মুখীনতা; এ জায়গায় গোঁড়া আর সংস্কারকের এক দর। চিরপুরাতনই যে চিরনবীন হয়ে দেখা দিচ্ছেন,

এ কথা বুঝ্‌তে হলে দৃষ্টির প্রসার প্রয়োজন; আবার আপনার সঙ্গে একটু জানাশোনা না থাকলে দৃষ্টিও খুলবে না। বুঝবার ক্রটী আমাদের এইখানেই।

শিক্ষার যে তপোভূমি সৃষ্টি করতে হবে, একথা আমরা পূর্ব্বে বলেছি। কিন্তু তপোভূমি বলতে যে সংস্কারের মাপে কাটাছাঁটা একটা কৃত্রিম কিছু আমরা চাই, এ বললে ভুল হবে। তপোবনের যে কল্পনা এতদিন আমাদের আবিষ্ট করে রেখেছে, ধ্যানে তাকে সত্য করে নিতে হবে। এমন সত্যভূমি প্রত্যেকের হৃদয়েই রয়েছে। মানুষের উপলব্ধির ধারার মাঝে এমন একটা স্থান আছে, যেখানে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যে কোনও মানুষকে এসে নিস্তব্ধ প্রশান্তিতে একেবারে তলিয়ে যেতে হয়েছে; বাইরের প্রকৃতিও সেখানে তার অন্তরের অনুকূলেই গড়ে উঠেছে। এই তো মানব-হৃদয়ের চিরন্তন তপোবন। খুঁজলে একে পাওয়া কি দুষ্কর হবে? তার রূপ বদ্‌লিয়েছে হয়ত, কিন্তু প্রাণ তো বদ্‌লায়নি।

তপোবন যদি থেকেই থাকে, তবে আমরা নূতন করে আবার তা সৃষ্টি কর্‌তে চাই কেন?—তপোবন যে রয়েছে, তা তো আমরা জানিনা, তাই জানার দিক দিয়ে আমরা তাকে নূতন করে সৃষ্টি করতে চাই। আজ আমাদের এইটুকু বুঝ্‌তে হবে, এই তপোবন অসত্যও নয়, অসম্ভবও নয়। যদি আন্তরিকতা নিয়ে আমরা একে চাই, তবে নিশ্চয়ই একে পাব—তাই এ অসম্ভব নয়। আর যা কিছু আমাদের সত্য, সুন্দর, মহান্‌, তার সৃষ্টি এই তপোবন হতেই হচ্ছে—তাই এ অসত্যও নয়। যা শুধু সকলের কল্পনায় বা সংশয়ে অবাস্তব হয়ে রয়েছে, তাকেই জাগ্রৎ জীবনের সাধনায় সমগ্র জাতির মর্ম্মভূমিরূপে আমরা প্রত্যক্ষ কর্‌তে চাই।

শিক্ষার সঙ্গে এই তপোবনের যোগ সব চেয়ে নিগূঢ়। তপস্যার ভূমিতেই তরুণ জীবনের উন্মেষ করতে হবে, তবেই তার বীর্য্য, তার সৌন্দর্য্য পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পাবে। জীবনের মাঝে সংগ্রাম আছে, কোলাহল আছে—তার আনন্দও আছে। কিন্তু এই সংগ্রাম আর কোলাহলকে আয়ত্ত করবার বীর্য্য যদি না থাকে, তাহলে তার মাঝে স্বস্তি কোথায়? তাই উদ্দাম হয়ে জীবনের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়বার পূর্ব্বে জীবনের রহস্য মন্থন করবার জন্য শান্ত হওয়া চাই। সে শান্তি নির্জ্জীবতার ছদ্ম আবরণ নয়, জীবনের ভারকেন্দ্র সমান রাখবার জন্য এ হচ্ছে বিপরীত প্রান্তে শক্তিসঞ্চয়। শক্তির তরঙ্গে নেচে বেড়ানোই তো বীর্য্যের পরিচয় নয়; বীর্য্য সার্থক সেখানেই—শক্তি যেখানে আমাদের করায়ত্ত। তাই শক্তিকে বশ করবার জন্য নিজকে আগে গুটাতে হবে। এইখানেই আমরা শান্ত তপোবনের শিক্ষা চাই।

জগতে চারিদিকেই প্রাণচেষ্টা আজ এমন বিক্ষিপ্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছে যে, জগৎটাকে সমগ্রভাবে বিচার করবার শক্তি ও যোগ্যতা কোথাও ফুটে উঠ্‌ছে না—বর্ত্তমানের প্রচণ্ড তাড়নায় আমরা সবাই যেন একটা অনির্দ্দেশ্য ভবিষ্যতের পানে ছুটে চলছি। এ অবস্থায় জীবনের এমন একটা প্রেক্ষাভূমি থাকা প্রয়োজন, যেখান থেকে বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংযত সংহত করে, আমরা একটা স্থির লক্ষ্যের অভিমুখে প্রেরণ করতে পারি। মানুষের যদি কর্ম্মকোলাহলের উদ্দামতা থেকে অবকাশ না মিলে, তবে এই প্রেক্ষাভূমি সে পাবে কোথায়? আবার ছোটবেলা থেকেই অন্তরের মাঝে ডুবে যাওয়ার শিক্ষা যদি ধাতুগত হয়ে না উঠে, তবে বয়সকালে আর ঠেকে শিখবার সময়ই থাকে কোথায়? আজকাল অকর্ম্মা শিক্ষাকে আর আমরা পছন্দ করি না। কিন্তু কর্ম্মের ছটফটিতে দেহমনের বাঁধন যখন আলগা হয়ে পড়তে থাকে, তখন

নিজকে সামলে রাখবার শিক্ষা তো আমরা পাই না। কর্ম্মের সংঘর্ষে আত্মার দীপ্তি যদি দিন দিন উজ্জ্বল হয়েই না উঠল, তবে জীবনে মিছামিছি এতখানি উষ্মা সঞ্চয় করে পরিণামে আমাদের কি কল্যাণ হবে?

শুধু কোলাহল বলে নয়, জীবন সম্বন্ধে আমাদের মাঝে যে প্রচুর পরিমাণে মোহের সঞ্চয় হয়েছে, তাকে পরাস্ত করবার জন্যও তপোবনের দুয়ারে এসে দাঁড়াতে হবে। আমাদের সমস্ত কাজের মাঝেই দেখি, উচ্ছ্বাস কিম্বা উত্তেজনা হতেই আমাদের কর্ম্মের প্রেরণা আসছে। উত্তেজনার সৃষ্টি যাঁরা করছেন, তাঁদের প্রেরণার মাঝেও মৌলিকতার নিদর্শন কচিৎ আমরা পাই। একটা কিছু মাথায় জাগা কারুর পক্ষে বিচিত্র নয়; কিন্তু যে কোনও খেয়াল নামে আর দমে ভারী হলেই তাকে মৌলিক বলা চলে না। অভিনবের সৃষ্টি যে বর্ত্তমানে পূরা দমেই চলছে, তা দেখতেই পাচ্ছি এবং তাকে অবজ্ঞা করবার মত স্পর্দ্ধাও আমাদের নাই। কিন্তু এই অভিনবের পিছনে একটা অখণ্ড প্রজ্ঞাবান্ সচেতন মানুষকে তো আমরা সব জায়গায় প্রত্যক্ষ করছি না। তাই অভিনব সৃষ্টিতেই জীবনের চরম সার্থকতা বলে আমাদের মনে হয় না —যদি মোহকে ভেদ করে আমরা অভিনবকে জন্ম দিতে না পারি। কিন্তু মোহ হতে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগবে কিসে? আমরা এমন কি শিক্ষা পেয়েছি, যাতে আত্মপ্রতিষ্ঠ বীর্য্যের বলে নিজেই আমরা নিজের জীবনের সারথি হতে পারি? বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় সে শিক্ষা আমাদের হবে বলে বিশ্বাস হয় না—এই শিক্ষা পাবার জন্যও তপোবনের আদর্শকে ফিরে পেতে চাই।

শুধু একটী দু'টী জীবনের সাধনা দিয়ে নয়, বহু জীবনের উৎসর্গ দিয়ে প্রচলিত সমাজ-প্রতিষ্ঠানের বাইরে এমন ক'রে এক নূতন প্রতিষ্ঠান

আমাদের গড়্‌তে হবে, যা বর্ত্তমানের দৈন্য হতে আমাদের অব্যাহতি দিতে পারে। এই দৈন্যহীন প্রাণের নির্ম্মুক্ত প্রকাশ-ভূমিকেই আমরা তপোবন সংজ্ঞা দিচ্ছি। এ শুধু একক জীবনের সাধনক্ষেত্র নয়—এ-ও এক সমাজ, এ কেবল মানব-হৃদয়ের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য হতে বর্জ্জিত বস্তুতন্ত্রতাহীন কল্পলোক নয়। সমাজ থেকে তপোবন সম্পূর্ণ বিযুক্ত থাকবে না—তার কলুষিত সংস্কারান্ধতা হতে মুক্ত থেকে প্রাণের প্রেরণায় সমগ্র সমাজকে সে চলিষ্ণু, জীবন্ত করবে। তপোবনের আয়োজন পৃথক হতে পারে, কিন্তু মানুষের পক্ষে তার প্রয়োজন সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে এক হয়ে যাবে—এই আমরা পরম শ্রেয় বলে মনে করি।

মানুষের প্রচেষ্টা-বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়েই তার ভিতর দিয়ে তাকে মুক্তির পথ দেখাতে হবে। কিন্তু এ পথ দেখাবে কে? যে সমাজের পক্ষে নিজের আবর্জ্জনাভার বহন করাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে, সে আর কি করে নূতন পথে বীর্য্যের সাথে মানুষকে নিয়ে যেতে পারবে? তাই মানুষের বাইরে-ভিতরে সামঞ্জস্য রাখবার সঙ্কেতটী শিখাতে আমাদের নূতন করে প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে হবে।

তবে এ সৃষ্টিকে শুধু অভিনবের সৃষ্টি বলা চলে না—এ হচ্ছে যা সহজ, তাকেই ফিরে পাওয়া। প্রচলিত রীতিতে আমরা যেটাকে মানুষের শিক্ষার সময় বলে ধরে নিই, তার মাঝেও আমরা শিক্ষার্থীকে অনেক জঞ্জাল থেকে বাঁচিয়ে প্রচুর অবকাশ করে দিই, যাতে সে স্বচ্ছন্দে তার জীবনটী ফুটিয়ে তুলতে পারে। এই আমাদের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু তার সিদ্ধির যে উপায় আমরা অবলম্বন করি, তার মাঝে সহজতা থাকে কতটুকু? তাই দেখি, সংস্কারান্ধতার দরুণ শিক্ষার ফলে মানুষের কোনও শক্তিরই যথার্থ উন্মেষ হয় না। শিক্ষার্থীর জীবনে আমরা যে অবকাশের সৃষ্টি করি, তা যদি

আমাদেরই সংস্কারের অপ-অর্জ্জন দিয়ে ভরাট না করে, তাদের সত্য অর্জ্জনের শক্তিকে প্রস্ফুট করে তুলতে পারতাম, তবেই অবকাশ সৃষ্টি করা সার্থক হত।

এই সত্য আত্মার সত্য। মানুষ যে ভস্মস্তূপ মাত্র নয়, সে যে অন্তরে-বাহিরে অগ্নিময়, এই সত্য তাকে উপলব্ধি করিতে হবে। আমাদের এমন একটা স্থানের দরকার, যেখানে এমনিতর একটা ভাবের সাধনা অবিশ্রাম চল্‌ছে, অথচ তা মানুষের কর্ম্মচেষ্টাকে কোনও বাধা না দিয়ে বরং দিব্য-প্রেরণায় তাকে আরো প্রাণবান্ করে তুল্‌ছে। সাংসারিকতার উর্দ্ধে থেকেও এই তপোভূমি সামাজিকতা হতে বিচ্ছিন্ন হবে না; স্ফুটনোন্মুখ তরুণ-জীবন এখানে বহু সত্যসাধকের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সামাজিকতায় যুক্ত হবে, জীবনে নিত্যকর্ম্মের মাঝ দিয়ে কি করে প্রজ্ঞা আর আনন্দকে অনায়াসে উন্মেষিত করা যেতে পারে, তারি শিক্ষা লাভ কর্‌বে। এ যুগে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা যে নিতান্ত প্রয়োজন, এ সত্যকে স্বীকার করে মানুষে-মানুষে গভীরতর অন্তরের যোগ স্থাপন করাতেই তপোবনের সার্থকতা। সকল মানুষের অন্তরালে যে সত্য মানুষটী গোপন রয়েছেন, তপোবনের শুচি শান্ত ও সরল শিক্ষায় সেই মানুষটীকেই উদ্বুদ্ধ কর্‌বে এবং তাঁরই জাগ্রৎ দৃষ্টির সম্মুখে মানুষ শুধু সংসারকে বহন করা নয়, আনন্দের প্রেরণায় তাকে বিস্তার কর্‌তেও শিখ্‌বে।

যে জীবন শৈশব হতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত আনন্দের একটী অবিচ্ছিন্ন ধারায় সমুজ্জ্বল, সেই বরণীয়। স্বচ্ছতা আর সরলতা এর নিদর্শন। তপোবন এমনি জীবন সৃষ্টি কর্‌বে। মানুষের যা কিছু প্রয়োজন—যা তার দেহের, মনের বা আত্মার প্রয়োজন—তার সকলেরই মীমাংসা হবে অতি অনাড়ম্বর, সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে।

অথচ মানব-সমাজে জীবন-সমস্যা যেখানে জটিল হয়ে উঠেছে, তার প্রতিও তপোবনের দৃষ্টি বিমুখ থাকবে না। এখানকার নিভৃত সত্য সাধনাই জীবনসংগ্রামে মানুষকে পদে পদে আত্মার মহিমাকে জয়যুক্ত করবার শক্তি দেবে। ভাব আর রূপের লোকের মাঝে তপোবন যেন একটী আনন্দের সেতু; নবোন্মেষিত জীবনের সরলতাকে তা বহুদিন অব্যাহত রাখবে, যৌবনের দীপ্তিকে স্নিগ্ধ ও বিশ্বপ্রসারিত করবে, বার্দ্ধক্যের পরিপূর্ণতাকে সুগভীর প্রেমে বিশ্বের প্রতি আশীর্ব্বাদস্বরূপ করে তুলবে। তপোবনের স্নিগ্ধছায়ায়, তার অনুচ্ছ্বসিত মাধুর্য্যে, তার নিরঙ্কুশ শান্তিতে, তার অপ্রধৃষ্য বীর্য্যে যে দেবতা আমাদের জীবনের অন্তরালে স্তব্ধ হয়ে রয়েছেন, তিনিই ধীরে ধীরে জেগে উঠবেন—চিত্তে কোনও আকস্মিক আঘাত না দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর বিচিত্র জগতের সঙ্গে আমাদের তিনি পরিচয় ঘটিয়ে দেবেন। তারপর আমাদের তপঃপূত জীবন তাঁর কঠিন বীর্য্যসঞ্চারে তিনি এমনি শক্তিময় করে তুলবেন যে, সংসারে সমস্ত বিক্ষেপ আর বিক্ষোভের উপর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত ছড়িয়ে পড়তে কোথাও আমাদের বাধবে না। মানুষের অন্তরে এমনি তপোবন প্রচ্ছন্ন রয়েছে; তাকে বাইরে দেখতে পাওয়া কি এতই অসম্ভব?

সহজ শিক্ষা

তপোবনের শিক্ষাকে সার্থক করতে হলে শিক্ষামন্দির হতে কৃত্রিমতাকে আগে তাড়াতে হবে। কৃত্রিমতাকে চিনব কি করে? যখনি দেখব, কোন একটা প্রয়োজন বা সংস্কারের খাতিরে মানুষের জীবনের একটা দিক মাত্র পুষ্ট করা হচ্ছে, অখণ্ডভাবে মানুষের সমগ্র জীবনকে গ্রহণ করা হয়নি, তখনি বুঝব, আমরা কৃত্রিমতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। বিভিন্নমুখী কতকগুলি শক্তির সংহতিতে মানুষের জীবন; তার মাঝে সত্য ও আনন্দের প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমস্ত শক্তির মাঝেই সামঞ্জস্য ঘটাতে হবে, যে কোনও একটা শক্তির উপাসনায় মেতে গেলে চলবে না। কিন্তু এদিকে আবার এ-ও স্মরণ রাখতে হবে যে, কতকগুলি বিরোধী আদর্শকে একত্র জুড়ে দিলেই সামঞ্জস্য হয় না—তার জন্য বিরোধকে অতিক্রম করে উচ্চতর ভূমিতে দাঁড়িয়ে শক্তির পরিচালনা করতে হয়। এইজন্যই দেখি, গোড়ায় বহু থাকলেও চরমে এক ভিন্ন বহুকে কেউ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না।

শিক্ষা আর জীবন ভিন্ন নয়—অর্থাৎ একটা নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যেই শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে না। যে পর্য্যন্ত চরম সত্যকে লাভ না করছি, সে পর্য্যন্ত শৈশব হতে যৌবনে, যৌবন হতে বার্দ্ধক্যে, জন্ম হতে জন্মান্তরে শিক্ষা আর জীবন পাশাপাশি চলবে—নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে আপনার অন্তরের চিরন্তন সত্যটাকে এক সুরে বেঁধে। এই একের সুরটা যাতে সকলের মাঝেই বেজে ওঠে, এইটা আমাদের বিশেষ করে লক্ষ্য করতে হবে। আমরা এমন চাই না যে মানুষের জীবনে যত কিছু বৈচিত্র্য, সব মিলে একাকার

হয়ে যাক ; অর্থাৎ প্রলয়ের মাঝে আমরা সাম্য খুঁজি না—আমরা চাই জীবনে বৃহত্তর একটা সামঞ্জস্য।

কিন্তু কি করে তা হবে, তা বুঝ্‌তে গেলে তপস্যার প্রয়োজন। এতো শুধু বৈজ্ঞানিকের মত বাইরটাকে বিশ্লেষণ করে বোঝা নয় —এ যে জীবনের মর্ম্মসত্যটীকে আবিষ্কার করা। সমস্ত সৃষ্টিতে সমগ্র সৃষ্টিশক্তি কোন্ ধারা ধরে কাজ করছে, এইটুকু না ধরতে পারলে বোঝা যাবে না—আমাদের জীবনকেও কোন্ পথে পরিচালনা করলে আমরা ঠিক সহজ বস্তুটি পাব। আবার এটুকু বুঝতে গেলেও নিজকে একটু দূরে নিয়ে যেতে হবে—চেষ্টার যে বৈচিত্র্য জীবনে ফুটে উঠছে, তার সঙ্গে নিজের অভিমানকে একীভূত না করে নির্ব্বিকার হয়ে তার সমগ্র স্বরূপটীর পরিচয় নিতে হবে। নিজ হতে এমনি দূরে সরে যেতে হলেই সংস্কারসুলভ বাসনা-কামনাগুলিতে টান পড়বে, তখন আর বাইরেরর দিকে এতটা নজর রাখা সম্ভব হবে না। এই অন্তর্মুখীনতাই হল তপস্যা।

অন্তরে পৌছে একবার জীবনের মর্ম্মস্থানটীতে আসন নিতে পারলে সবই সহজ হয়ে আসবে—সমস্তটা জীবন যেন তখন বায়স্কোপের ছবির মত চোখের সামনে ভাস্‌বে। তখন আর প্রত্যেকটা চেষ্টার তাৎপর্য্য বুঝে সহজের পথে তাকে নিয়ন্ত্রিত করা দুঃসাধ্য হবে না। যারা ভিতরে না ঢুকে কেবল বাইর থেকে আত্মশাসন করতে চায়, শাসনের পীড়া যে তাদের কাছে এত তীব্র লাগে, তার কারণই এই যে, শাসনের হেতুটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নয় অর্থাৎ তারা নিজের বুদ্ধিতে শাসন করছে না, তারা শাসন করছে পরের বুদ্ধিতে। তাই যারা নিতান্ত বহির্ম্মুখ আর যারা এমনিতর

অর্দ্ধব্যবসায়ী—তারা উভয়েই তপস্যার মাঝে কৃচ্ছ্রতাটাই দেখ্‌তে পায়; তার মঝে যে আনন্দ আছে, ঔদার্য্য আছে, সৃজননৈপুণ্য আছে, তা তাদের চোখে পড়ে না।

নিজের জীবনে এই ওস্তাদীটুকু করা চলে, যখন নিজের মাঝে ইচ্ছাশক্তি বিশেষভাবে জেগে উঠেছে। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি যেখানে এখনো নিয়ন্ত্রী হয়ে ফুটে ওঠেনি, সেখানে কি করে ওস্তাদী চলবে? অথচ শিক্ষার কারবার বেশীর ভাগই এই আ-ফোটা বা আধফোটা মনটী নিয়ে। একটা সংশয়ও এখানে জাগে। বুদ্ধিশুদ্ধি হলে পর জীবনটাকে সমুখে নিয়ে তাকে যখন বাগ মানাতে চাই, তখন দেখি, প্রতি পদে যুক্তিতর্কের ঠোকাঠুকি করে আমাদের পথ চল্‌তে হচ্ছে, এই জন্যই সেখানে কত পর্য্যবেক্ষণ, কত বিচার, বিভিন্ন মনোবৃত্তির কত সওয়াল-জবাব। কচি মনে কি এতটা বুদ্ধির পাক আছে যে সেখানেও লড়াই সুরু হতে পারে?

এ সমস্যার বাইরে থেকে মীমাংসা হতে পারে না। ফুটন্ত মনে কি আছে না আছে, তা দেখছি যুক্তিতে ধরা পড়ে না—তা বোঝা যায় হৃদয় দিয়ে, মমতা দিয়ে। ওই যে ফুলের কুঁড়িটীর মত কচি মনটী—ওর মাঝে চিরযুগের যে বৃদ্ধ রসিক পুরুষটী বসে রয়েছেন, তিনি যে কোন্ দিকে আমাদের ইঙ্গিত করছেন, তা কি আমরা বুঝতে পারি? মায়ের গর্ব্ব আছে, তিনি সন্তানের নাড়ীনক্ষত্র পর্য্যন্ত জানেন; কিন্তু ওই গম্ভীরবেদী পুরুষের ভাষা কি মায়ের কাণে প্রবেশ করেছে? ওই পুরুষটীর মর্ম্ম যে না জেনেছে সে কি করে বুঝবে, কোন্ ভাষায় তিনি কথা কইছেন? আমরা তো জানি না যে, শিশু-মন অন্তরের নিভৃত গুহাতেও সচেতন,—পূর্ণমাত্রায় সচেতন; শক্তি থাকলে সেখানেও স্পন্দন তোলা যায়।

এই শক্তি যারা পায়, তারা যে কি করে তার পরিচালনা করে, তার কোনও আইন-কানুন বলে দিতে পারে না। হৃদয়ের এমন একটা গভীর অনুভূতির স্থান আছে, যেখান থেকে কর্ম্ম করা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ হয়ে ওঠে, অথচ তার সঙ্কেতটা ঠিক দরদী না হলে কেউ বুঝ্‌তে পারে না। হৃদয়ের এই সহজ সুরটা যখন বাইরের কর্ম্মে অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে, তখন সেই কর্ম্মের বহিঃপ্রকাশকেই সাধারণ মানুষ নানা আইন-কানুনের জালে ধরতে চায়—তারা মনে করে, আইনটা পাকা হলেই কাজটা পাকা হবে। এমনি করেই নীতির সৃষ্টি হয়। নীতির প্রয়োজনীয়তা আছে স্বীকার করি, কিন্তু যদি অন্তরের রসের সঙ্গে তার যোগ না থাকে, প্রত্যেক সাধক যদি তাকে রসানুভূতি থেকে নূতন করে সৃষ্টি করতে না পারে, তবে সে যে চিরকাল পথের জঞ্জাল হয়েই থাকবে।

তাই বলি, আধফোটা হৃদয়ের গোপন ভাষা কি করে বুঝব, কি করেই বা পূর্ণ হৃদয়ের ছোঁয়াচ দিয়ে অপূর্ণকে ফুটিয়ে তুল্‌ব, তার কোনও একটা বাঁধাধরা নীতি আবিষ্কার করা শক্ত। শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে, বাইরের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে অন্তরের মাঝে ডুবে যাও, মজে যাও—তারপর বিপুল পুলকে আপনার মর্ম্মস্থান হতে আপনাকে উৎসারিত করবার চেষ্টা কর—কাকে দিচ্ছ, কি দিচ্ছ, কিছুরই খেয়াল রেখো না—কোনও সঙ্কল্পের সঙ্কীর্ণতায় নিজকে আড়ষ্ট করোনা—দেখ্‌বে তোমার হৃদয়ের সুরের কাঁপনে চারিদিকের হাজার বীণার তারে কাঁপন তুলেছে—সকলে মিলে মিশে এক অপরূপ ঝঙ্কার উঠেছে—কচি প্রাণের প্রদীপে বিশ্বনাথের আরতি সুরু হয়ে গিয়েছে।

বাস্তবিক, সত্যকার কোন কাজ করতে গেলে প্ল্যান বর্জ্জন করে চলাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা। আমরা এ করব, তা করব—

এমনিতর মতলব নিয়ে থাকলে স্বভাব কিছুতেই ফুটতে চায় না যেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটাই আগাগোড়া কেবল প্ল্যানের ঠাসবুননি মাত্র; ওতে প্রাণ জাগবে কি, বুদ্ধি আর মতলবের চাপে তার সবটুকু রস একেবারে নিঙড়ে বেরিয়ে যায়। তাই দিনের পর দিন আমরা কেবল কতকগুলো টেঁসো মানুষেরই সৃষ্টি করে চলেছি, যাদের স্বভাবের কোনও একটা দিকই যথার্থরূপে ফোটেনি। অপরাবিদ্যার যতরকম ট্রেণিং-ই দাও না কেন, মতলব-বাজীটুকু যে পর্য্যন্ত দূর না হচ্ছে, সে পর্য্যন্ত শিক্ষার ফলে কেবল বিপ্লবেরই সৃষ্টি হতে থাকবে; অর্থাৎ আমাদের মতলবে আমরা একরকম গড়ব, আর প্রকৃতি তাঁর মতলব অনুযায়ী সেটাকে ভাঙবেন।

এই দেশের আগাগোড়া ইতিহাসটা যখন মনে হয়, তখন দেখি, মানুষের মাঝে যে সহজ ভাবটা রয়েছে, সেইটাকে ফুটিয়ে তুলবার জন্যই যেন ভগবান এখানে বিশেষ করে আয়োজন করেছেন। তাই দেখছি, বাইরের জগতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভার বইতে এ দেশ চিরদিনই নারাজ। তার দরুণ তাকে সইতে হয়েছে অনেক, কিন্তু তবুও তো তার এই বদ্-স্বভাবটা গেল না। জগৎপিতার বিদ্যালয়ে সে যে চিরকাল এই পাঠই পেয়ে এসেছে যে, নিজকে তুমি তোমার স্বরূপের সঙ্গে যুক্ত রাখ, তোমার যোগক্ষেমের ভার মহাশক্তিই বইবেন। এই সত্য এ দেশের নিয়ামক, শিক্ষার ধারা। একে আবৃত করে পলিটিক্স্, সোশিয়োলজি আর ইকনমিক্সের জৌলুস যতই জাহির করি না কেন, এখানে তা টিঁকবে না। মানুষের বাইরটা সাজিয়ে গুজিয়ে তোলবার চেষ্টাকে শিক্ষা নাম দিয়ে, তার আয়োজনটা যতই জাঁকালো করে তোলা হচ্ছে, ততই আমাদের

যেন তাক্ লেগে যাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগী মনটা অনবরত হাঁকৃছে—"ততঃ কিম্?" তার কণ্ঠকে তো কিছুতেই নিষ্পেষিত করতে পারছি না।

শিক্ষার মন্দিরে একটা গৃহস্থালী পাতবার সত্য সত্যই প্রয়োজন আছে। শিক্ষার কারখানা চাই না—তার মাঝে কেবল কামনার লৌহচক্রের ঘর্ঘর রব। যে হৃদয় নিঃশব্দে আপনাকে ছড়িয়ে দিতে চায়, সে তো সেখানে স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পারবে না। মানুষের হৃদয়কে যদি জীবনের গূঢ়তম সত্যের সঙ্গে যুক্ত করে তারপর তাকে সৃষ্টির অধিকার দেওয়া যায়, তাহলে সে মতলববাজীর কারখানা সৃষ্টি করবে না—সে গড়বে তপোবন—এ কথা জোর করেই বলা যায়। আর সরল ভাবে সহজ ভাবে যে আপনাকে দিতে পারবে, শিক্ষা দেবার অধিকার তারই সত্য। সে স্বয়ং প্রাণময়—তাই প্রাণ হতে প্রাণকে সে সঞ্চারিত করতে জানে। এইজন্যই শিক্ষার কারখানা-ঘরের স্থানে আমরা চাই একটি সরল গৃহস্থালী—যার প্রতি অণুপরমাণুটীতে পর্য্যন্ত মানুষের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনটী শোনা যায়। এই গৃহস্থালী আপনার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি হতেই গতিবেগ সঞ্চয় করবে, তাই তার সৃষ্টি হবে আনন্দের সৃষ্টি। তার আনন্দের কাছে বহির্জ্জগতের অভাবের তাড়না এত ছোট হয়ে যাবে যে, মানুষের প্রয়োজনের যথার্থ স্বরূপটী তখন আমরা দেখতে পাব ; তখন আমরা বুঝব, বাইরের অভাব মানুষের কত অল্প—অথচ ভালবাসার, আনন্দ করবার ক্ষমতা তার কত অসীম! সরল জীবনের সহজ কর্ত্তব্যগুলি অম্লান চিত্তে সমাপন করে মানুষ যদি আনন্দকে ঠাঁই দেবার মত প্রশস্ত হৃদয় রাখতে পারে, তবে তার চেয়ে আর শিক্ষার সার্থকতা কোথায়?

এই গৃহস্থালীর বিরুদ্ধে তর্ক উঠবে জানি। বাইরের কোলাহল দিন দিন যেমন উদ্দাম হয়ে উঠছে, আর তার হুজুগে আমাদের হালকা প্রাণও যেমন নেচে উঠছে, তাতে সহজ কথা বলে তর্কের দায় হতে নিষ্কৃতি পাওয়া শক্ত। কিন্তু এতটা তর্ক না থেকে মানুষের মাঝে যদি সহৃদয়তা থাকৃত—সহজ কথাটা মানুষ যদি সরল ভাবে বুঝবার চেষ্টা করত!—

প্রশ্ন হবে, সরল গৃহস্থালীর উপর যদি শিক্ষার বনিয়াদ গড়ে তুলতে চাও, তবে কি বাইরের জগৎটাকে একেবারে বর্জ্জন করে চলবে? এ কথার উত্তর দিতে হলে অনেক কথাই ভাব্তে হয়। প্রথমতঃ, বাইরটাকে একেবারে বর্জ্জন করবার কথা তো হতেই পারে না। কালের প্রভাব একটা আছেই—তাকে লঙ্ঘন করে চলার সাধ্য কারু নাই। কিন্তু তা বলে কালের স্রোতে যে সকলকেই গা ভাসিয়ে দিতে হবে, এমন কথাও মানতে প্রস্তুত নই। এই যে যুগপ্রভাব বলে একটা প্রচণ্ড শক্তি দশের ইচ্ছার মাঝে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এটাকে আমাদের সমস্যারূপেই গ্রহণ করতে হবে। কালের এই প্রকাশই যে সত্যের সমগ্র প্রকাশ, তা কি করে মান্‌ব? সুতরাং এর সঙ্গে সম্পূর্ণ বিদ্রোহিতাচরণ না করলেও সন্ধি করবার পূর্ব্বে একবার অন্তরের মাঝে ডুবে গিয়ে দেখতে হবে, যে শাশ্বত সত্য আমাদের মাঝে নিহিত, এই সন্ধিতে তার কোনও অমর্য্যাদা হচ্ছে কি না। বাইরকে আমাদের মানা এই পর্য্যন্তই।

কেউ বলবেন, এতে আমাদের বঞ্চিত হতে হবে অনেক। বাইরের জগতে যে বিচিত্রকর্ম্মের প্রেরণা চল্‌ছে, তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে থাকা কি নিজকে অর্দ্ধমৃত করে রাখা নয়? বাইরে যাঁরা মেতে রয়েছেন, তাঁরা এমন কথা বল্‌তে পারেন বটে। কিন্তু কথা এই যে, সবাই সব

জিনিষের দিকে হাত বাড়াতে পারে না—আকাঙ্ক্ষাকে মানুষের খর্ব্ব করতেই হয়, কেননা তার শক্তি সীমাবদ্ধ। কাজেই বাইরের সমস্তটুকু সুবিধা পাওয়া যখন এখনো আমাদের দেশে সহজ হয়ে ওঠেনি, তখন ওই প্রাংশুলভ্য ফলের দিকে উদ্বাহু হয়ে থেকে লাভ কি?—কাজেই, যে চেষ্টায় সত্য কম অথচ চটক বেশী, তার মোহ হতে আত্মরক্ষা করে, অন্তরের দিকে ফিরলেই আমাদের মঙ্গল।

তারপর আদপেই বাইরটাকে এত বড় বলে মনে করব কিনা, সে-ও সন্দেহ। বর্ত্তমান বহির্ম্মুখী সভ্যতার চরম পরীক্ষা এখনও হয়নি—আর প্রাচীন ভারতের সরল প্রাণটীও এখনো মরেনি। এ দুয়ের মাঝে কে যে টিঁকবে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে বটে। কিন্তু দেখেছি, প্রাচীন ভারতের বিরুদ্ধে যারা রায় দেয়, তারা তার প্রাণের স্বরূপটী মোটেই বুঝতে পারে না; অথচ এই প্রাচীনপন্থীদের মাঝে এমন পুরুষও মিলে, যাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি বর্ত্তমানের মর্ম্মস্থলটী পর্য্যন্ত বিদ্ধ করে দেখতে জানে। মান্‌ব কার কথা? যিনি দুটোই দেখছেন তাঁর কথা, না একদেশদর্শী সমালোচকের কথা?

তবে কিনা শেষ পর্য্যন্ত কথাটা হচ্ছে আদর্শ নিয়ে। এই যে সরল জীবনে ব্রহ্মবিদের ছায়া ফুটিয়ে তোলবার শিক্ষা—এ কেবল মুষ্টিমেয় কয়জনার ভাগ্যেই এখন ঘটতে পারে। কিন্তু কালে কি হবে, তা বলা যায় না। একদিন যখন এই শিক্ষারই জোয়ার বয়ে গিয়েছে এ দেশে, তখন তো মানুষের জীবন দুঃখে কাটেনি, ধন-কনক-সমৃদ্ধির অভাবও ঘটেনি। মানুষ আবার সেই সরল জীবনে ফিরে যাবে কিনা, তা স্পর্দ্ধা করে এখনো বলা যায় না। কিন্তু তবু এ কথাটা জোর করেই বলা যায় যে, বহির্জ্জগতের মত্ততা মানবজীবনের অভিব্যক্তির নিম্নস্তর—মানুষ যতই উঁচুতে উঠ্‌বে, ততই সে তার বাইরের অলঙ্কারগুলি বর্জ্জন করে

চলবেই। সার্ব্বভৌমভাবে এ না ঘটতে পারে, কেননা গাছের সবগুলি ফল যেমন একসঙ্গে পাকে না, তেমনি সব মানুষই একসঙ্গে অভিব্যক্তির চরমে পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু দেশের প্রাণে যে সত্যের অভাব হয়নি, তারি প্রমাণস্বরূপ এমন কতকগুলি মহৎ জীবনের সৃষ্টি এ দেশে হবে, যাদের মাঝে নিখিল মানবের আদর্শটী ফুটে উঠ্বে।

এই ঘরছাড়া ফকিরদের জয়গানই আমরা করব। যে সরলতার মাঝে তাঁরা অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন, তা আমাদের চির-বরেণ্য হয়ে রইবে। তাঁরা যে কল্যাণকর শিক্ষা আমাদের দেবেন, তাই আমাদের চোখের সামনে চিরন্তন আদর্শরূপে উজ্জ্বল হয়ে থাক্বে। বর্ত্তমানের প্রভাব যদি কাটিয়ে না-ও উঠ্তে পারি, তবুও আমাদের বহুমুখী বহিঃশিক্ষার মাঝে সেই দিব্য শিক্ষার দিব্য জ্যোতিঃ পুণ্য আশীর্ব্বাদের মত ছড়িয়ে পড়বে—কম্পাসের কাঁটার মত আমাদের চিত্তটী তার দিকেই ফিরে রইবে!—এইটুকু যদি হয়, তবেই যথেষ্ট।

শিক্ষা

দ্বিতীয় পর্ব্ব—সমস্যা

শিক্ষাসমস্যা

মানুষের মাঝেই হোক্, আর ইতর প্রাণীর মাঝেই হোক্, শিক্ষার প্রয়োজন সব জায়গাতেই আছে। এখন মানুষকে যদি ইতরসাধারণ হতে পৃথক করে নিই, তাহলে শিক্ষাসম্পর্কে উভয় জগতে মোটামুটী রকমের একটা প্রভেদ দেখতে পাই। ইতরজগতের শিক্ষা প্রকৃতির প্রেরণায় সহজাত সংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; মনুষ্যসমাজের শিক্ষার উপর মনুষ্যবুদ্ধির কারিগরীর ছাপ সুস্পষ্ট। একদিক দিয়ে দেখলে প্রাকৃতিক শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সম্পূর্ণ; একটা জানোয়ারের জীবনযাত্রার পক্ষে যা শেখা প্রয়োজন, প্রকৃতি অতি নিপুণভাবেই তা শিখিয়ে দেন, কাজেই জানোয়ারটা পূর্ণমাত্রাতেই জানোয়ার হয়ে গড়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-পদ্ধতির ফলে একটা পূর্ণ মানুষ গড়ে উঠেছে, এটা সচরাচর দেখা যায় না। এই জন্য শিক্ষাক্ষেত্রের প্রধান সমস্যাই হচ্ছে, মানুষের মাঝে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার অভাব কি করে দূর করা যেতে পারে।

শিক্ষার আদর্শ রূপ কি হবে, মানুষ তা চিরকাল খুঁজে এসেছে। হয়ত কেউ তা আবিষ্কারও করেছে। কিন্তু সমস্ত মানবজাতির পক্ষে তা সমানভাবে প্রযোজ্য হয়নি। প্রত্যেক প্রাচীনজাতিই আপন আপন শিক্ষাপদ্ধতির গৌরব করে এসেছে; আর আধুনিক জাতির মাঝে

এ সম্বন্ধে গবেষণা ও বাগ্‌বিতণ্ডার তো অন্তই নাই। কিন্তু তবুও পূর্ণ শিক্ষার স্বরূপ জাতীয় আদর্শরূপে কোথাও ফুটে উঠেছে বলে তো দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

মানুষের শিক্ষার অপূর্ণতার কারণ আছে। প্রথমতঃ মানুষের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত, কর্ম্মশক্তি অসাধারণ। তাই পশু যেমন আবহমান কাল হতে একই রকমে জীবন কাটিয়ে এসে অবশেষে পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় উদ্ভাবিনীশক্তির অভাবে ধ্বংসের পথে অদৃশ্য হয়ে যায়, মানুষ তা হয় না। যেমন করেই হোক, সে বাঁচবেই, এই তার পণ। বাঁচার উপায় সম্বন্ধে পরিস্থিতি অনুযায়ী মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক। তাই শিক্ষার ভেদ হওয়াও স্বাভাবিক। এই বিভিন্ন শিক্ষার মাঝে যে শিক্ষা যে জাতকে বেঁচে থাকবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী করে তুলেছে, সেই শিক্ষাকেই আদর্শের নিকটতম বলে স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, মানুষের কর্ম্ম বিচিত্র। তার পর প্রত্যেক মানুষের মাঝেই নানা আভ্যন্তরীণ জটিলতা আছে। সুতরাং আদর্শও সকলের উপর সমানভাবে ক্রিয়া করে না। তাই শিক্ষায় পুরোপূরি মানুষ গড়ে ওঠা অনুকূল পরিস্থিতিতেও সম্ভবপর হয় না।

তারপর অন্যান্য প্রাণীর বিকাশের যেমন একটা সীমা আছে, মানুষের তা নাই। মানুষ যে কি হতে পারে, কি না হতে পারে, এ সম্বন্ধে সে নিজেই অনেক সময় অচেতন থাকে। একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে—এই আশাই শিক্ষার নিয়ন্তা। কিন্তু সে ভবিষ্যতের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ যথেষ্ট আছে; এ ক্ষেত্রে পরিপুষ্ট পশুজীবন হতে ব্রহ্মবিৎ ঋষির জীবন পর্য্যন্ত সকলপ্রকার আদর্শই স্থান-কাল-পাত্রভেদে সমভাবে প্রচারিত হয়ে এসেছে। একযুগের প্রচারিত আদর্শ অপর যুগের উপর সামান্য প্রভাব বিস্তার করে না। তখন সঙ্গতি থাক্, আর না থাক্,

প্রাচীন পন্থাকেই শ্রেয়ঃ বলে স্বীকার করতে মানুষের একটা রোখ পড়ে যায়। তা ছাড়া দেশভেদে যে আদর্শভেদ হয়, তাও পরস্পরের উপরে ক্রিয়া করে থাকে। এক বিষয়ে একটা দেশ যদি উন্নত হয় এবং অপর দেশ যদি সে বিষয়ে কাঁচা থাকে, তবে সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিচার না করে অনুকরণ দ্বারা সে অপরের শিক্ষার ফল আয়ত্ত করতে চায়। মোট কথা, ধারণাশক্তি বিভিন্ন হওয়াতে শিক্ষার আদর্শও যেমন ভিন্ন হয়, তেমনি বিচারবুদ্ধি জাগ্রৎ রেখে আদর্শ নিরূপণ না করার দরুণ শিক্ষার ফলও পূর্ণভাবে প্রকট হতে পারে না।

এ তো গেল অপূর্ণ শিক্ষার সমষ্টিগত কারণ। সমষ্টিভাবে এর প্রতিকার করতে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা। কারণ সমষ্টি জিনিষটা কেবল একটা বৃহৎ সংখ্যা নয় যে ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্কের হুকুম মেনে তা চল্‌বে। সমাজের যে কোনও বিষয়ে সমষ্টিভাবে প্রগতি হয়েছে বলে স্বীকার করলেও, এ কথাও ধরে নিতে হবে যে উপরিউক্ত সমষ্টির কোনও অংশ যেমন পিছিয়েই আছে, তেমনি কোনও অংশ আবার নিদারুণ উৎসাহে একটু বেশীর ভাগ এগিয়েও পড়েছে। আগে-পেছনে এমনি টানা-হ্যাঁচড়া না চল্‌লে সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়.; সুতরাং এই টানাটানিকে স্বাভাবিক বলেই স্বীকার করে নেওয়া উচিত। কিন্তু যাঁরা আদর্শের প্রচারক, তাঁরা প্রায়ই এ কথাটা ভুলে যান। সমষ্টিভাবে একটা আদর্শ একটা সমাজে প্রচারিত হল না কেন, অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত সমাজের কাছে তাঁরা এর জবাবদিহি চেয়ে থাকেন। একটা আদর্শকে সর্ব্বত্র সমভাবে প্রযোজ্য করবার বাতিকে অনেক সময় অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষাতেও বিপরীত ফল ফলে থাকে। এই জন্য সমষ্টির উন্নতি কামনার সময় ব্যষ্টির মঙ্গলের দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আদর্শবাদীদের কর্ত্তব্য বলে মনে

করি। ব্যক্তির উপর ব্যক্তির প্রভাব অসামান্য। একটা জাতকে সব দিক থেকে বুঝে আয়ত্ত করা ও আপন ইচ্ছামত পরিচালনা করা অমানুষিক কাজ। কিন্তু ব্যক্তিকে সহজেই আয়ত্ত করা চলে এবং ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি রেখে তার শোধন ও বোধন উভয়ই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হতে পারে। অবশ্য সমষ্টির দৃষ্টিতেও ব্যষ্টিকে বিচার করতে হবে—এইটুকু হল সংযমের শিক্ষা। কিন্তু ব্যক্তির প্রেমে যদি ব্যক্তি আশ্রয় ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ না করে, তবে কেবল সমষ্টির দিকে তাকিয়ে আদর্শপ্রচার করা নিষ্ফল হবে।

এ হতে এই প্রমাণ হয় যে, শিক্ষার সমস্যাকেও ব্যক্তির দিক হতেই আলোচনা করা উচিত। শিক্ষার সমস্যা জীবনেরই সমস্যা। প্রত্যেকটী জীবন যেমন অনুভূতি ও বেদনাতে স্বতন্ত্র, শিক্ষাও তেমনি স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাসমস্যার যতটুকু সমাধান আমরা করতে পারি, তার প্রতি উদাসীন হয়ে কেবল সমষ্টির আদর্শ প্রচার করা এবং সেই আদর্শকে নিষ্ফল হতে দেখে দেশের নিন্দায়, জাতির নিন্দায় মনের ঝাল মিটানো—এতে কোনও পক্ষেরই কোনও লাভ নাই। অল্প মূলধনে বেশী লাভের ফিকির করা আমাদের একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জন্যই জীবনের সমস্তক্ষেত্রেই আমাদের কেবল ভাগাভাগি। শিক্ষাক্ষেত্রেও ভাগাভাগি হয়েছে—তার ফলে সমাজের মাঝে শিক্ষকসম্প্রদায় বলে একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এঁদের কৃতিত্ব এই যে, এঁদের একজনের কারিগরিতে অমন হাজার হাজার ছেলে "মানুষ" হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার, শিক্ষার আদর্শ উন্নত করা—সমস্তই শিক্ষার কলকে লক্ষ্য করে, কেননা কলকে বাতিল করলে কলিযুগের মাহাত্ম্য যে খর্ব্ব হবে!

যেখানে ব্যষ্টির প্রাণলীলাকে আহত করা হয়েছে, সেইখানেই শিক্ষায় কৃত্রিমতা ঢুকেছে। স্বভাবের স্বাচ্ছন্দ্যকে রুদ্ধ করলে কেবল অস্বাস্থ্যকেই আবাহন করে আনা হয়। শিক্ষার অস্বাস্থ্যকর পরিণাম আমরা সব দিকেই দেখ্‌তে পাচ্ছি। শিক্ষকেরা যে কেউ ছাত্রের অহিত কামনা করেন, তা নয়—তবুও সর্ব্বত্রই হিতের চেয়ে অহিতের মাত্রা বেশী হয় কেন? এর একমাত্র কারণ এই যে ব্যক্তিগত জীবনে স্বভাবের লীলাকে স্ফূর্ত্ত হতে দেওয়া হয়নি। পূর্ব্বে বলেছিলাম যে প্রকৃতির শিক্ষায় একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জানোয়ার সৃষ্টি হয়, কিন্তু মানুষের শিক্ষায় একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানুষ সৃষ্টি হয় না। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে বিরোধ দেখা দিয়েছে, সেটা আপাততঃ মাত্র। আসল কথা, মানুষ তার উন্নততর প্রকৃতিকে বাধা দিয়েছে বলেই তার আত্মহিত-চেষ্টাও বিফল হয়েছে। প্রকৃতি একটা কাজ ধীরে-সুস্থে করে; একটা বীজ হতে একটা বনস্পতি গড়ে তুল্‌তে তার সময় লাগে; সে জন্য তার ব্যস্ততাও নাই, লজ্জাও নাই। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির বাহাদুরী এইটুকু যে, সবজায়গাতেই সে সময় সংক্ষেপ করতে চায়। সে চায় সোজা রাস্তা। আলাদীনের প্রদীপের উপরেই তার লোভ। মানুষের এই দুশ্চেষ্টাকে মিথ্যা বলছি না—কিন্তু বলছি, এর সংযম প্রয়োজন। প্রকৃতির শত বৎসরের কাজ মানুষ দশ বৎসরে করছে—এইখানেই শিক্ষার কেরামতী, এ কথা হাজারবার স্বীকার করব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলব যে এটা বাস্তবিক প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই নয়—তারই উন্নততর নিয়মের অনুসরণ। মানুষের বুদ্ধিও প্রকৃতির দান; সুতরাং তারও একটা স্বাভাবিক গতি আছে। এই স্বভাবের গতিকে সহজভাবে প্রবাহিত হতে দিতে হলে সহিষ্ণুতা চাই। কর্ম্মফলের

উৎকট আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করা চাই, শান্ত সমাহিত চিত্তে প্রকৃতির সঙ্কেত ধারণা করে বুদ্ধিকে তদনুকূলে পরিচালনা করা চাই।

যে শিক্ষাপদ্ধতিতে মানুষের বুদ্ধির জয়জয়কার, সেই শিক্ষা-পদ্ধতিতে যদি সহিষ্ণুতা থাকত, সর্ব্বোপরি প্রকৃতির আইন বুঝে বক্তিগত কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা ও সংযম থাকত, তাহলে শিক্ষায় আরও সুফল ফলত। কিন্তু যে কোনও মানুষের শৈশব-জীবন হতে পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত যদি আলোচনা করে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে, এই শিক্ষা-জীবনের মাঝে প্রকৃতির মর্য্যাদা যে কতবার লঙ্ঘিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই। কোথাও হয়ত অপরিমিত শৈথিল্যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও বা অযথোচিত শাসনে প্রাণকে সঙ্কুচিত করা হয়েছে। যার যে কর্ত্তব্য বহন করা উচিত ছিল সে তা করেনি, কিম্বা অপাত্রে তার ভার ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত থেকেছে;—ফলে একটা মানুষের জীবন পণ্ড হয়ে গিয়েছে আর এই সমস্ত অনৈসর্গিক অত্যাচারের সংস্কার তার সন্তানসন্ততির উপরও ক্রিয়া করছে।

মানুষের প্রথম ভুলই হয়েছে যখন সে তার সন্তানের জন্য নিজের "আলয়ে" "বিদ্যার" ব্যবস্থা না করে পৃথক একটা বিদ্যালয় ফেঁদে বসেছে। অবশ্য মানুষের পরস্থিতিই এর জন্য দায়ী। কিন্তু তা বলে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি হতে কোনও অজুহাতেই তো রেহাই পাবার যো নাই। স্কুলের যে কোনও প্রয়োজন নাই, সে কথা বলছি না। কিন্তু "স্কুল" আর "বাড়ী"—এই দুটী বিভিন্ন পরিভাষায় সন্তানের মনে, তার পিতা-মাতার মনে, তার শিক্ষকের মনে যে বিভিন্ন মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়, তারই বিশ্লেষণ করে দেখতে বলছি যে, আমরা ঠিক স্বভাব-

সঙ্গত কাজ করছি কিনা। কর্ত্তব্য পালন না করলে স্কুল যেমন বাড়ীর অধম হতে পারে, বাড়ীও তেমনি স্কুলের অধম হতে পারে, এ কথা সবাই স্বীকার করবে। আসল কথা তো স্থান নিয়ে নয়, স্বভাবের দাবী নিয়ে। ছেলে যদি স্কুলের চেয়ে বাড়ীই বেশী পছন্দ করে, তবে সেটা যে কেবল তার উচ্ছৃঙ্খলতা-প্রিয় স্বভাবের পরিচয়, তা নয়—স্কুলের পক্ষেই সেটা অগৌরবের কথা। বালক স্কুলের শাসন মেনে নেয় বটে এবং যথাকালে শিষ্ট-শান্ত হয়ে কারামুক্তিও লাভ করে, কিন্তু কারাগৃহের প্রতি তার প্রেম জন্মায় না। পরিণত বয়সে সে যদি তার সন্তানের কাছে কারাগৃহের অজস্র মহিমাও কীর্ত্তন করে, তবুও অন্তর্য্যামী জানেন, এই সুনিপুণ চাটুবাদ নিরুপায়তারই আবরণ মাত্র। পক্ষান্তরে যদি কোনও স্কুলের এমন অভাবনীয় সৌভাগ্য হয় যে, ছেলে বাড়ীর চেয়ে স্কুলেরই বেশী পক্ষপাতী হয়, সেটাও তার অকৃতজ্ঞতার চিহ্ন নয়, গৃহের পক্ষেই অগৌরবের কথা এবং স্কুলের পক্ষে পরম শ্লাঘার কথা। মোটকথা, স্কুলেই হোক্ আর বাড়ীতেই হোক্, শিশুপ্রকৃতির পর্য্যবেক্ষণ ও পুষ্টিই হল আসল কথা। পরিস্থিতির দরুণ শিক্ষার স্থান-পরিবর্ত্তন হোক্ তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু প্রকৃতিকে যদি শিক্ষায় বিকৃত করে তোলে, তা হলেই বিপদ্।

বিদ্যালয় মনুষ্যবুদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শন, তা মানলাম। এখানে অল্পায়াসে বৈজ্ঞানিকভাবে কাজ হতে পারে, তাও সম্ভব। কিন্তু শিশুর যে শিক্ষার প্রয়োজন, তা কি মনুষ্যবুদ্ধির অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার? প্রকৃতি যখন মানবশিশুকে অসহায় করে জগতে পাঠিয়েছিলেন, তখন কি তার শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই করেন নি, শিক্ষার সমস্যা কারু প্রাণেই দেন নি? ছেলে যখন বাড়ী ছেড়ে

দূরান্তরে থাকবার উপযুক্ত হয়, তখন হঠাৎ শিক্ষক বলে যে এক সম্প্রদায় মনুষ্য আবির্ভূত হন, তাঁরা কি প্রকৃতির ভ্রমসংশোধন করবার জন্যই আসেন? এতদিন কি শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল না? আর আজ যদি তাঁদের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তবে তাঁরা প্রকৃতির কোন্ প্রেরণা দ্বারা অনুপ্রাণিত? শিশুপ্রকৃতি বিশ্বস্তভাবে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারবে, এই যোগ্যতা তাঁদের আছে কি? আর একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে মহা আড়ম্বরে শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন হল—শিশুর জীবনে এই আকস্মিকের আবির্ভাব তার কাছেই বা কেমন ঠেকে? এই সমস্ত প্রশ্নের আলোচনা না হলে শিক্ষা-সমস্যার গোড়ার কথাটাই আমরা ধরতে পারব না। আমাদের কাছে যে ব্যবস্থা সঙ্গত বলে মনে হয়, শিশুর কাছে তা হয় কি না—না হলেই বা তার প্রতীকার কি, তা চিন্তা করা প্রয়োজন। প্রকৃত শিক্ষাসমস্যা এখানেই।

শিক্ষা-বিভ্রাট—পরিবারে

আমাদের দেশে যারা ছাত্র, তারা যে কার তত্ত্বাবধানে মানুষ হয়ে উঠ্ছে, এক কথায় তার উত্তর দেওয়া সহজ নয়। শিক্ষার অন্যান্য অঙ্গের কথা ছেড়ে দিলেও পুঁথিগত শিক্ষার আকার ও প্রকার সম্বন্ধেও যে আমাদের কোন মৌলিকতার দাবী চল্‌তে পারে, সে কথাও স্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া শিক্ষার অন্যান্য অঙ্গ তো পড়েই আছে; শিক্ষার সরকারী কারখানায় কসরত করে করে সেদিকে নজর দেওয়ার অবকাশ তো আমাদের হয়েই ওঠে না।

সমগ্র দেশের বয়স্থদের মনোভাব যদি শিক্ষা সম্বন্ধে এমনি অপুষ্ট থাকে, তাহলে সে আবহাওয়ার মাঝে দেশের যারা ভবিষ্যতে আশা, সেই বংশের দুলালদের শিক্ষার যে কতটুকু সুব্যবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সব চেয়ে বড় হচ্ছে আমাদের অন্নচিন্তা। কাজেই ছেলেকে মানুষ করে গড়ে তুলবার আগে কি করে তাকে দিয়ে দু'পয়সা রোজগারের উপায় হবে, তার জন্য তাকে রাশি রাশি পুঁথি গেলাবার ব্যবস্থাতেই আমাদের বেশী উৎসাহ। মূল নীতিগুলিকে দূরে ঠেলে যেভাবে শিক্ষাকে নিয়ে আমরা ব্যবসাদারী করতে সুরু করেছি, তাতে শিক্ষাটা তো পাকা হচ্ছেই না—ব্যবসাটাও ভাল জমছে না। অথচ শিক্ষার ব্যবস্থাটা খাঁটি রাখলে, তাতে হয়ত মানুষ গড়ত, সংসারও চলত। বিশেষতঃ শিক্ষার উপযুক্ত বয়সটা যাদের, তাদের পক্ষে তো ব্যবসাদারীর হুজুগটা নিরর্থক মাত্র। শুধু যে নিরর্থক, তাই নয়—সেটা ক্ষতিকরও কম নয়। সংসারের চাপে পড়ে তুমি আমি যে বিভীষিকা দেখছি, ছোটদের মাঝেও সেটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের কচি মনটাকে দুমড়ে মুচ্ড়ে পঙ্গু করে দিলেই বা কি ইষ্টসিদ্ধি হবে? বরং শুধু বস্তু দিয়ে নয়, মনের শক্তি দিয়েই যাতে সংসারের বাধাগুলিকে তারা জয় করতে পারে, তার জন্য দেহকে বাড়তে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনকেও সুস্থ, সবল, তেজস্বী আবহাওয়ার মাঝে ফুট্তে দেওয়া উচিত।

কিন্তু আমাদের সংসারে ছেলেরা কি শেখে? গোড়া হতেই পাশ করার সঙ্গে যে শিক্ষার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, এই ছাপটুকু নিয়েই ঘর হতে তারা স্কুলে নির্ব্বাসিত হয়। অবশ্য ঘর থেকেই যে কি শিক্ষা হত, তা আমরা জানি; আবার স্কুলে গিয়েও যে কি শিক্ষা হচ্ছে,

তাও জানি। ঘরে শিক্ষার সঙ্গে মায়ের তো প্রায়ই কোন সম্পর্ক নাই—সময় মত ছেলের স্কুলের ভাতটা তৈরী করে দিতে পারলেই তাঁর কাজ শেষ হল। বাবার তো অন্নচিন্তা চমৎকারা, ছেলের কথা ভাববেন কখন? ছেলেকে যখন স্কুলে দিয়েছেন, সেখানে যখন নগদ টাকা দিয়ে বিদ্যার কারবার চল্‌ছে, তখন আর ভাবনা কি?—তা ছাড়া তিনি নিজেও তো স্কুল থেকে বিদ্যালাভ করে এসেছেন, সুতরাং ওখানে যে কি হয়, তা তাঁরও কিছু কিছু জানা আছে। বাবার বেলায় যে ব্যবস্থায় কাজ চলে গিয়েছে, ছেলের বেলায় তাতে চল্‌বে না কেন?—অতএব এর উপর আর মাথা ঘামিয়ে তিনি নূতন কি কর্‌বেন? মা গেলেন, বাবা গেলেন, বাকী রইলেন স্কুলমাষ্টার। তাঁরও তো অন্নচিন্তা চমৎকারা, অথচ পৌনে সাত কুড়ি ছেলে তাঁর কাঁধে। কাজেই Hand writingএর পাকা খাতায় একটা কাঁচা দস্তখত করে তিনিও খালাস! এ দিকে ছেলে ঘুম থেকে উঠে নয়টা অবধি স্কুলের পড়া মুখস্থ করে নাকে-মুখে দুটা ভাত গুঁজে ঘড়ী ধরে দশটায় স্কুলে যায়, আবার সারা দুপর বিদ্যালাভ করে ঘড়ী ধরে চারটায় বাড়ী ফেরে। বিকালটা কারুর বা একটু সময় মিলে, আবার কারুর বা বাবার সুব্যবস্থায় স্কুলের ভূত ঘাড় থেকে নামতে না নামতেই প্রাইভেট টিউটার এসে উদয় হন। তারপর সন্ধ্যা হতেই কেরোসিনের আলো জ্বেলে রাত দশটা পর্য্যন্ত পুঁথির শ্রাদ্ধ—অনুকল্পে তন্দ্রা। এমনি করে দেখতে পাই ঘুম থেকে উঠে আবার বিছানায় না শোওয়া পর্য্যন্ত ছেলের বিদ্যালাভের এতটুকু ফাঁক পর্য্যন্ত নাই—এমনিতর কড়াকড় আমাদের বন্দোবস্ত। অথচ এর যে লক্ষ্য কি, তা আমরাও জানি, ছেলেরাও জানে। বছরের পর বছর এমনি করে ছেলেরা অহরহঃ

বিদ্যালাভ করছে। এতখানি হুঁসিয়ারীর পর তাদের পরীক্ষার ফলটা খবরের কাগজের যতখানি জায়গা জুড়ে দেখা দেয়, শিক্ষার ফলকে কিন্তু কখনো জীবনে ততখানি জায়গা জুড়তে দেখা যায় না। কেন এমন হয়, সে কথাটা কি একবারও আমাদের ভাবতে ইচ্ছা হয় না?

শিক্ষার ব্যবস্থাটা যদি এমনি থাকে, তাহলে আপনা হতেই একটা প্রশ্ন মনে জাগে যে বাস্তবিক এমন শিক্ষায় আমাদের সকল দিকের পুষ্টি হচ্ছে কি? দেহ-মন-আত্মার সকল ক্ষুধাই মিটছে কি? কখনো কি মনে হয় না, শুধু কতকগুলি গুরুপাক পুঁথি গেলাবার বন্দোবস্ত করে আমরা ছেলের দেহে মনে যে সমানভাবে অজীর্ণ রোগের বাসা বাঁধতে দিয়েছি, এতে তাকে মনুষ্যত্বের সর্ব্বোত্তম অধিকার হতে বঞ্চিত করিনি কি? স্বাস্থ্য, মনীষা, অধ্যাত্মদৃষ্টি, এ তিনটী জিনিষের উপর প্রত্যেক মানব-সন্তানেরই দাবী আছে। শুধু মনের খোরাক জোটাব বলে শিক্ষার নির্ঘণ্টপত্র হতে যদি দেহটাকে এবং আত্মাটাকে বাদ দিই, অথচ মনের ক্ষুধাও ভাল করে মিট্‌তে না দিই, তাহলে মানুষের প্রতি যে অবিচার করা হয়, তার শাস্তি একা তাকে নয়—আমাকে, আমার দেশকে শুদ্ধ ভোগ করতে হয়। তাই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গেলে আগে ভাবতে হবে, মানুষের জীবনের ভিত্তি কোথায়—কিসের উপর দাঁড়িয়ে কার ইঙ্গিতে কোন দিকে সে আপনাকে বিকশিত করবার চেষ্টা করছে। বর্ত্তমান প্রয়োজনের তাড়ায় তার জীবনের একটা দিককেই যদি খুব বড় করে দেখি, তাহলে তার দরুণ যে অসামঞ্জস্য সঞ্চিত হতে থাকবে, একদিন তা প্রলয়বজ্রের মত মাথায় ভেঙ্গে পড়বে! আমাদের মত আত্মদৃষ্টিহীন ব্যক্তির এবং সমাজের সব জায়গাতেই এমনি অসামাল। দেশে দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতির

বিবর্ত্তন হচ্ছে, তার মূলেও এই অসামঞ্জস্য। যতদিন মানুষের এই অসামঞ্জস্য না মিটবে ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতির হাতে দেনার দায় হতে কিছুতেই সে রেহাই পাবে না। এ দেনা শোধ করতে হলে মানুষকে বর্ত্তমানের প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে আপনার আত্মসমাহিত তপোদৃষ্টিকে অন্তরের অন্তস্তলে প্রেরণ করতে হবে, সেখানে সকল সংস্কার হতে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছন্দচিত্তে আবিষ্কার করতে হবে—মানুষের সত্যরূপটী কি?

মানুষের জীবনের মূল সুরটী ধরে তার সঙ্গে যদি শিক্ষার সুরটী মিলিয়ে দিতে হয়, তাহলেই শিক্ষার মাঝে ব্যক্তিগত দায়িত্বের কথা এসে পড়ে। রাষ্ট্রতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র দিয়ে যে শিক্ষার পত্তন হবে—তা হবে গড়কষা। ব্যক্তির দাবী তার মাঝে রক্ষা করা চলবে না। অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির মনুষ্যত্ববোধ তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি —ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেকের জীবন বৈচিত্র্যে সুন্দর—বৈশিষ্ট্যে একক। এই সমস্ত এককক জীবনকে শিক্ষাক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্র ও সমাজের পীড়নে এক করে ফেলবার চেষ্টা করা হয়, তাহলে তাদের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্য তো লুপ্ত হবেই—তাদের মনুষ্যত্ববোধ পর্য্যন্ত তাতে ক্ষুণ্ণ হবে। প্রত্যেকের অন্তরে যে একটী স্বাধীন সত্তা রয়েছে, শিক্ষা তারই ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য মানুষের মাঝে গোষ্ঠিবোধকে চেপে রাখতে চাইলে তাতে অকল্যাণই হবে, কিন্তু সেই গোষ্ঠিবোধকে যদি আত্মার স্বাধীন স্ফূর্ত্তির অনুকূলরূপে গ্রহণ না করে বিপরীত ক্রমেই তাকে জাগিয়ে রাখতে চাই, তাহলে তাতে আমাদের আরও বেশী অকল্যাণ হবে। কাজেই শিক্ষার মাঝে আমাদের প্রধান লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, শিক্ষার গুণে আমরা অন্তরের স্বাধীনতাকে

স্ফূর্তির সহিত অনুভব করছি কি না এবং সেই স্বাধীনতার পরিসরে আপনার গোষ্ঠিকে অন্তর্ভূত দেখতে পাচ্ছি কিনা।

কিন্তু এইটুকু কর্‌তে হলেই মানুষকে শিক্ষার যন্ত্রশালা হতে বাইরে নিয়ে যেতে হবে। যন্ত্রের আর সকল গুণ থাক্‌তে পারে, কিন্তু প্রাণ তার মাঝে নাই। অথচ মানুষের ভিতরের মানুষটাকে জাগাবার যে সোণার কাঠি, সে হচ্ছে প্রাণ। যন্ত্রের চারিদিকেই আঁট-সাঁট, তার সকলই নিক্তির কাঁটায় ওজন করা এবং তার গতিও এত সিধা যে নৃত্যের সুষমা তার মাঝে কখনো ফুটে উঠবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রাণের চারিদিকে আছে প্রচুর উন্মুক্ত পরিসর, তার হিসাবে কোন কসাকসি নাই—তার গতিতে নৃত্য আপনি ছন্দিত হয়ে ওঠে। এই প্রাণের মাঝেই জীবনের আনন্দ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং আনন্দ হতেই জীবনের বহুধা স্ফুরণ। শিক্ষায় যদি এই প্রাণই আড়ষ্ট হয়ে যায়, তবে আনন্দের উৎসধারা শুকিয়ে গেলে জীবন ফুট্‌বে কি করে ?

তাই বল্‌ছিলাম, শিক্ষাকে যদি বাস্তবিক প্রাণময় করে তুল্‌তে হয়, তাহলে তাকে রাষ্ট্র বা সমাজের নিয়ন্ত্রণের হাতে সঁপে দিলে চলবে না, তার মাঝে ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং ইষ্টনিষ্ঠাকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হবার সুযোগ দিতে হবে। অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তির দাবীর সুবিচার করতে হলে সামান্য আয়োজনে আমাদের চল্‌বে না, শিক্ষার প্রতিষ্ঠানকে তার জন্য খুবই বিস্তৃত করে গড়তে হবে এবং আমাদের মত নিরুপায় দেশে তা সম্ভব হতে বহু যুগ হয়ত কেটে যাবে। কিন্তু ততদিন পর্য্যন্ত কি গড়কষা শিক্ষা লাভ করেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে ?

রাষ্ট্র বা সমাজের দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক পরিবার যদি শিক্ষা সম্বন্ধে আপনার দায়িত্বকে ভাগ করে নেয়, তাহলে এর একটা

মীমাংসা হতে পারে। এ কথা সত্য বটে যে, শিক্ষাকে কৃত্রিম সংস্কার হতে মুক্ত করতে হলে, তাকে তপঃশুদ্ধ স্বতন্ত্র আবেষ্টনের অঙ্গীভূত করে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তাই বলে এ সম্বন্ধে প্রতি পরিবারের যে দায়িত্ব, তার প্রতি ঔদাসীন্যকেও কোনও ক্রমে ক্ষমা করা চলে না। সন্তানের হিত সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে প্রথমতঃ মাতার এবং তৎপরে পিতার দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু তাঁরাই যদি টাকা দিয়ে বিদ্যা কিনে তাতেই সন্তানের কল্যাণ হবে বলে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকেন, তা হলে ফল যা হবে, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশের মাতৃশক্তি যে কতখানি অপটু, তা বলে শেষ করা যায় না। অথচ মায়ের প্রভাব সন্তানের উপর সব চেয়ে বেশী। কিন্তু শিক্ষাব্যাপারে সেই মাকেই সন্তান এমনি ভাবে অতিক্রম করে যায় যে, দুদিনের ইস্কুলে পড়া ছেলে বিদ্যার বহর দেখিয়ে মার কাছ থেকেও তার ন্যায্য সম্ভ্রমটুকু আদায় করতে ছাড়ে না। শুধু পুঁথিগত শিক্ষা সম্বন্ধেই যে মার অজ্ঞতা, তা নয়; স্নেহান্ধ বাঙ্গালী মায়ের কোনও দিক দিয়েই ছেলের ভাল সামলিয়ে উঠ্‌বার মত হৃদয়ের দৃঢ়তা নাই। আমাদের নির্দ্দিষ্ট বয়সে মেয়ে পার না করতে পারলে সমাজের নিকট জবাবদিহী আছে, কিন্তু সেই মেয়ে মা হবার দায়িত্ব বা শিক্ষা যে কতটুকু অর্জ্জন করল, তার কোন খোঁজ রাখবার প্রয়োজন মোটেই নাই।

গড়বার শক্তি মায়েরই আছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ খাওয়ানো-পরানো ছাড়া আর কোন বিষয়ে ছেলের কোনও ব্যবস্থা করা মায়েদের হাতে নাই। ভাল হোক্, মন্দ হোক্, ছেলের ব্যবস্থা বাবাই করে থাকেন। তাই প্রথম প্রথম মনে হতে পারে, ছেলে গড়বার পক্ষে বাবার কৃতিত্ব আর দায়িত্বই বুঝি বেশী। কিন্তু একটু লক্ষ্য

করলে বোঝা যাবে, বাবার চেয়ে মায়ের প্রভাবই ছেলের উপর বেশী, কেননা মায়ের যে সে নাড়ীছেঁড়া ধন। বাবা ছেলের তাল সামলাবার ভার নেন বলেই সব সময় তাঁর মাঝ হতেই রস আহরণ করে ছেলের জীবন পুষ্ট হয় না—বাবার পৌরুষের চেয়ে মায়ের ব্যাকুল স্নেহই ছেলের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু আমাদের মাঝে সাধারণতঃ মায়ের এই প্রভাবটা বিপরীত মুখেই ক্রিয়া করে থাকে অর্থাৎ পিতা যদি গড়বার ভার নিয়ে থাকেন, তাহলে মা ভার নেন সেটা ভাঙ্গবার। বাঙ্গালী পিতা পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করবার চেষ্টা করছেন, এ কল্পনা আমরা করতে পারি, কিন্তু বাঙ্গালী মায়ের স্তন্যসুধা যে সন্তানের হৃদয়ে মনুষ্যত্বের বীর্য্য সঞ্চারিত করে দিয়েছে, এ কল্পনা আমাদের পক্ষে বৃথা।—অথচ উভয়েই হয়ত সন্তানকে ভালবাসেন! একই আবেষ্টনের মাঝে ভালবাসার শক্তি যদি এমনি বিভিন্নমুখী হয়ে ক্রিয়া করে, তাহলে কি করে তাতে সন্তানের যথার্থ কল্যাণ হতে পারে?

ঘরের মাঝেই যেখানে গোড়ায় এমনিতর গলদ, সেখানে শিক্ষার ভিত্তি আমরা গড়ব কিসে? প্রাণের স্পর্শ নাই বলে, ব্যক্তিত্ব বিকাশের ঠাঁই হয় না বলে রাষ্ট্র কিম্বা সমাজ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম, কিন্তু ঘরের মাঝে এসেও তো আমরা এমন মালমশলা পাচ্ছি না, যা দিয়ে অদূর ভবিষ্যতেও হয়ত একটা কিছু গড়ে তুলতে পারি। বাইরে শিক্ষক অযোগ্য, ঘরে মাতা বিমুখ, পিতা নিরুপায়;—"এখন বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?" অথচ "শিক্ষা" নামে একটা পোষাকী রকমেরও তো কিছু থাকা চাই। রাষ্ট্র বা সমাজের সাহায্য সম্পূর্ণ ঠেলে চলে আসব, এতখানি সঙ্গতিও আমাদের নাই। তাই রাষ্ট্রের ব্যবস্থাকে

কতক পরিমাণে বজায় রেখেও তার বিষটুকু কাটবার জন্য ঘরের দিকেও বহু আশা করে আমরা হাত বাড়িয়েছিলাম, কিন্তু নিদারুণ নিশ্চেষ্টতায়, অমার্জ্জিত সংস্কারের বিষাক্ত স্পর্শে ঘরের হাওয়াও যে কলুষিত!—আমরা বাস্তবিকই মাতৃহারা জাতি!

শিক্ষা-বিভ্রাট—রীতিতে

ফুলের মত মানুষকে ফুটিয়ে তোলাতেই শিক্ষার সার্থকতা। এটা খুবই সহজ এবং সরল কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোথাও যে এই সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়েছে, তা আমরা দেখতে পাই না। কৃত্রিমতার প্রতি বোধ হয় মানুষের একটা স্বাভাবিক লোলুপতা আছে—তাই যেটা সহজ, সেটাকেই ঘোরালো করে তুলে সে আনন্দ পায়। এই জন্যই দেখি, মানুষ সুস্থ সবল, সুন্দর সুঠাম দেহের সৌন্দর্য্যে তৃপ্ত হলো না—তাকে বসন ভূষণ আর বিলাসোপকরণের প্রাচুর্য্যে শ্রীহীন করে রসবোধের পরাকাষ্ঠা দেখাল। শিক্ষার মাঝেও আমরা ঠিক এই গলদ দেখতে পাই। আমাদের শিক্ষার যে সমস্ত আয়োজন আর আড়ম্বর, তা দিয়ে কেবল মানুষের সহজ সুন্দর আদর্শকে আচ্ছন্ন করে একটা কৃত্রিম মেসিনে-ছাঁটা জীব তৈরী করবার চেষ্টা হচ্ছে। এ দিক দিয়ে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মাঝে সরল আদর্শকে ফুটিয়ে তুলবার সাক্ষাৎ কোনও প্রয়াসও যেমন নাই, তেমনি সামাজিক বা পারিবারিক ঔদাসীন্যে ছাত্রের জীবনে যে কৃত্রিমতা এনে দেয়, তাকে দূর করবারও কোনও চেষ্টা নাই।

এই সমস্ত দেখে মনে হয়, একদেশদর্শী হলেও স্পার্টান শিক্ষা-প্রণালীর মত এদেশে একটা তেজস্বী বীর্য্যশালী শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত থাকলেও যেন ভাল ছিল। অবশ্য শিক্ষার মূল লক্ষ্যকে কোনও একটা বিশিষ্ট ও খণ্ডিত প্রয়োজনের সঙ্গে বেঁধে রাখা অন্যায়, কিম্বা শিক্ষা হতে কাব্যকলাকে বিসর্জ্জন দেওয়াও জীবনের পক্ষে অসহনীয় ক্ষতি। কিন্তু তবুও যে একটা লক্ষ্যহীন, বীর্য্যহীন, রসহীন শিক্ষাপ্রণালী দুঃস্বপ্নের মত জাতির বুক চেপে বসে আছে, এর গুরুভার হতে মুক্ত না হতে পারলে আর শান্তি নাই। এর আড়ম্বর-বাহুল্যের অন্ত নাই; কিন্তু জীবনের ভার মোচন না করে, বীর্য্যের উদ্বোধন না করে, যে সকল অর্জ্জিত এবং অনায়াসলব্ধ অথচ প্রতিকারহীন সংস্কারের বোঝা তরুণ যাত্রীর ঘাড়ে এ চাপিয়ে দিচ্ছে—তাই বহন করতেই তো তার সমস্ত শক্তি ব্যয় হয়ে যায়, সে আবার বিশ্বপতির উদার আনন্দের মাঝে আপনাকে জাগ্রৎ করবার অবসর পাবে কখন?

সকল বাহুল্য বর্জ্জন করে মানুষ আবার সেই আদিম অসভ্য যুগে ফিরে যাক্—এ কথা আমরা বলছি না। কেননা মানুষের মাঝে যে একটা অদম্য সৃজন-প্রতিভা রয়েছে, তা নানা বাহুল্য সৃষ্টি করবেই—এখন পরমার্থের কষ্টিপাথরে সে সৃষ্টি সোণাই হউক, আর খাদই হউক। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, এই বাহুল্যকে ভোগ করবারও একটা সামর্থ্য থাকা চাই। মায়ের পেট থেকে পড়েই সে সামর্থ্য কারু জন্মায় না। আবার শুধু ভোগের সামর্থ্য নয়, আত্মনিষ্ঠ কল্যাণবুদ্ধির প্রেরণায় বাহুল্যকে সংযত করবার শক্তিও থাকা চাই। তা নইলে জীবনে বাহুল্যটাই ফেনিয়ে উঠে আসল মানুষটাকে আড়াল করে দিতে পারে। প্রধানতঃ এই দুই কারণেই বাহুল্যকে বর্জ্জন করে চলবার জন্ত সময় এবং শিক্ষার প্রয়োজন—প্রথমতঃ যাতে এই

বাহুল্য তরুণের পাকযন্ত্রে গুরুপাক হয়ে না ওঠে, দ্বিতীয়তঃ সীমা উল্লঙ্ঘন করে এ যেন সত্যকে আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা না করে। এইজন্য শিক্ষার্থীর জীবনে মিথ্যা আয়োজনের বাহুল্যকে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত দেখতে চাই। শিশুর নগ্ন শরীর যেমন আলোবাতাসের প্রাণময় স্পর্শের অপেক্ষা রাখে, সে নগ্নতাকে বসনবাহুল্যে পীড়িত করা যেমন পাপ, তেমনি শিক্ষার্থীর তরুণ জীবনকেও আচারে ও চিন্তায় সকল রকমের বাহুল্য-ব্যসন হতে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। সহজ আনন্দে অনাড়ম্বর মহিমায় বীর্য্যময় প্রশান্তিতে তার জীবন দলে দলে বিকসিত হয়ে উঠুক—এই তো আমরা চাই।

তা ছাড়া শিক্ষা-জীবনের বাহুল্যের বিরুদ্ধে আমাদের আর একটা নালিশ আছে—এ আমাদের সহানুভূতিকে সঙ্কুচিত এবং আত্মাকে দীনহীন করে। সমাজের সকল স্তরেই বাহুল্য নাই, অর্থাৎ সমাজের সকল লোকেই জীবনসংগ্রামে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত আয়োজন জুটিয়ে তুলতে পারে না—নির্দ্দিষ্ট পরিমাণটুকুও আবার কতজনের ভাগ্যে জোটে না। সমাজের স্তরে স্তরে যে এই নিষ্কিঞ্চন দৈন্য, এর সঙ্গে যদি তোমার-আমার কোনও যোগ না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, আমাদের জীবনের একটা দিক আমরা বিকসিত করিনি, কিম্বা মানুষের সকল আয়োজনের পরপারে যে আত্মার মহিমা, তাকে আমরা নিঃসঙ্কোচে অনুভব করতে শিখিনি। আমাদের শিক্ষা বিশেষ একটা আবেষ্টনের মাঝে আমাদিগকে আপাতস্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে ফিরতে শিখায় বটে, কিন্তু সেই গণ্ডীটুকু পার হয়ে আসতে হলেই আমাদের থমকে দাঁড়াতে হয়, কেননা গণ্ডীর অপর পারে যা দেখি, তার সঙ্গে আমাদের অভ্যস্ত-জীবনের তো কোনও সমবেদনার বন্ধন খুঁজে পাই না। ঐ গণ্ডীর বাইরেও তো মনুষ্যত্ব

থাকতে পারে, আত্মার মহিমা সেখানেও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে পারে। কিন্তু সে সত্য আমাদের হৃদয়ে আঘাত করে কই? তাই তো এ জায়গায় এসে আমরা শিক্ষা আর অশিক্ষার একটা কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি করে আপনার শিক্ষার অভিমান নিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়াই! সঙ্কোচের মূল কারণ এই যে, আমাদের প্রচলিত শিক্ষার মাঝে শুধু মনুষ্যত্বের উন্মেষকেই আমরা শিক্ষার লাভ বলে মনে করিনি—শিক্ষার কৃত্রিম আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে যে বাহুল্যটুকু জীবনে বিজড়িত হয়েছে, তাকেও আমরা শিক্ষার অঙ্গ বলে মনে করে নিয়েছি।

আবার এই বাহুল্যও আমাদের এমনি গা-সহা হয়ে গেছে যে, সে যে মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে কোনও সত্যকার প্রতিবন্ধক, তা আমাদের মনে হয় না অর্থাৎ পোষাকটাকেই আমরা অঙ্গের সামিল করে নিয়েছি। তাই দেখি, তরুণ শিক্ষার্থী যদি কখনো কৃচ্ছ্র সাধনার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তার শুভানুধ্যায়ী অভিভাবকবর্গ হতে আরম্ভ করে বিদ্যালয়ের রেগুলেশনগুলো পর্য্যন্ত তার উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠে। কিন্তু এদিকে পৈতৃক আয়ের অতিরিক্ত একটু আধটু বিলাস-ব্যসন নিন্দনীয় তো নয়ই, বরং তা নইলে যেন আর বিদ্যাপীঠের সামাজিকতা রক্ষা করা চলে না। এই আতিশয্য শিক্ষাকে একটা গণ্ডীর মাঝে আবদ্ধ রেখে তাকে কেবল বন্ধ্যা করেছে। সরল মনুষ্যত্বের প্রেরণায় সমাজের সকল স্তরের সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রবেশ করবার যে কল্যাণশক্তি, তাই শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান; কিন্তু এই বাহুল্যের ভার আমাদের সেই দান হতে বঞ্চিত করেছে। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে যে সামাজিকতা রয়েছে—এ-ও নিয়তির বিড়ম্বনা। নন্‌-কো-অপারেশনের সময় দেশব্রত আত্মত্যাগী ছাত্র দেখেছি, দেখে শ্রদ্ধা

হয়নি—শিক্ষার নিদারুণ পরিহাসের কথা মনে করে দুঃখ হয়েছে। মনে হয়েছে, যে অনাড়ম্বর সরল মনুষ্যত্বকে ভারতবর্ষ বহু তপস্যায় জন্ম দিয়েছিল, কে যেন তার বুক থেকে এদের ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—প্রাণের আকুলতায় আবার এরা সেই দেশের বুকে ফিরে যেতে চাইছে, কিন্তু দেশ কি এই ছদ্মবেশে এদের চিন্‌তে পারবে?

শিক্ষার আদর্শকে ব্রাহ্মণের দৈন্যের মাঝে ভারতবর্ষ দেদীপ্যমান করে তুলেছিল। তা বলে প্রাচীন সমাজে যে ঐশ্বর্য্যের কোনও অপ্রতুলতা ছিল, কিম্বা শিক্ষা কেবল এক নিষ্কিঞ্চন সম্প্রদায়ের মাঝেই আবদ্ধ ছিল, তা তো নয়। কিন্তু ধনী হোক্, দরিদ্র হোক্, নিষ্কিঞ্চনতার মাঝেই তখন সকলকে শিক্ষার দীক্ষা গ্রহণ কর্‌তে হত এবং সেজন্য অজস্র ঐশ্বর্য্যের মাঝে থেকেও মানুষ মনুষ্যত্বের পরম অধিকার হতে বঞ্চিত হত না—তার ভোগের জন্য যে সম্পদের ডালি সাজানো থাক্‌ত, মুহূর্ত্তের ইঙ্গিতে তৃণখণ্ডের মত তাকে পরিত্যাগ করে চলে আসতেও তার কোথাও বাধ্‌ত না। এ শুধু কাল্পনিক আদর্শ নয়; যার মিথ্যাসংস্কারবিহীন আশৈশব-নির্ম্মল হৃদয়ে সত্যের রেখাপাত হয়েছে, সে-ই জানে সম্পদকে কি করে ভোগ করতে হয়, কি করেই বা অনায়াসে তাকে ত্যাগ কর্‌তে হয়—কেননা জীবনের যা বাস্তবিক বহিরাবরণ মাত্র, তাকে অন্তরঙ্গ বলে নিজকে ভোলাতে তো সে শিখেনি। যে বস্তুর যেখানে যথার্থ বিশ্রাম, তাকে ঠিক সেখানে রেখে দেখ্‌তে শিখাই হল অকৃত্রিম শিক্ষা—এর মাঝে আতিশয্য নাই, মিথ্যা বিরোধ নাই—এ শিক্ষা উদার, সর্ব্বসমঞ্জস ও মর্ম্মস্পর্শী। মানুষে-মানুষে যে ঐক্যের বন্ধন আছে, মাতৃগর্ভ হতে বিচ্যুত হয়ে একই অধিকার নিয়ে যে জীবনের পথে সবাই যাত্রা করেছি, এই সার্ব্বভৌম নির্ব্বিশেষ সত্যের উপরই জীবনের ভিত্তি

স্থাপন করতে হবে। জীবনে সুখ আসুক আর দুঃখই আসুক, এ দুয়ের মাঝে অচঞ্চল থাক্‌বার শিক্ষা তো আমাদের লাভ করতেই হবে; তা ছাড়া অবস্থার তারতম্যে মানুষের মাঝে যেখানে উচ্চ-নীচের প্রভেদ সৃষ্টি হয়েছে, সেখানেও সমস্ত প্রভেদের অন্তরালে মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করতে আমাদের শিখ্‌তে হবে। আর এ শ্রদ্ধা শুধু বস্তুতন্ত্রতাহীন ভাবোচ্ছ্বাস নয়—নিজের অনাড়ম্বর সরল জীবনের আদর্শ দিয়ে তাকে সপ্রমাণ কর্‌তে হবে। মনুষ্যত্বের শিক্ষা লাভ করে যদি কমলার কৃপা পাই, তাহলে দেশশুদ্ধ লক্ষ্মীছাড়াদের মাঝে লক্ষ্মীর প্রসাদ বেঁটে দিতে আমাদের যেমন কুণ্ঠা থাকবে না, তেমনি আবার নিজে লক্ষ্মীছাড়া হলেও, হৃদয়ের মধু-ভাণ্ডারটী সবার কাছে উন্মুক্ত করে ধর্‌তেও কোনও সঙ্কোচ থাক্‌বে না। শিক্ষায় নিষ্কিঞ্চন্‌তার দীক্ষা যদি এমনি করে আমাদের হৃদয় গড়ে তুলতে পারে, তবেই বল্‌ব, আমাদের শিক্ষা সার্থক।

কৃত্রিমতার নাগপাশ হতে শিক্ষাজীবনকে মুক্ত কর্‌তে হলে, তাকে সাধারণ সমাজের আবেষ্টন হতে দূরে না রাখ্‌লে চলে না। কিন্তু শিক্ষার জন্য যে একটা স্বতন্ত্র সমাজ গড়া হবে, এ কথায় মমতা-প্রবণ বাঙ্গালী বাপ-মা কিছুতেই সহজে স্বীকার হবেন না। এ বিষয়ে বাঙ্গালীর একটা মারাত্মক দুর্ব্বলতা আছে—সন্তানকে বাজিয়ে নেবার মত সাহস তার মাঝে নাই—তার ভয়, কি জানি তার স্নেহের শিকল কেটে শেষে কে কোথায় পালিয়ে যায়। সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের বাপমায়েরা হাজার সদুপদেশ নিবিষ্ট চিত্তে শুন্‌বেন, মুখে তাতে সায়ও দেবেন, কিন্তু তাদের ভাল মন্দ বিচার কর্‌তে গিয়ে আপনাদের সুখ-দুঃখের আদর্শ অনুযায়ী তার ব্যবস্থা করবেন। এই জন্য নিজেদের শৈশব-জীবনের

উচ্ছৃঙ্খলতার দুঃখময় অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সন্তানের জীবনকে সুসংযত করবার মত মনের তেজ তাঁদের নাই—তাঁদের ভয়, পাছে আরামের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাতে সন্তান পীড়া অনুভব করে। তাই আমাদের চোখের সামনে থেকে ছেলে উচ্ছন্ন যাক, তাতে আমাদের আপত্তি নাই,—বরং অন্ধমমতার খাতিরে কিম্বা দেশাচার লোকাচারের দোহাই দিয়ে বুড়োর বোঝা ছেলের ঘাড়ে চাপাতেও আমরা পিছু পা নই; কিন্তু চোখের আড়ালে গিয়ে ছেলে কোনও রকম কঠোরতায় কষ্ট পাবে, এ আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না। এমন অবস্থায় সমাজবহির্ভূত স্বতন্ত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্কল্প দেশবাসীর নিকট হতে কতটুকু আন্তরিকতা লাভ করবে, তা বলাই বাহুল্য।

তা ছাড়া মায়া-মমতার কথাটাও আছে। ছেলেকে চোখের আড়াল করলে সে যদি পর হয়ে যায়, সে ভয়টাও নিতান্ত কম নয়—বোধ হয় এটাই সব চেয়ে বেশী ভয়ের কথা। কিন্তু সত্যের সাধনায় ভালবাসার মর্য্যাদা কি কখনও নষ্ট হয়? যে শিক্ষার কৃচ্ছ্রতায় মানুষের হৃদয়ের ভালবাসা শুকিয়ে যায়, সে শিক্ষা নিশ্চয় অসত্যদুষ্ট এবং একদেশদর্শী। আমাদের সন্তানেরা কাপুরুষের মত মহত্তর জীবন হতে বিমুখ হয়ে ফিরে আসুক—মিথ্যা মমতায় অন্ধ হয়ে এমন বীর্য্যহীন আঁচলঘেঁষা সন্তানই বা আমরা চাইব কেন? যথার্থ উদার ভালবাসা তো মমতার মত মরণভয়ে সঙ্কুচিত নয়। পিতামাতা যেন সন্তানকে তেমনি করেই ভাল বাসেন, তেমন ভালবাসাই যেন সন্তানের কাছে আকাঙ্ক্ষা করেন।—এমনি সত্যপূত বীর্য্যমহিমময় ভালবাসাতেই সন্তান ও পিতামাতার মাঝে সত্যসম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা। সন্তানের প্রতি যদি পিতামাতার এমনি সত্যিকার ভালবাসা থাকত, তাহলে ঘরেবাইরে সর্ব্বত্রই আমাদের শিক্ষার আদর্শ উন্নত হত—শিক্ষাকে সরল সত্যের উপর দাঁড় করাবার জন্য আপনিই দেশবাসীর আগ্রহ হত।

শিক্ষাবিভ্রাট—নীতিতে

কি পারিবারিক, কি সামাজিক, সকল জীবনেই আমরা বহু কৃত্রিমতার সংস্কারে অভিভূত হয়ে রয়েছি। তার ফলে সব চেয়ে বড় যে পাপ আমাদের ছেলেদের মাঝে ঢুকে তাদের সর্ব্বনাশ করছে, তার কথাই বিশেষ করে বলতে চাই। এ পাপ ছেলেদের নৈতিক দুর্গতি, কিম্বা আরও স্পষ্ট ভাষায়—ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। এ কথার অর্থ কি, কিম্বা এ দুর্গতির বিষ যে তরুণ বাঙ্গালাকে কতখানি জর্জ্জরিত করেছে, তা বয়স্থ ছেলে ও তার অভিভাবক উভয়েই বেশ জানেন। কিন্তু কি করে এ পাপ আমাদের মাঝে বাসা বাঁধল, সেই হল বিবেচ্য। পুরুষানুক্রমিক সংস্কার এর জন্য কতক পরিমাণে নিশ্চয়ই দায়ী, তার কথা এখন আমরা তুল্‌তে চাই না। কিন্তু যে অপথ্য আর কুপথ্যের দৌলতে সমাজদেহে এই ব্যাধি পুষ্ট হবার অবকাশ পাচ্ছে, তার প্রতিই আমরা সকলকে বিশেষ করে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি। আমরা বলি, আমাদের মানসিক দুর্ব্বলতা ও অবিবেচনার ফলে শিক্ষাজীবনকেও আমরা যে কৃত্রিমতার আবেষ্টনীর মাঝে অবরুদ্ধ করেছি, তাতেই অব্রহ্মচর্য্যের পাপ আমাদের ছেলেদের মাঝে এত সহজে বিস্তৃতি লাভ কর্‌তে পেরেছে।

কথাটা এই। মানুষের বাইরটাই তার সব নয়—তার চেয়ে বেশী দরদের হচ্ছে ভিতরটা। শিক্ষার মূল কথাই এই ভিতরটাকে ফুটিয়ে তোলা—সর্ব্বপ্রযত্নে এর স্বাস্থ্যকেই অটুট রাখবার চেষ্টা করা। এর জন্য গভীর অনুশীলন প্রয়োজন। যাদের আমরা শিক্ষা দেব, তাদের

মাঝে যদি আত্মসমর্পণ করতে না পারি, তাহলে তাদের ভিতরটাকে কখনও আমরা ছুঁতে পারব না; এবং তার ফলে, বাইরে শিক্ষার জৌলুষ যতই জাহির হোক্ না কেন, ছেলের ভিতরটা সাংঘাতিক রকম কাঁচা থেকেই যাবে। সেখানে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির যে দুরন্ত সংঘাত চল্‌তে থাক্‌বে, তা হতে বেচারীকে রক্ষা করবার বা ভরসা দেবার জন্য কেউ-ই থাকবে না। আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর বিশেষ দোষ এই অন্তরের প্রতি ঔদাসীন্য। এই ঔদাসীন্যের অপরাধে যেমন শিক্ষক অপরাধী, তেমনি পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গ, দেশহিতৈষী, সমাজসংস্কারক প্রভৃতি সকলেই অল্পবিস্তর দায়ী। আমরা বাইরের চটক দেখেই সহজে ভুলি, ইউনিভার্সিটির খেতাবগুলোর মান আমাদের কাছে বেজায় বেশী, কিন্তু শিক্ষায় অন্তরের মনুষ্যত্ব বিকসিত হল কিনা—তা আমরা দেখেও দেখি না। যদিচ কোথাও কোন রকম মারাত্মক একটা গলদ কারো বেরিয়ে পড়ে, তাহলে তার জন্য একাল আর সেকালের সুদীর্ঘ সমালোচনা করেই আমরা ক্ষান্ত হই—ভুলে যাই যে একাল বল্‌তে সমালোচকের দলও তার মাঝ থেকে নেহাৎ বাদ পড়েন না।

ভিতরের প্রতি ঔদাসীন্যের একটা বিশেষ কারণ এই যে, আমরা আমাদের নিজেদেরই নাগপাশে বাঁধা পড়েছি। জীবনযাপনের যে রকম আবহাওয়া আমরা গড়ে তুলেছি, তাতে বাইর ছেড়ে ভিতর নিয়ে বিশেষ খুঁতখুতি করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়; কেননা ভিতরে যদি গলদ থেকেই যায়, তাহলে তার প্রতিকারের উপায় তো আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার মাঝে ঠাঁই পায়নি। ভিতরের যে গলদ, তাকে সারাতে হলে জীবনের ধারা আমূল পরিবর্ত্তন করা দরকার, কিন্তু তা করবার মত সাধ্য আমাদের কোথায়—সাহসই বা কোথায়? আমাদের লোকাচার দেশাচারের বন্ধন তো আছেই—তা ছাড়া আছে আমাদের অন্তরের

জড়ত্বের বাধা। আমরা জানছি, যেমন আমরাও আমাদের প্রবৃত্তি সংযমিত করতে পারিনি, তেমনি আমাদের ছেলে-মেয়েরাও তা পারছে না; কিন্তু তা জেনে কেবল মনঃকষ্ট ভোগ করা ছাড়া আমাদের কোনও উপায় আছে কি? ছেলের মনুষ্যত্বকে বেচে যে আমার অন্নসংস্থান করতে হবে, সুতরাং দশের ছেলের যা হয়েছে আমার ছেলের আর তা ছাড়া নূতন কি হবে? দশের পথ ছেড়ে যে নূতন পথে চলব, সে সাহসই বা আমার কোথায়? সম্বলই বা কোথায়? তাই আমরা অসঙ্কোচে বলছি, চিরদিন যা চলে আসছে, তাই চলুক; অসংযত প্রবৃত্তি হতে যে ছেলের জন্ম, অসংযম যদি তাকে কচি বয়স থেকেই তাড়িয়ে ফিরে, তাতে তোমার আমার করবার কি আছে?

এ সকল কথা আমরা অতিরঞ্জিত করে বলছি না; দেশের অসংযম যে কতখানি চরমে পৌঁছেছে, তার খবর আজ কত বৎসর ধরে আমরা প্রতিদিনই পাচ্ছি। এ দুর্গতি ভোগ করছে কারা?—দেশের ভবিষ্যতের আশাভরসা যাদের উপর নির্ভর করছে, সেই তরুণের দল। কিন্তু তাদের এই দুর্গতিতে কি তাদের মাতা সহায় হয়েছেন—পিতা সহায় হয়েছেন? না, তাঁরা তো হন-ই-নি, বরং মিথ্যা সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে দুর্গতির মাত্রা বাড়িয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হননি। তবে কি যে শিক্ষা-দীক্ষায় তাদের কচি প্রাণ পেট্রিয়টিজমের আগুন হল্‌কায় তাতিয়ে তুলছে, সে-ই তাদের এ বিপদে রক্ষা করেছে? না—সে শিক্ষা কেবল মোহের ছলনায় তাদের দিগ্‌ভ্রান্ত করেছে, তাদের অন্তরকে আত্ম-জ্যোতিঃতে দীপ্ত না করে বহির্মুখীনতার আঁধারে ডুবিয়ে মেরেছে। আর যাঁরা সমাজসংস্কার বা দেশহিতের ব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁরাও তো কেবল বাইরের খোসাটা নিয়েই টানাটানি করছেন—কোথায় যে আমাদের দৈন্তের মূল, তা তাঁরা অন্তরে বুঝেও বাইরে চাপা দিয়েই

যাচ্ছেন, কিম্বা আদপেই তার দিকে নজর দিচ্ছেন না। দেশের জন্য প্রাণ তো সকলেরই কাঁদে ; কিন্তু দেশের কাজ করবার যে শক্তিভাণ্ডার, তা যে আমাদের দিন দিন উজাড় হয়ে গেল, তার খোঁজ কি আমরা রাখছি ? মরণের করাল ছায়া আমাদের চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে —আর আমরা এদিকে মুখোমুখি হয়ে তর্ক করছি—হিন্দুরা dying race কি না ;—আর যদিই বা dying হয়ে থাকে, তাহলে তা কেমন করে ! কেমন করে—তা কি নিজের ঘরের দিকে তাকিয়েও বুঝতে পাচ্ছি না ? কোন্ প্রবৃত্তি আমাদের জাতির কচি ছেলেদের আর তার চেয়েও কচি মেয়েদের দেহ মনকে তিল তিল করে বিষিয়ে তুলছে, তা কি আমরা জানি না ? Patriotismএর খোরাক হজম করবার আগেই আমাদের ছেলেদের মন্দাগ্নি হয়ে যায় কিসে, তা কি আমরা বুঝি না ?

জীবনের গোড়া হতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখলে অসংযত প্রকৃতির হাত এড়িয়ে যাওয়া বড় কঠিন। কারণ রক্তমাংসের দেহের প্রতি মানুষের যে লোলুপতা, তা একেবারে তার মজ্জাগত—সৃষ্টিপ্রবাহ অটুট রাখবার একমাত্র নিদান বলে এটা সাধারণ মানুষের কর্তৃত্বের বাইরেও। তাই একে সংযত করতে হলে জীবনপথে আমাদের একেবারে মোড় ফিরে দাঁড়াতে হয়। দেহের টান তো শুধু এক দিক দিয়েই আমাদের টানে না—শুধু সাক্ষাৎভাবে সঙ্গ বর্জ্জন করে গেলেই প্রবৃত্তির হাত হতে বাঁচা যায় না। প্রকৃতির একদিনের খেয়ালে মানুষের মাঝে প্রবৃত্তির উদয় হয় না—আহার-বিহারে, আচার-ব্যবহারে, যত দিক দিয়েই আমরা তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, তার সবটুকু নিয়েই সে আমাদের দ্বারা তার ইষ্টসিদ্ধির উপায় জুটিয়েছে। একটা মানুষ যাবে, তার জায়গায় আর একটা মানুষ থাকবে—এই উলঙ্গ সত্যের উপর প্রবৃত্তির ভিত পাকা

হয়ে রয়েছে; সুতরাং বল্‌তে গেলে জীবনের চরম রসটুকু শোষণ করে নিয়েই প্রকৃতি আমাদের কাছে প্রবৃত্তির অনলে আত্মাহুতির দাবী করে। এই দাবীকে উল্লঙ্ঘন কর্‌তে কিম্বা একে সুসংযত রাখতে যে কত বড় বীরত্বের ও দায়িত্বের প্রয়োজন, তা অসংযত ও উদ্‌ভ্রান্ত নরনারী তলিয়ে দেখে কি?

এই জন্যই বলছিলাম, আমাদের সন্তানদের মাঝে বীর্য্য সঞ্চার কর্‌তে হলে শুধু সময়-মাফিক দু'চারটা উপদেশের উপর বরাত দিয়ে রাখলেই চলবে না—কিম্বা ওদিকের কথাগুলো একেবারে ঢাকা দিয়ে গেলেও চলবে না। সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন, আমাদের উত্তম ও উৎসাহ। আমরা এ বিষয়ে উদাসীন বলেই বংশ বংশ ধরে আপন আপন দুষ্কৃতির বোঝা নির্ব্বিচারে সন্তানের মাথায় চাপিয়ে দিচ্ছি—সে গুরুভারে বেচারীদের কি দুর্দ্দশা হচ্ছে তা দেখেও দেখ্‌ছি না। আমাদের ছেলে-মেয়েদের জীবনটা যদি খুবই স্পষ্ট হয়ে আমাদের চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ত, শুধু তাদের সাময়িক অভাব মিটানো আর গতানুগতিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করেই আমরা নিশ্চিন্ত না হতাম—তাহলে এ দুর্দ্দৈব হতে তাদের রক্ষা করবার জন্য একটা না একটা উপায় আমরা করতাম নিশ্চয়ই। এর জন্য শিক্ষার স্বতন্ত্র আবেষ্টন তো খুবই প্রয়োজন—কিন্তু নানা কারণে এমন ব্যাপক কোন উপায় অবলম্বন করাও যেখানে আমাদের সাধ্য হয় না, সেখানে ব্যক্তিগত চেষ্টা ও দায়িত্বের উপরই আমাদের নির্ভর বেশী; আর সে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন—সন্তানের পিতামাতা বা অভিভাবকবর্গ। তাঁদের ঔদাসীন্যই তো আমাদের দেশের তরুণ শক্তির এই দুঃসহ অপচয়ের মূল কারণ।

মনু বলেছিলেন, শুধু বিধি-নিষেধ দিয়ে যে মানুষের প্রবৃত্তি শাসিত হয়, তা নয়—প্রবৃত্তির বাস্তবিক শাসন হয় জ্ঞানে। ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষাতে

এ কথা খুবই খাটী। সমস্ত জগৎ জুড়ে যৌন সম্বন্ধ ছড়ান রয়েছে—এ সম্বন্ধে জান্‌তে কারুর বাকি থাকে না। অত বড় একটা জগৎ-রহস্যের সম্বন্ধে আমাদের "ঢাক গুড়্ গুড়্" ভাবটা মোটেই কল্যাণকর নয়। আমরা সাক্ষাৎভাবে সরল শুচি চিত্ত নিয়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে ভয় পাই—কিন্তু আমাদের সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে সব জায়গাতেই তো নানা আকারে ঐ যৌনতত্ত্বটাই উঁকি মেরে বেড়াচ্ছে। সভ্যতার অঙ্গ বলে সেখানে তো আমাদের শাসন পৌঁছাচ্ছে না। কিন্তু এই লুকোচুরীর ফলে আমাদের প্রবৃত্তির ইন্ধন কেবল বাড়ছে না কি? আসল তত্ত্ব জানলে বোধহয় সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমাদের একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি জন্মে যেত; কিন্তু তা না করে তার যেগুলো ডালপালা, সেগুলোকেই আমরা ঝাঁকড়া করে তুলেছি, তাতে বিষয়টার অস্পষ্টতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তার প্রতি লালসাটাও আমাদের বেড়ে গিয়েছে। যৌন সংস্কার যাদের মাঝে এখনও জন্মায়নি, এমন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করা প্রত্যেক পিতামাতার—বিশেষতঃ প্রত্যেক মাতার কর্ত্তব্য।

অনেকে ভাবেন, ও বিষয় জানালে ওদিকেই ঝোঁক পড়ে বেশী—সুতরাং ও সব না জানালেই বুঝি প্রবৃত্তি চাপা থাকে। কিন্তু আসলে যে কি ব্যাপার ঘটে, তার খোঁজ তো তাঁরা রাখেন না। স্বভাব যেটা সে তো ফুটে উঠবেই; তা ছাড়া আজকালকার যে সমাজ হয়েছে, তার মাঝে থেকে অতৃপ্ত, অসংযত প্রবৃত্তির করাল গ্রাস হতে আপন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পবিত্রতাটুকু কি বাপমায়েরা সব সময় বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন? ওরা অভিভাবকদের যা জানাতে সঙ্কোচ করে, অতি বড় দুঃখে আমাদের তা জানাতে আসে। তাদের সরল বিশ্বাসের কত বড় অপমান যে হয়ে এসেছে, তা এত বছর ধরে আমরা

দেখে আস্‌ছি। এতদিনের দেখাশোনায় আমরা এইটুকু বুঝেছি, এই ছেলেমেয়েদের আত্মরক্ষার শক্তি ওদের মাঝেই জাগাতে হবে—এ বিষয়ে বাপ-মাকে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। আপন আপন ছেলেমেয়ের ভার যদি তাঁরা না নেন, তাহলে দেশজোড়া এ ব্যাধির প্রতীকার আর কিছুতেই হবার নয়। শিক্ষা, সমাজ আর স্বদেশের ঢাক পিটিয়ে যাঁরা বেড়াচ্ছেন, তাঁদের তো এদিকে তাকাবার ফুরসৎ নাই—তাঁরা ফুটো কলসীতে জল ভর্‌তেই ব্যস্ত। তাই আমরা বলি, যৌন ব্যাপার সম্বন্ধে অমন ঢাকাঢাকি না করে, প্রত্যেক পিতামাতার কর্ত্তব্য, তাঁদের সন্তানদের এ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান জন্মিয়ে দেওয়া—যাতে এর ভালমন্দ বুঝে তারা আপনাকে রক্ষা কর্‌তে পারে, শিশুকাল হতেই একে গুরুগম্ভীর দৃষ্টিতে দেখে এর মর্য্যাদা রক্ষা করে চল্‌তে শিখে। খোলাখুলি স্পষ্ট কথা সব জায়গাতেই ভাল—স্পষ্ট সত্য কথা যিনি বলেন, তাঁর হৃদয়ও সত্যের স্পর্শে শুদ্ধ, নির্ম্মল হয়।

এ বিষয়ে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী যে কতটুকু কর্ত্তব্য পালন কর্‌ছেন, তা নিয়ে দু'চার কথা বলা আবশ্যক। বাপ-মা তো স্কুলে ছেলে পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত থাকেন—ছেলের ভিতরে যে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তার খোঁজ তাঁরা বড় একটা রাখেন না। স্কুলে তো মাষ্টারের মত নিঃসম্পর্ক জীব দুনিয়ায় বোধ হয় আর দুটী নাই। এমন অবস্থায় ছেলেরা যেমন সঙ্গী বেছে নেয় বা বেছে নিতে বাধ্য হয়, তারা সবাই যে বাপমায়ের খুবই পছন্দসই হবে, এই কি তাঁরা আশা কর্‌তে পারেন? যদিও মেনে নিই যে, ভালমন্দ দুই সব জায়গাতেই আছে, তবুও স্কুলের গণ্ডীতে যারা ভাল তারা নিছক মন্দদের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, এমন দৃষ্টান্ত ক'টা দেখাতে পারবেন? যারা সঙ্গদোষে মন্দ হল, তাদের শাসন করবার ভার কার উপর? কিম্বা আদপেই যে তারা মন্দ

হল, সে দোষ কার কাঁধে চাপানো হবে? বাপ-মা স্কুলের মাইনে দিয়েছেন, তাঁরা দোষ ত্রুটীর বোঝা বইতে যাবেন কেন? আর মাষ্টার ছেলে পাশই করিয়ে দিচ্ছেন, তার ভালমন্দ দেখবার গরজ তাঁর হলে পোষায় কি করে! কাজেই আমাদের ছেলেপিলেরা যদি বে-ওয়ারিশ মাল হয়ে একেবারে পয়মাল হয়েই যায়, তাহলে আমরা দায়ী করব কাকে? দায় যখন কারুরই না, তখন এটা সমষ্টিভাবে আমাদের দায় হওয়া উচিত নয় কি?

স্কুলের আবহাওয়া হতে হয় ছেলেকে বাঁচাবার জন্য অত্যন্ত সচেষ্ট হতে হবে, নয়ত যাতে ঐ আবহাওয়াটাই বদ্‌লে যায়, সমগ্র দেশের শক্তি সেই দিকেই নিয়োগ করতে হবে। শুধু ব্রহ্মচর্য্যবিরোধী সঙ্গই তো নয়—আমরা আগেই বলেছি, আবারও বল্‌ছি, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর আতিশয্যভার সারা জীবনটাকেই ব্রহ্মচর্য্যবিরোধী করে তুল্‌ছে—আচারে ব্যবহারে কোনও দিক দিয়েই প্রবৃত্তির তাড়না হতে মানুষকে মুক্তি দেবার উপায় সে রাখেনি। তারপর মনের খোরাক যোগাবার যে বন্দোবস্ত স্কুলে রয়েছে, তাতেই বা আমরা কি দেখতে পাই? যে বিজাতীয় ভাষা ও ভাবের উপর শিক্ষাবিভাগের এত দম, তা গোড়া হতেই ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী চিত্রগুলিই মনের সামনে ধরে কল্পনাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। মানুষকে অমানুষের পথে নামিয়ে আনবার প্রশস্ত সোপান রচনা করাকেই কি আমরা বলব শিক্ষা?

শিক্ষার গলদ

শিক্ষার কেন্দ্র বলতে আমরা বুঝি স্কুল আর কলেজ বা তেমনিতর একটা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ছেলে জন্মালে পরেই তো তাকে স্কুলে পাঠানো চলে না—অথচ স্কুলে যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়টা যে বিনা শিক্ষায় কাটবে, এমন কথাই বা কে সাহস করে বলতে পারে? তা ছাড়া, স্কুলে সব রকম শিক্ষাও হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়। বিশেষতঃ আমাদের দেশে যে স্কুলশিক্ষার রীতি প্রচলিত আছে, তাতে সকল শিক্ষার মূল মনুষ্যত্ব শিক্ষাকেই সযত্নে বর্জ্জন করে ছেলের ঘাড়ে কেবল কতকগুলি অবান্তর বিদ্যার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর সে দেওয়ার কায়দাটাও এমন বিশ্রী যে, তাতে ছেলের জীবনে না ফোটে ধর্ম্ম, না ফোটে কর্ম্ম, না ফোটে শিল্প। এমন অবস্থায় অধিকাংশ ছেলের মা-বাপ ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়েই যখন নিশ্চিন্ত হন, তার পূর্ব্বেও ছেলের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করেন না, পরেও করেন না—তখন এই ভেবে আমাদের দুঃখ হয় যে, পরনির্ভরতায় আমরা এতদূর অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছি যে, আপন ছেলের ভালটুকুও আমরা পরের হাতে পয়সা দিয়ে করিয়ে নিতে পারলেই নিশ্চিন্ত থাকি।

অবশ্য সাধ্যাসাধ্যের একটা কথা এখানে ওঠে। ছেলের শিক্ষার ভার শেষ পর্য্যন্ত আপন হাতে রাখা সাধ্যে কুলিয়ে ওঠে না বলেই আমরা পরের হাতে তাকে সঁপে দিই। সমাজ গড়তে গেলে এমনি পরস্পরের সহায়তা নিয়ে চলতে হয়, তাও মানি। কিন্তু কথা হচ্ছে, শিক্ষার জন্য ছেলেকে ঘরের বার করতে বাধ্য হলেও, যতক্ষণ সে ঘরে আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থাকি কেন? শিক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্ত আজগুবি ধারণা আমাদের মাঝে আছে, সেগুলিই হচ্ছে

ঔদাসীন্যের মূল। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতির মোহে আমরা এমনি আচ্ছন্ন যে, এগুলি ছাড়া অন্যত্রও যে জীবনের কোনও একটা সার্থকতা থাক্‌তে পারে, তা আমাদের মনেই আসে না। মনুষ্যত্ব না জন্মালে কেবল বিদ্যা হলেই কি সব হয়? ইতিহাসের দু'পাতা আর বিজ্ঞানের চার পাতা কি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের সমাধান কর্‌বে, আমার ইহকাল পরকালের উপায় করবে?

বাস্তবিক আমরা অতিমাত্রায় ইহসর্ব্বস্ব হয়ে পড়েছি বলেই ইহকালের শিক্ষার চটকটাই কেবল নজরে আসে। অথচ সমাজ হিসাবে, ধর্ম্ম হিসাবে, নীতি হিসাবে সে শিক্ষাও যে সম্পূর্ণ হয়, তাও তো দেখি না। বছর বছর এক বাংলা হতেই হাজার গ্র্যাজুয়েট বিদ্যার ভারে কুব্জ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বেরিয়ে আসে, কিন্তু তার মাঝে ধার্ম্মিক, চরিত্রবান্‌, সত্যাশ্রয়ী, মেরুদণ্ডবিশিষ্ট মানুষ থাকে কয়টা? আপনার উদর পোষণের করুণ প্রয়াস ছাড়া সমাজের হিতের দিকে দৃষ্টি দেবার শক্তি থাকে কয়জনার? যে দেশে বিদ্যার ছাপওয়ালা মানুষের সংখ্যা এত বেশী, সে দেশের মানুষ শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ধর্ম্মে, নীতিতে এমন হীন হয় কেন? হাজারকরা কয়টা লোক লেখাপড়ার কসরত শিখে নিয়েছে, তাই দিয়ে কি শিক্ষার উন্নতির পরিমাণ হবে? আর এই যে ইহসুখপরায়ণ দুশ্চরিত্র নাস্তিকের সংখ্যা দেশে বেড়ে চল্‌ছে, একেই কি শিক্ষার সুফল বল্‌ব?

আমরা স্ত্রীজাতিকে লেখাপড়া শিখাইনি, ছোট জাতকে দেবনাগরী অক্ষর পরিচয় করাইনি—এই কথা নিয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্য সম্বন্ধে কত কথাই শুন্‌লাম। কিন্তু মেয়েরা লেখাপড়ায় উভয়ভারতী না হয়েও যে একমাত্র সতীত্বের, সংযমের গৌরবে জাতটাকে ধ্বংসমুখ হতে রক্ষা করে এসেছে—এখনও আস্‌ছে—তাকে কি কুসংস্কার আর

কুশিক্ষার ফল বল্‌ব ? যে দেশের ছোট জাতের মাঝেও কত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে, সে দেশের শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থাকে কি হীন বলব ? আমরা এমন কথা বল্‌ছি না যে মেয়েদের বা অনুন্নত (?) জাতদের লেখাপড়া শিখিও না। লেখাপড়া যত পার শিখিও, কিন্তু তাদের মাঝে যাতে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, ইহকাল পরকালের উপায় হয়, এমন শিক্ষার ব্যবস্থাই আগে কর। আগে মানুষ হয়ে পরে সে যত বিদ্বান্ হতে পারে। আর এ কথা মেয়ে-পুরুষ, ছোট বড় সকলের পক্ষেই খাটে।

এখনকার সঙ্গে আগেকার এই পার্থক্য যে আগে সমাজ-সংগঠনের গুণেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের শিক্ষা সমাজের সর্ব্বত্র অবাধে সঞ্চারিত হতে পার্‌ত। স্ত্রী-শূদ্রকে বেদাধিকার দেওয়া হয়নি মানে বেদের আক্ষরিক অধিকার তারা পায়নি, কিন্তু সেই বেদের তত্ত্ব তাদের শিক্ষা দেবার জন্য হিন্দু পুরাণ সংহিতায় যে বিপুল আয়োজন হয়েছিল, এতবড় লোকহিতকর অনুষ্ঠান কে কোথায় করেছে ? এই শিক্ষাব্যবস্থার ফলেই ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব সমাজের হীনতম ব্যক্তির মাঝেও আত্মপ্রকাশ কর্‌তে পেরেছে। নিজ নিজ অধিকারের মাঝে সংযত থেকে এত দিন ধরে এত বিপ্লবের মাঝেও যে এই বৃহৎ সমাজকে সকলে স্বচ্ছন্দে ও সুশৃঙ্খলায় বহন করে আন্‌তে পেরেছে—জাতি হিসাবে, সমাজ হিসাবে এত বড় লাভটাকে কি আমরা বল্‌ব কুশিক্ষা আর কুসংস্কারের ফল ? সুশিক্ষা আর সুসংস্কারের ফলে আজ তো দেখতে পাচ্ছি, ঘরে ঘরে হাহাকার উঠ্‌ছে—কেবল গুটীকতক লোকের সুবিধা হয়ে বাকী সমস্তটা দেশই অরাজকতা আর উচ্ছৃঙ্খলতায় দুঃখময় হয়ে উঠেছে।

আজ আমাদের সমাজ ভেঙ্গেছে, ঘর ভেঙ্গেছে। যেমন একদিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে শিক্ষার বিপ্লবেই আমাদের এ সর্ব্বনাশ ঘটেছে, তেমনি

আজ সামাজিক ও পারিবারিক দুর্ব্বলতার দরুণ শিক্ষাবিপ্লবেরও কোনও সমাধান হতে পারছে না। পূর্ব্বে সমাজদেহে ও পরিবারে ভাবের ঐক্য-বন্ধন ছিল; কিন্তু আজ সেখানে কত রকমের মতভেদের সৃষ্টি হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নাই। মতের পার্থক্যে উচ্ছৃঙ্খলতা যত বাড়ছে, ততই মানুষ চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে বিচারহীন ও উদাসীন হয়ে পড়ছে। জীবনের গতিই যেখানে অনিয়ন্ত্রিত, শিক্ষার সেখানে আর কি গতি হবে? কাজেই দেখ্‌তে পাই, ব্রাহ্মণসন্তান যদি পূর্ব্বপুরুষের সমস্ত আচারবর্জ্জিত হয়েও রাক্ষসী বিদ্যার অর্জ্জনে বেশীরকম অনুরাগ দেখায়, তবে আমরা সময় সময় মৌখিক একটু আধটু দুঃখপ্রকাশ করলেও কার্য্যতঃ বড় কিছু করতে চাই না।

যে ঢেউ আজকাল দেশে এসেছে, তার সঙ্গেই সব ভাসিয়ে দেব, না প্রাচীনকালের কথা স্মরণ করে আত্মরক্ষা করে চল্‌ব—এই হচ্ছে সমস্যা। সমাজ দুর্ব্বল বলেই এ সমস্যার কোন মীমাংসা হচ্ছে না। আর এই দোটানা ভাব পারিবারিক জীবনে ঢুকে গৃহের ভিত্তিকে পর্য্যন্ত দুর্ব্বল করে ফেলেছে। এই জন্য দেখি, আমরা ঘর-সংসার চালাই কতকটা বিলাতী কায়দায়। কাজেই সংশয় রেখে চলতে গিয়ে জীবনের গুরুত্ব সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ আমাদের চলে যাচ্ছে। ফলে শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে নিরেট একটা ব্যবস্থা আমাদের দ্বারা হয়ে উঠছে না। রাজসরকার থেকে যে রকম দোঁআসলা ব্যবস্থা হচ্ছে, আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে তা মেনেও নিচ্ছি, আবার তাকে গালও দিচ্ছি।

এই দুর্ব্বলতার জন্য সমাজকে দায়ী করতে হলে আজকে তো আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না! কাজেই এর জন্য পরিবারকেই আমরা দায়ী করছি। সন্তানকে যারা সংসারে এনেছে, তার কল্যাণচিন্তা, তার শিক্ষাব্যবস্থা তো তারাই করতে বাধ্য। ছেলেকে সরকারী প্রতিষ্ঠানে

ঢুকিয়ে দেবার সময় যে যুক্তিই দেখাও না কেন, তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তার শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তো তুমিই দায়ী। ছেলে যে বংশে, যে সমাজে, যে দেশে জন্মেছে, তার একটা মর্য্যাদা নিশ্চয়ই আছে, এবং সেই মর্য্যাদা সে যাতে কিছুতেই ক্ষুণ্ণ না করে, এমন শিক্ষাও তার প্রয়োজন। কিন্তু সে শিক্ষা কি বাইরে হবে? বিদেশী রাজা আমাদের ব্যক্তিগত আচার বা ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করতে চান না, সে ভালই মানলাম। কিন্তু আচার আর ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে যে শিক্ষার ব্যবস্থাটা হল, তাতে আমাদের মনুষ্যত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে কতটুকু? শিক্ষার এই ক্রটী রাজাও পূরণ করবেন না, বিশৃঙ্খল সমাজও তা করতে অসমর্থ, তবে এ দায়িত্ব বহন করবে কে? এর জন্য যদি পরিবারকে দায়ী না করি, তবে করব কাকে?

অনেক সময় আবার পরিবার বলেও একটা সংহতি খুঁজে পাওয়া যায় না। কুশিক্ষার প্রভাবে একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলি দিন দিন ধ্বংসের পথে যাচ্ছে—বংশমর্য্যাদা বা পূর্ব্বপুরুষের গৌরববোধও তার সঙ্গে ম্লান হয়ে আসছে। আজকাল বহু পরিবার বিলাতী প্রথানুযায়ী শুধু একটী নর আর একটী নারী নিয়ে। এমন অবস্থায় আত্মসুখচিন্তাটা যদি বড় হয়ে উঠে, তা তো আশ্চর্য্য কিছুই নয়। আত্মসুখচিন্তাই তো মানুষকে ইহসর্ব্বস্ব করে তোলে। পারিবারিক জীবনের এমন দুর্দ্দশা হলে শুধু পরিবারের উপরই সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব ফেলে তো নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। কাজেই অবশেষে পিতামাতাকেই সব রকমে দায়ী করা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

আগে যেখানে সমস্ত সমাজের বা বহুকুটুম্ব পরিবারের শিক্ষার দায়িত্ব ছিল, সেখানে দায়িত্বভার এসে পড়েছে শুধু পিতা আর মাতার উপর। এতে তাদের পক্ষে সমস্যা যেমন জটিল হয়েছে, তার মীমাংসার জন্য তেমনি অধিকমাত্রায় চেষ্টা ও যত্নেরও প্রয়োজন হয়েছে। অথচ

শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি সব দিক দিয়ে বাপ-মাও এমন বিড়ম্বিত যে যতটুকু চেষ্টা হওয়া উচিত, তাও তাদের দিয়ে হয় না। কিন্তু চেষ্টার অভাবের জন্য কেবল বর্ত্তমান অবস্থাকেই দোষী করা চলে না। আসল দোষ পিতামাতার আলস্য আর পরনির্ভরতা। সন্তান সম্বন্ধে পিতামাতাকে আরও সচেতন হতে হবে। অবস্থা সঙ্কটময় বলেই তো চেষ্টার আরও জোর হওয়া উচিত।

পিতামাতা এই কথাটী স্মরণ রাখবেন যে, একটু ইংরেজী শিখবার জন্য বা একটা কেরাণীগিরি জোটাবার জন্য যদি ছেলেকে স্কুলে পাঠানো নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তাতে আপত্তি নাই; কিন্তু এই স্কুল কলেজের বহির্ম্মুখী শিক্ষাটাকেই চরম ভেবে তাঁরা যেন নিশ্চিন্ত না থাকেন। তাঁদের এইটুকু মনে রাখতে হবে যে, আজ অবস্থাবৈগুণ্যে তাঁদের সন্তান সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন, বংশধারার গৌরব হতে বিমুক্ত, দেশাত্মবোধহীন। তাঁরাও ঠিক এমনি দুর্দ্দশাপন্ন। এমন অবস্থায় দেশের, সমাজের, বংশধারার অনুকূল জাতীয় শিক্ষার ভার তাঁদেরই বিশেষ করে নিতে হবে। সকলের চেয়ে বড় কথা, চার্ব্বাক সভ্যতার বিষময় ফলে আমাদের আধ্যাত্মিক দৈন্যেরও সীমা নাই; এই দৈন্য ঘুচাবার জন্য ধর্ম্মশিক্ষার ভারও তাঁদেরই নিতে হবে। অন্ততঃ যতদিন পর্য্যন্ত ছেলেকে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না পাঠাচ্ছেন, ততদিন পর্য্যন্ত—ছেলে ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে—সব রকম শিক্ষার ভার তাঁরা নিতে বাধ্য। সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার প্রতি ঘরে থাকবে পিতামাতার ঔদাসীন্য, আর বাইরে থাকবে স্কুলকলেজের ঔদাসীন্য; তবে ছেলে মানুষ হবে কোথায়? গুরুগৃহবাস পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করলেও সমস্যার মীমাংসা হবে না—যদি পিতামাতা শৈশবেই সব রকম শিক্ষার বীজ সন্তানের হৃদয়ে বপন না করেন।

সন্তানের শিক্ষা

সন্তানের বাপ মা অনেকেই হয়, কিন্তু বাপ মা হওয়ার দায়িত্ব কতটুকু, তা সকলে বুঝে না। সন্তান চায় সকলেই, এমন কি দশ বছরে মেয়ের বিয়ে হয়ে বার বছরে যদি তার ছেলে না হয়, তা হলে প্রবীণা গৃহিণীরা বংশলোপের আশঙ্কায় দশদিক অন্ধকার দেখেন ;—কিন্তু সন্তান যে চাই কেন, তা তো কেউ তলিয়ে দেখে না। অনেক কামনাই জীবের স্বাভাবিক—পিতামাতার পক্ষে সন্তানকামনাও তাই। কিন্তু প্রত্যেক স্বাভাবিক কামনার প্রেরণার সঙ্গে যে কর্ত্তব্যটুকু জড়ান রয়েছে, তা যদি চোখে না পড়ে, তাহলে কামনার দুঃখটাই কেবল কপালে ঘটে, ভোগের সুখটুকু আর মিলে না। গৃহী সন্তানকামনা ছাড়তে পারে না, ছাড়তেও কেউ বলে না—কিন্তু কামনার ভিতর দিয়েও যে ভগবান্ আমাদের উন্নতির পথে আকর্ষণ করছেন, সেটুকু না বুঝে কেবল দায়িত্বহীন কামনা করে গেলেই তো আমরা স্বস্তি পাব না। শাস্ত্র পুত্রোৎপাদন ধর্ম্ম বলেছেন এবং এই ধর্ম্মে প্রত্যবায় না ঘটে, তার জন্য পুন্নাম নরকের বিভীষিকাও দেখিয়েছেন। শাস্ত্রকারের ভাষায় ধর্ম্ম যদি দিব্যপ্রেরণাসম্ভূত ও অভ্যুদয়ের নিদান হয়, তবে তার সম্পর্কিত কর্ত্তব্যও অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠে। স্বভাবের বশে যে কোনও কামনাই আমাদের মনে আসে না কেন, তাকে যদি ধর্ম্ম আখ্যা দিই, তবে তার আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্যগুলির কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

সন্তান পিতামাতার কাছে এক মহানন্দময় দায়িত্বস্বরূপ। পিতামাতার শুধু ধারণ আর পোষণের দায়িত্বই নয়, শিক্ষার দায়িত্বও তাঁদেরই। অতি নিঃসহায় একটী জীব ভগবান তাঁদের হাতে তুলে

দিয়েছেন, তার মাঝে ভগবানের শুভেচ্ছার বীজ নিহিত রয়েছে—স্নেহে, কল্যাণে তাকে অঙ্কুরিত করে তুলবার জন্য। আমরা বড় হয়ে এখন বুঝেছি, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব, ব্রহ্মত্ব লাভ করা আমাদের লক্ষ্য! আজ বড় হওয়ার পরেই যে এই লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে, তা তো নয়, আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই লক্ষ্য নিয়েই জন্মেছিলাম। আমি তখন তা বুঝতে পারিনি, কাজেই সেই মতে চলতে পারিনি, কিন্তু পিতামাতাকে তো ভগবান আমার হয়ে বুঝবার ভার দিয়েছিলেন। প্রত্যেক পিতামাতা যদি নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে সন্তানের কথা এই ভাবে ভাবেন, তবে সন্তানের প্রতি তাঁদের কর্ত্তব্য কত বেড়ে যায়। অতি শৈশব হতে এমন কি গর্ভস্থ ভ্রূণের অবস্থায়—চাই কি তারও পূর্ব্বে গর্ভাধানের সময় হতে মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্যের কথা স্মরণ করে একটা মনুষ্যজীবনের পত্তন করতে হলে পিতামাতাকে কত উচ্চভূমিতে অবস্থান করতে হয়, তা সকলেরই চিন্তার বিষয়।

যা অপরের মাঝে অপরিস্ফুট রয়েছে, আমাদের পরিস্ফুট বৃত্তির সহায়ে তাকে ফুটিয়ে তোলাকেই না আমরা বলি শিক্ষা। আমরা অপরের মাঝে কোন্ জিনিষটা ফুটিয়ে তুলতে চাই—আমাদের মাঝেই বা কোন্ জিনিষটা ফুটে উঠলে আমরা নিজকে সার্থক মনে করি? ধর্ম্মভাব, সত্যভাব আমাদের মাঝে ফুটুক, এই আমরা চাই। এ কথা সকলে বোঝে না—আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জীবনের আর সকল উদ্দেশ্যেরই বিরোধ আছে, এটা অধিকাংশ লোকেরই ধারণা। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আত্মা সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং যে যতই বলি না কেন, তাঁকে ছেড়ে আমরা যেমন কিছুই করতে পারি না, তেমনি তাঁর অনুশীলনের সঙ্গে জগতের কোনও কর্ত্তব্যের বিরোধ হতে পারে, এ-ও সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক থেকেও সংসার করা যায়, ধন উপার্জ্জন করা

যায়, রাজ্য পরিচালনা করা চলে। তবে দেখি কেন, সংসারের মানুষ জীবনটাকে দুই ভাগ করে এক ভাগ সংসারের জন্য, আর এক ভাগ ধর্ম্মের জন্য রাখতে চায়—সংসারে থেকে ভগবান্ মিলে না, এমন কথাই বা বলে কেন?

এর একমাত্র কারণ হচ্ছে শিক্ষার অভাব কিম্বা কুশিক্ষা। সাধারণ লোকের কাছে আধ্যাত্মিক চর্চ্চাটা এত কঠিন কসরত বলে মনে হয় কেন? —কারণ যে সময়ে যা করা উচিত ছিল, তা করবার শিক্ষা এরা পায়নি। আজ অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশ কর্‌তে গিয়ে অত বাধার সঙ্গে লড়াই কর্‌তে হচ্ছে, কিন্তু এতগুলি বাধাকে কেন স্তূপাকার হতে দেওয়া হল? এর পূর্ব্বে কি এদিকে তাকাবার কারু ফুরসৎ হয়নি? এখন না হয়, সাংসারিক দায়িত্বে দুদিকের তাল সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছে; কিন্তু ছেলেবেলায় তো সংসারের দায়িত্ব ছিল না, তখন কেন ভবিষ্যৎ জীবনযুদ্ধের উপযোগী রসদ সঞ্চয় করে রাখা হল না? শিশু এ কথাটা ভাবতে না পারলেও শিশুর পিতামাতার এ কথাটা ভাবা উচিত ছিল।

শৈশবের অবসরকালে, চিত্ত যখন ননীর মত কোমল, ভালবাসার ক্ষমতা যখন অফুরন্ত, সেই সময়ে যদি পিতামাতা আপ্রাণ চেষ্টায় সদ্ভাবের বীজ বপন করে দেন, তবে সকলেরই কর্ম্মজীবন সুখের হতে পারে—সংসারে থেকেও ভগবান লাভের একটা সুরাহা হতে পারে। ধর্ম্মলাভের এমন অখণ্ড অবসর পরে আর কখনও মিলবে না। আর গোড়ায় এই শিক্ষা নিয়ে মানুষ হতে পারলে ভবিষ্যতের কোন সঙ্কটেই পর্য্যুদস্ত হবার আশঙ্কা থাকে না।

সন্তান সম্বন্ধে মায়ের চেয়ে পিতার চিন্তা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি বেশী দেখা যায়। ভবিষ্যতে ছেলের অন্নসংস্থান কর্‌বার জন্য পিতা যতটা ব্যস্ত হন,

তার অধ্যাত্মজীবনে পাথেয় সঞ্চয়ে তাঁকে ততটা মনোযোগী দেখা যায় না। এই অবিবেচনার ফল পিতাপুত্র উভয়কেই ভোগ কর্‌তে হয়।

বাবা মা ছেলেকে ভালবাসতে জানেন, কিন্তু কেন যে ভালবাসেন, তা বুঝেন না। এই অন্ধের মত ভালবাসাতেই তো সর্ব্বনাশ হয়। অজ্ঞানের ভালবাসায় সকল কর্ত্তব্যবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়—ও তো ভালবাসা নয়, ও হচ্ছে রাক্ষসী মায়া। ভালবাসায় আমার সুখ, তাই আমি ভালবাসি। আমার সুখ তো সংস্কার অনুযায়ী—তা কল্যাণ, কি অকল্যাণ তা বুঝব না, যতদিন পর্য্যন্ত নিজকে না জানব। আমি যদি মনে করি, খেয়েদেয়েই সুখ, তাহলে আমার ছেলেকেও খাইয়ে-দাইয়ে সুখী করতে চেষ্টা করব, আর বলব, আমি তাকে ভালবাসি বলেই তার সুখ চাই। কিন্তু অজ্ঞানের ভালবাসাকেই কি সত্য ভালবাসা বলব? তাই বলছিলাম, শুধু ভালবাসতে পার্‌লেই হয় না; নিজকে জেনে ভালবাসতে পারলে, তবে সে ভালবাসায় অপরের কল্যাণ হবে।

সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হতে হলে পিতামাতাকে নিজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হতে হবে। যার ভিতরে যা নাই, অপরকে সে তা দিতে পারে না। আধ্যাত্মিক ভাবে নিজে প্রতিষ্ঠিত না থাকলে অপরের মাঝে তা সঞ্চারিত করা যায় না। তাই সন্তানকে যথার্থ মানুষ করে তুলতে হলে পিতামাতাকে আগে খাঁটী মানুষ হতে হবে। শুধু সন্তানকামনা কর্‌লেই হবে না—সন্তানের জন্য তপস্যা কর্‌তে হবে। যে তোমার ঘরে আসবে, সে তো তুচ্ছ কেউ নয়। ব্রহ্মবীজ অন্তরে নিয়ে তোমার কোলে যে ফুটে উঠবে, তাকে কি দিয়ে তুমি সেবা কর্‌বে, কোন্ পরিচর্য্যায় তাকে তৃপ্ত করবে? সন্তানের মাঝে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ কর, তোমার প্রাণের সমস্ত চেষ্টা, যত্ন, শ্রদ্ধা তাঁকে সমর্পণ কর—তোমার পবিত্র, অতন্দ্রিত সেবায় তাঁকে জাগিয়ে তোল—

তবেই না কুলং পবিত্রং বসুধা কৃতার্থা হবে! আর তা না করে হেলায় অশ্রদ্ধায় যদি আজ নারায়ণকে ফিরিয়ে দাও, তবে তোমার সেবার ত্রুটির যে নিদারুণ অভিশাপ, তা ইহলোকে পরলোকে বজ্রের মত তোমাকে দগ্ধ করবে। তোমার অবিবেচনায় অবহেলায় একটা জীবন পণ্ড হয়ে গেল—এ অপরাধের শাস্তি কত গুরুতর, তা জান কি? তোমার সেবায় এই সন্তানের ভিতরে কি না ফুটত, তোমার আকুল আকাঙ্ক্ষায় কি না হতে পারত? অথচ এই ফুটিয়ে তুলবার সুযোগ তোমারই সব চেয়ে বেশী—কেননা ভালবাসার পরশমণি যে তোমার মাঝে রয়েছে। ভগবান্ জীবস্বভাবের ভালবাসাটুকু তোমার মাঝে ঢেলে দিয়ে আর এই একটি অস্ফুটন্ত জীব তোমার কোলে দিয়ে যে মহাকর্ত্তব্যের সূচনা করে দিয়েছেন, সেই কর্ত্তব্যের পথে হে পিতর্নিবোধ, হে জননি জাগৃহি!

শিক্ষা

তৃতীয় পর্ব্ব—সমাধান

শিক্ষার বনিয়াদ

মানুষ মনে মনে একটা আদর্শ রচনা করে সেই অনুযায়ী বাস্তব জগৎটা গড়ে তুলতে চায়। এতে সব সময় যে সে কৃতকার্য্য হয়, তা নয়। প্রায়শঃই দেখা যায়, আদর্শে ও বাস্তবে সন্ধি হচ্ছে না। বিরোধটা যে স্বেচ্ছাকৃত তাও বলা চলে না, আদর্শ পূর্ণভাবে ফোটে না; এ যেন কতকটা এই ভবেরই গতিক। এ অবস্থায় নিরাশ হয়ে আদর্শ ছেড়ে দেওয়াও যেমন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, ক্ষুব্ধ হয়ে বাস্তবটাকে গাল দেওয়াও তেমনি সুবিচার নয়। আদর্শের দিকে দৃষ্টি রেখে, যতটা পারি বাস্তবকে সাম্‌লে চলাই আমাদের কর্ত্তব্য। হয়ত আমাদের অনিষ্পন্ন কাজ ভবিষ্যৎ যুগের দ্বারা সম্পন্ন হবে; কিম্বা হয়ত সমষ্টিভাবে একটা আদর্শ সফল না হলেও ব্যষ্টিভাবে তা সফল হতে পারে—অধিকাংশের বিফলতাকে সেখানে বিবর্ত্তনেরই একটা ধাপ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এই কথাগুলি শিক্ষাক্ষেত্রেও আমরা আরোপ করতে চাই। শিক্ষার ফলে মানুষ যত নিরায়াসে এবং যত শীঘ্র সম্ভব প্রকৃত মানুষ হোক—এইটী আমাদের শিক্ষার আদর্শ। মানুষ মানুষের ঘরে মায়ের কোলেই জন্মায়, বিদ্যালয় ফুঁড়ে গজায় না। সুতরাং তার শিক্ষার পত্তনটা যে ঘরেই হবে, এবং তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব যে যারা তাকে জগতে এনেছে তাদেরই, এ কথাটা সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন দেখি, একটা

বিশেষ বয়সে শিশুকে ঘর হতে ইস্কুলে হিঁচড়ে আনা হচ্ছে, তখন ভাবি, এটাও বোধ হয় প্রয়োজন—ঘরে শিক্ষার কমতি আছে বলেই বাইরে থেকে তার পূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এখানেই একটু খট্‌কা লাগে। ঘরে শিক্ষার কম্‌তি কোথায় হয়, কেনই বা হয় তার একটা হিসাব নেওয়া কি প্রয়োজন নয়? কথাটা বলছি এই জন্য যে, ঘরে কিছু হবে না, এমন একটা নিশ্চেষ্ট নিরাশার ভাব আমাদের মনের মাঝে চির-কালের জন্য যেন বাসা বেঁধে আছে, এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও ধরে নিই যে বাইরেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। অতএব বাপমায়ের কর্ত্তব্য, ছেলে যখন একটু নড়তে চড়তে শিখবে, তখন তাকে ইস্কুলে পাঠিয়েই সমস্ত ভাবনার ইতি করা। আমাদের মনে হয়, এইখানেই শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ছেলে বাপমায়ের; তাঁরা যখন বিবেচনা না করেই অক্ষমতার জবাব দিয়ে বসেন এবং অপরের সক্ষমতায় বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত হয়ে যান, তখন হতে শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আর তো তাঁরা মাথা ঘামাতে চান না। এর পরে শিক্ষার ব্যবসায়ে যদি ফাঁকি চলে এবং তাতে ছেলেদের সর্ব্বনাশও হয়, তবে অদৃষ্টকে দোষী করা ছাড়া তো আর কোনও উপায় থাকে না। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে পিতামাতা শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন, তা বল্‌ছি না; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই যে অভিভাবকদের ব্যক্তিগত চেষ্টার খুবই অভাব, তার প্রমাণ চারিদিকেই দেখ্‌তে পাচ্ছি। শিক্ষা দেওয়াটা প্রকৃতির আইনে যাঁদের গরজ হওয়া উচিত ছিল, তাঁরা নিশ্চেষ্ট বলেই শিক্ষা সম্বন্ধে মামুলী ধারাটার কোনও উন্নতি আমাদের দেশে হতে চায় না।

আমরা প্রথমে এই প্রশ্ন করি, পাঁচবছরের ছেলেকে যখন ইস্কুলে পাঠান হল, তখন ঘরে শিক্ষার কমতি ছিল কোথায়? এবং সে কমতি পূরণ করবার কি কোনও উপায়ই ছিল না? তখনই হিসাব কল্লে

দেখতে হয়, আমার ছেলেটাকে কি শেখানো প্রয়োজন। প্রথমতঃই মনে হয়—ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো প্রয়োজন। যদি জিজ্ঞাসা করি, কেন? তাহলে গোড়াতেই অর্থোপার্জ্জনের কথাটা হয়ত মনে আসবে না; কেননা কচি ছেলে রোজগার করে খাবে বা খাওয়াবে, মমতা বশতঃই আমরা এ কথাটা ভাবি না। তবে লেখাপড়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য বোধ হয় যে, ছেলেটা মানুষ হবে। কিন্তু লেখাপড়া শিখলেই যে ছেলে মানুষ হয় না, এ-ও তো আমাদের দেখা আছে। সুতরাং লেখাপড়া শেখানো ভদ্রসমাজের একটা আদব কায়দা বল্‌তে পারি। লেখাপড়ায় বুদ্ধি মার্জ্জিত হবে, চিত্ত শুদ্ধ হবে, জ্ঞান আয়ত্ত হবে—এ সমস্ত কথা বোধ হয় আমাদের মনের ত্রিসীমাতেও উঁকি দেয় না। লেখাপড়া না শেখানো একটা লজ্জার কথা—এই ভাবটাই তো দেখি; কিন্তু শিখিয়ে কি হয়েছে, না শিখয়েই বা কি হয়েছে, তার বিচার তো করতে দেখি না। পড়াতে গিয়ে এমন কত কিছু পড়াই, যা হয়ত জীবনে কোনও কাজেই লাগবে না—এমন কি মনের ডিসিপ্লিনের দিক দিয়েও না। অথচ ভদ্রসমাজে চল আছে বলে শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে সেগুলো আমরা বাদ দিই না। ছেলে যখন আর একটু বড় হয়, তখন লেখাপড়ার সঙ্গে অর্থচিন্তাও এসে জোটে। পাশ দেবে, রোজগার করবে—এই তখন আদর্শ। লেখাপড়ার এই দুই উদ্দেশ্য অর্থাৎ ভদ্রসমাজের চাল বজায় রাখা ও অর্থোপার্জ্জনের যোগ্যতা অর্জ্জন করা—এ দুটি ডিঙ্গিয়ে গেলে পর, তার তৃতীয় উদ্দেশ্য হতে পারে জ্ঞানোপার্জ্জন, চরিত্রগঠন, চিত্তশুদ্ধি ইত্যাদি। কিন্তু ঠিক এই শেষের উদ্দেশ্য নিয়ে গোড়া থেকে শিক্ষার পত্তন করা—এ আমাদের মাথায় আসে না।

শিক্ষার মূলসূত্র সম্বন্ধে যদি চিন্তা করি, তাহলে বলতে পারি, সব রকমে জীবনটাকে বর্ত্তমান পরিস্থিতির উপযোগী করা—এই হল শিক্ষার

প্রথম সূত্র। এর জন্যই পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত জ্ঞানের সন্ধান নিতে হয়, নইলে জীবন পরিচালনা করবার কোন সঙ্কেত পাওয়া যায় না। এইটুকু আয়ত্ত হলে পর, দ্বিতীয় সূত্র—পরিস্থিতিকে আমি যেমনটি পেয়েছিলাম, তার চেয়েও উন্নত করে যাওয়া। এই কাজটা ভবিষ্যৎ যুগের প্রতি লক্ষ্য রেখে; যাঁরা মহামনা, তাঁরাই এটা পারেন। সাধারণ লোক শিক্ষার প্রথম সূত্র আয়ত্ত করতেই ব্যস্ত থাকে। বর্ত্তমান পরিস্থিতির উপযোগী হতে হলে বিদ্যা দরকার, এবং করে খাওয়ার যোগ্যতা দরকার—এই কথাটা প্রথমতঃই মনে জাগে। তারপর মনে হয়, চরিত্রও দরকার; কতকগুলি মানসিক গুণ অর্জ্জন না করলে জগতে লড়াই করে টিকে থাকা বড় সহজ নয়। সাধারণতঃ শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের চিন্তার ধারা এর বেশী এগোয় না। দ্বিতীয় সূত্রটী আমরা প্রায়শঃ বর্জ্জন করেই চলি। প্রথম সূত্রটী বল্‌তে পারি, শিক্ষার বাস্তব দিক। এ না হলে যে চলে না, সে কথা অবশ্য একশ' বার স্বীকার করি।

শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন—এটা সূক্ষ্ম কথা, অনেকের কাছে হয়ত ফাঁকা বুলিও। সুতরাং এ কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। শিক্ষার উদ্দেশ্য বিদ্যা এবং অর্জনশক্তি—এই ধরেই জিজ্ঞাসা করি, এই শিক্ষা কখন থেকে হওয়া উচিত এবং ঘরে তার ব্যবস্থা কতদূর সম্ভব? এ সম্বন্ধে একটা সন্তোষজনক উত্তর পেলেই আমরা বুঝতে পারবো, ঘরে শিক্ষার ত্রুটি কোথায় হয় এবং বাইরে থেকেই বা তার পূরণ কি করে হয়।

গোড়াতেই আমাদের নজর চলে যায় বহু দূর দূরান্তরে। বিদ্যা বল্‌তে হয়ত একেবারে এম এ, বি এ কে লক্ষ্য করে বস্‌ব; অর্জ্জনশক্তি বল্‌তে হয়ত ওকালতি ডাক্তারি ইত্যাদি একটা কিছু বড় ব্যবসার কথা ভেবে বস্‌ব। বিদ্যার বা ব্যবসার ওস্তাদ ঘরে ঘরে মিলে না। একটা অঞ্চলে হয়ত একজন ওস্তাদ আছেন; সবারই ইচ্ছা, শিক্ষাটা

তাঁর হাতে হয়। ওস্তাদ গিয়ে সাকরেদদের বাড়ী বাড়ী শিখিয়ে আসতে পারেন না; কাজ আর সময়ের সুবিধার জন্ম সাক্‌রেদদেরই ওস্তাদের কাছে আস্‌তে হয়। তখনই শিক্ষাক্ষেত্রকে ঘর হতে বাইরে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজন হয়। শুধু একজন ওস্তাদ ধরেই কথাটা বল্‌ছি না। যে কোনও উন্নত ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে এই কথাটা খাটে। আজকাল শিক্ষার সাজসরঞ্জামগুলো দেশ বিদেশ হতে সংগ্রহ করে এক জায়গায় জড় করা হয়েছে এবং শিক্ষার ব্যবসাও সুরু হয়েছে। বড় দোকানদারেরা দোকানে বসে বেচাকেনা করে, বাড়ী বাড়ী ফেরি করতে যায় না। আজকাল শিক্ষার ব্যবস্থা তাই দিন দিন বাড়ী হতে নির্ব্বাসিত হতে সুরু হয়েছে। কাজটা যে খুব মন্দ হচ্ছে, তা বলছি না। গুণীর কাছে শিক্ষা পেতে যদি ঘর ছাড়তে হয়, ছাড়বে বই কি? কিন্তু এই সঙ্গে প্রাচীন সমাজব্যবস্থার একটু আলোচনা করতে চাই।

কিছুদিন আগেও গৃহশিক্ষার এতটা অভাব বোধ হয় ছিল না। বিদ্যা বা ব্যবসা—দুটোই ঘরে না হোক, গাঁয়ে থেকে শেখা যেতো। বাপের কাছে দুয়েরই হাতে খড়ি চল্‌ত। তখন জাতব্যবসা ছিল, কুটীরশিল্প ছিল, সমাজের মাঝে পারিবারিকসঙ্ঘ ও প্রতিপত্তি প্রবল ছিল, সুতরাং অনেকদূর পর্য্যন্ত শিক্ষাটা বাড়ী থেকেই চল্‌ত। কিন্তু আজকাল নানা কারণে সমাজের কেন্দ্র গ্রাম ছেড়ে সহরের পানে সরে যাচ্ছে। গড়নের চেয়ে ভাঙ্গনের ঝোঁকটা বেশী দেখা দিচ্ছে। এর ফলাফল কি হবে, তা সর্ব্বমঙ্গলাই জানেন। কিন্তু আপাততঃ একটা ফল দেখ্‌তে পাচ্ছি যে এতে পারিবারিক জীবনে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও শৈথিল্য খুব বেড়ে যাচ্ছে, এবং তাতে শিক্ষা সম্বন্ধে খুবই ক্রটী ঘটছে। এম্ এ পড়বার কলেজ বাড়ছে—সেটা সুলক্ষণ বটে; কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ওই প্রগাঢ়তা ফলের দিকে হওয়াতে ছেলেপিলের সাধারণ বর্ণপরিচয়টা

করাতে পর্য্যন্ত চেষ্টার শৈথিল্য দেখা যাচ্ছে। ওটাও আজকাল ইস্কুলের Infant Classর ওপর বরাত দেওয়া আছে। বাবা শুধু একখানা বর্ণপরিচয় আর শ্লেট পেন্সিল কিনে দিয়ে ছেলেকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করেই খালাস।

অর্জনশক্তি বা করে খাওয়ার শিক্ষাসম্বন্ধেও এই রকম শৈথিল্য আছে। গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ভদ্রগৃহস্থের টান বেশী হচ্ছে। সহরে সভ্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করতে হয়। তাতে কলমপেশা গোলামী থেকে ডাক্তারি ওকালতি ইত্যাদি স্বাধীন পেশার প্রলোভন আছে। এখন মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে পেটে ভাত, গায়ে কাপড়—এই দুটো জিনিষ চাই-ই। যাঁরা সভ্য, তাঁরা হাতেকলমে এ দুটো যোগাড় করতে নারাজ। তাঁরা পয়সা রোজগার করবেন এবং সেই পয়সা দিয়ে সব কিনে আনবেন—মায় কাঁচা লঙ্কাটী পর্য্যন্ত। নিজের প্রয়োজন অনুসারে কোনও জিনিষ উৎপন্ন করবার স্থান, সময় বা শিক্ষার সুযোগ কারু নেই। এতে যে অন্নসমস্যার সমাধান হচ্ছে কিম্বা জাতি হিসাবে আমরা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছি, তাতো মনে হয় না। আজকাল একজন গৃহস্থের গৃহস্থালীতে সব জিনিষ কিনে আনতে হয়। তার জন্ত তো পয়সা চাই। সেই পয়সা জোটাতে গায়ে যাতে ধূলোবালি না লাগে, মাসকাবারে হিসাব দুরস্ত হয়ে টাকাটা হাতে আসে—সেই ব্যবস্থার ফিকিরেই আমরা আছি। অথচ নিজে একটু খাটলে সংসারের কত অভাব আপনা হতেই মিটিয়ে নেওয়া যায়। এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করলে ছেলেপিলের অর্জ্জনশক্তিও কি উদ্বুদ্ধ হত না? ছাইপাঁশ মুখস্থ বিদ্যার জোরে কেরাণীগিরি করে মাস গোটা ত্রিশেক টাকা রোজগার করাই অর্জ্জনশক্তির চরম পরিচয় হত?

এই সম্বন্ধে আর একটা কথা মনে পড়ে। নানাকারণে ছেলের সঙ্গে বাপের সম্পর্কটা দূর হয়ে পড়েছে। কিন্তু মায়ের সঙ্গে বহুদিন পর্য্যন্ত ছেলের তেমন ছাড়াছাড়ি হয় না। এই সময়টায় ছেলের শিক্ষার ভার মায়েরা স্বচ্ছন্দে নিতে পারেন। কিন্তু ক'টী মা তা নিয়ে থাকেন? অন্ধ মমতা দিয়ে ছেলেকে পঙ্গু করে রাখতেই তাঁরা পারেন—তাকে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেন কয়জনা? স্ত্রী-শিক্ষার কথা উঠলেই একদল বলে উঠেন, মেয়েরা কি উকিল হবে না জজ হবে যে তাদের লেখাপড়ার দরকার? লেখাপড়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের মনের গতিক ওই একটী বচন হতেই পাওয়া যায়। জজিয়তীর জন্ম মেয়েদের শিক্ষার দরকার নয়—ছেলেকে শেখাবার জন্যই দরকার। মাতৃত্বকে আমরা নারীজীবনের আদর্শ বলি। কিন্তু মাতৃত্বের যোগ্যতা কি কেবল ছেলে প্রসব করলে আর ছেলেকে খাওয়ালে-পরালেই জন্মে? রাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজ গৃহস্থালীর অঙ্গ; ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দেওয়াটাই বা নয় কিসে? এই দিক দিয়ে মায়েরা যদি মায়ের কর্ত্তব্য করতে পারতেন, তাহলে কচি কচি ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে নির্ব্বাসিত করে বা অনাত্মীয় প্রাইভেট টিউটরের জিম্মায় দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারতেন না। এক লেখাপড়া শিখ্‌তে গিয়ে সঙ্গদোষে এবং তত্ত্বাবধানের অভাবে কত ছেলের যে সর্ব্বনাশ হয়ে যায়, তা বলবার নয়। অন্ততঃ চরিত্রগত একটু দৃঢ়তা না জন্মানো পর্য্যন্ত ছেলেকে কাছে রেখে তার এদিককার অভাব পূরণ করে মায়েরা তাঁদের মাতৃত্বকে সার্থক করতে পারেন তো। শুধু শিক্ষার অভাবে দেশে নারীশক্তির কতখানি অপচয় হচ্ছে, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

এখন শিক্ষার শেষের কথাটা তুলি। বিদ্যা কিম্বা ধন, দু'টার একটাও শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য নয়—শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে চরিত্র। কিন্তু লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ্য আমাদের কাছে বড়। এই জন্য চরিত্রের চেয়ে বিদ্যা ও ধন অর্জ্জনের দিকে আমাদের ঝোঁক বেশী। পারিবারিক শৈথিল্যের দরুণ এ দুটোর প্রাথমিক ব্যবস্থাও ঘর থেকে হবার উপায় নেই—তারও শিক্ষার বরাত পড়েছে বাইরের উপর। এতে বিদ্যাও পাকা হচ্ছে না, অর্জ্জনের শক্তিও উদ্বুদ্ধ হচ্ছে না—মাঝে থেকে চরিত্রটুকু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই যেমন ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে ধরা যাক্। চরিত্র বলিতে আমরা ব্রহ্মচর্য্যই বুঝি। ব্রহ্মচর্য্যের দিকে দৃষ্টি আজকাল অনেক অভিভাবকেরই পড়েছে। ঘর থেকে তার সুবিধা হচ্ছে না দেখে তাঁরা বাইরে একটা প্রতিষ্ঠান খুঁজছেন। প্রথমতঃ এটাই তো একটা লজ্জার কথা। তারপর যদিও বা স্বীকার করলাম, সমাজের এখন উদ্বোধনের সময়; এখন ঘরে সব জিনিষ না-ও পাওয়া যেতে পারে। হয়ত ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষাদীক্ষায় গঠিত দম্পতীর ঘরে সন্তানের ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষার সুব্যবস্থা কালে হতে পারে। কিন্তু এখনও দেখ্‌ছি, ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা সফল করতে হলে কখন থেকে তার পত্তন করা প্রয়োজন, সে শিক্ষার স্বরূপই বা কি, এ সম্বন্ধে পিতামাতা খুব চিন্তাশীলতার পরিচয় দেন না। সাধারণতঃ তাঁরা সঙ্গদোষে ছেলে নষ্ট হয়ে যাবে, এই ভয়েই ছেলেকে দূরে পাঠাতে চান। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে যৌন অপচার নিবারণ করলেই যে ব্রহ্মচর্য্য সফল হবে, তা তো নয়। ছেলের মাঝে যৌনবৃত্তি উন্মেষিত হবার আগেই ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ে ছেলেকে চালান করতে পারলেই যে পিতামাতা দায়মুক্ত হলেন, এমন কথা মনে করা ভুল। ছোট

ছেলের মাঝে সাধারণতঃ যৌনপ্রবৃত্তির উন্মেষ দেখা যায় না; কিন্তু এতেই যে তারা খাঁটী রয়েছে, তা মনে করতে পারি না। পিতমাতার অবিবেচনায় কচি ছেলেমেয়েদের মাঝেও এমন কতকগুলি অভ্যাস ঢুকে যেতে পারে, যা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যের ভীষণ প্রতিকূল হয়ে দেখা দেবে। এ জায়গায় শুধু ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠানে ছেলে পাঠিয়েই কি পিতামাতা দায়মুক্ত হতে পারেন? ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠানের পবিত্র সংস্পর্শে ছেলেমেয়ের অশেষ কল্যাণ হতে পারে, স্বীকার করি; কিন্তু ছেলেমেয়েকে সংস্কারেই দূষিত করে তাদের সেখানে পাঠালে লাভ কতটুকু হবে?

এই সব কথা বিবেচনা করলে মনে হয়, শিক্ষার বনিয়াদ যদি ঘরেই পাকা হয়ে না ওঠে এবং সন্তানের জন্মকাল হতেই যদি শিক্ষার আদর্শ পিতামাতার মনশ্চক্ষে স্ফুরিত হয়ে সন্তানকে তদনুরূপ গঠন করতে প্রবৃত্ত না করে, তবে সময় বয়ে গেলে যত আড়ম্বর আয়োজন করা হোক না কেন, সমস্তই পণ্ডশ্রম হবে। শিক্ষার আদিক্ষেত্র—গৃহ; আদিশিক্ষক মাতা এবং পিতা; প্রারম্ভ কাল—জন্ম। ভিত পাকা না হলে ইমারত গড়া বৃথা।

আধ্যাত্মিক শিক্ষার পরখ

আমাদের দেশে শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র সবই নূতন করে গড়ে তুলবার জন্য খুব একটা উত্তেজনা এসেছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য কি, তারও পুরাদমে আলোচনা চলছে। তার ফলে আবিষ্কার হয়েছে, আমরা অত্যন্ত আধ্যাত্মিক—সমস্ত জগতের সঙ্গে এইখানেই আমাদের পার্থক্য। অতএব আমরা যাই কিছু করি না কেন, তারই বনিয়াদ আধ্যাত্মিক হওয়া চাই।

এ খুব ভাল কথা নিশ্চয়ই—কারু এতে আপত্তি হতে পারে না। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটা বাস্তবের বেলায় প্রয়োগ করতে গিয়েই আর কারু তাল ঠিক থাকে না। আধ্যাত্মিক শিক্ষা, আধ্যাত্মিক সভ্যতা, আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রনীতি—সব শুনতেই ভাল, কিন্তু কথাগুলো বুঝতে গেলেই দেখি একটু গোল ঠেকে। এ বিষয়ে যত আলোচনা হয়, তার মাঝে অধিকাংশই দেখি ভাবার ধোঁয়া। এ কি আমরা বুঝতে পারি না বলেই স্পষ্ট করে কিছু বলি না, না ভাবের ঘরে চুরী আছে বলেই কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে বেরোয় না? উদাহরণ স্বরূপ শিক্ষার কথায় বলতে পারি, শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করে আমাদের স্থির হয়েছে যে, আমাদের জাতীয় শিক্ষা চাই এবং জাতীয় হতে হলেই সেটা আধ্যাত্মিক হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক শিক্ষাটা যে কি হবে, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করে একটা কিছু বলবার সাহস আমাদের হচ্ছে না। এর কারণ কি?

পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে কিছুদিন ধরে আমাদের মাঝে একটা নূতন রকম পরিচ্ছেদবুদ্ধি দেখা দিয়েছে। আমরা ভাবুক জাতি বলে চিরদিনই একটা অপবাদ বহন করে আসছি বটে, কিন্তু

ভাবুকতায় বোধহয় পাশ্চাত্য জাতি আমাদের উপরেও এক কাঠি। বস্তুজগৎকে আমরা মায়া বলে সংসারযাত্রাকে অত্যন্ত অস্পষ্ট করে তুলেছি—এ অপবাদ না হয় মেনে নিলাম; কিন্তু ভাবজগৎকে ওঁরা যেমন বদ্ধপরিকর হয়ে মায়াময় করে তুলেছেন, তা বাস্তবিকই একটা আতঙ্কের জিনিষ। এঁদেরই উচ্ছিষ্ট মালমশলা নিয়ে তৈরী আধ্যাত্মিকতা, বিশ্বমানবতা ইত্যাকার ঝুড়ি ঝুড়ি শব্দ নির্ব্বিচারে সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হয়ে আমাদের ভাবরাজ্যে যে বিপ্লব ঘটাচ্ছে, তার পরিণাম ভেবে শঙ্কা হয় বই কি! স্পষ্ট কথা বলতে এবং স্পষ্ট কাজ করতে পূর্ব্বে এ দেশ কখনো কুণ্ঠাবোধ করেনি। ভাবে ও আচারে এই স্পষ্টবাদিতা ও স্পষ্টকারিতার দরুণ তাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে গালও খেতে হয়েছে কম নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমরাও আজ বড় বড় কথার মারপ্যাঁচে ভাবকে অস্পষ্ট করে তুলতে শিখেছি।

এই পাশ্চাত্য ভাবের কুহেলিকা আমাদের আধ্যাত্মিক জগৎকেও ছেয়ে ফেলেছে। জাতীয় ভাবটা কি, তা স্পষ্ট করে না বুঝলেও আধ্যাত্মিক ভাবটাকে স্পষ্ট করে ধরবার লোকের অভাব এখনো আমাদের মাঝে হয়নি—কেননা ওটার মূলে আছে সাধনলব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সাধনসম্পন্ন লোক এখনও মেলে, আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁরা অনুভব করেন। কিন্তু সাধন-রাজ্যের সুস্পষ্টতা থেকে আধ্যাত্মিকতা যখন আধুনিক সভ্যদের মস্তিষ্কোদ্ভূত ভাবরাজ্যে এসে ঢুকল, তখন থেকেই তার বহুরূপী খেলা সুরু হল। তাই আধ্যাত্মিক শিক্ষা, আধ্যাত্মিক সমাজ ইত্যাদি কথাগুলি আমরা শুনছি বটে, কিন্তু স্পষ্টতঃ তার মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারছি না।

শিক্ষার কথাই বলি। শিক্ষা যদি আধ্যাত্মিক হয়, তবে তার রূপটা কি দাঁড়াবে? আধ্যাত্মিক যা, তার সঙ্গে আত্মার যোগ আছে,

ভগবানের যোগ আছে—এ কথা খুবই স্পষ্ট। সুতরাং আধ্যাত্মিক শিক্ষায়ও ভগবানের সঙ্গে যোগ থাকবে নিশ্চয়ই। শিক্ষার আধ্যাত্মিকতা মানে ভগবানের সঙ্গে তার পূর্ণযোগ। এই পর্য্যন্ত মেনে নিয়ে তারপর যদি তাকে জাতীয় বলি, কিম্বা তার উপায়ের আলোচনা করি, তাতে গোল হবার কোনও কথাই নাই।

কিন্তু কথা হচ্ছে, ভগবানকে লাভ করবার জন্ম শিক্ষার পত্তন, এ কথাটাই যে আজকাল ভয়ানক। কেননা শিক্ষিতের মাঝে কোনও কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তি এমন অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, শুধু ভগবান্ ভগবান্ করা একটা বাতিক বিশেষ। এই করে করেই এ দেশটা অধঃপাতে গিয়েছে। সুতরাং ওসব চর্চ্চাকে অবান্তর করে জাতীয়তার পরিপোষক অন্যান্য বিষয়ে আমাদের মনোযোগী হতে হবে। শুধু ভগবান্ ভগবান্ করাটাই আধ্যাত্মিকতা নয়।

এমন কথা শুনলে বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকতে হয়। দেখছি, এঁদের মতে ভগবান নিয়ে মাতামাতিটা ভাল নয়, অথচ আধ্যাত্মিক নামটার মমতা ছাড়লেও চলবে না। এই মনোবৃত্তি থেকে যোগে ভোগে, সংসারে বৈরাগ্যে, বন্ধনে মুক্তিতে খিচুড়ী পাকিয়ে আমাদের দেশে সমন্বয়ের একটা ধুম পড়ে গিয়েছে। কিন্তু এর ফলে যে কি হবে, তা ভগবানই জানেন।

এই সমস্ত ভাবের ঘোর না কাটলে আমাদের কল্যাণ নাই। যা সাধনার বিষয়, তা নিয়ে শুধু "Comaprative study" করলে চলবে না —নিজের জীবনে পরখ করে তবে সত্য প্রচার করতে হবে। যোগে ভোগে সমন্বয়টা খুব ভাল আদর্শ, এ কথা বললেই হবে না, নিজের জীবনে ও দুটাকে একসাথে জুটিয়ে নিয়ে দেখতে হবে, কত ধানে কত চাল। সাধনায় যদি সিদ্ধি মিলে, তবেই সে সত্য অপরের জীবনে

সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে প্রয়োগ করবার অধিকার জন্মাবে—নৈলে শুধু বাগ্‌জালে অজ্ঞের বুদ্ধিভেদ জন্মানোটা কখনও উচিত হবে না।

যদি আধ্যাত্মিকতার অনুশীলনকে জীবনের সার্ব্বভৌম ভিত্তি করতে চাই, তবে সাধনার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটাতে হবে। আধ্যাত্মিকতা বলতে শুধু ভগবানকেই বুঝতে হবে, সেই বোঝার অনুকূলেই সাধনসম্পদ্ সঞ্চয় করতে হবে,—পাঁচমিশালী ভাব সেখানে চলবে না। জীবনের প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত ওই এক ভাবের পরখ করে দেখতে হবে—সাধনার স্বরূপটি কি, কালভেদে ও নিমিত্তভেদে তার কি কি ভেদ হয়। এমনি করে একটা সমগ্র জীবনের ভগবদনুশীলনের উপরেই শিক্ষার আধ্যাত্মিকতা নির্ভর করে। এ যদি করতে না পারি, তবে রুচি অনুযায়ী সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যরকম শিক্ষাপ্রণালীর পত্তন করতে পারি, আপত্তি নাই—কিন্তু তার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার বদনামটা জুড়ে দিলে চলবে না।

এমন শিক্ষার আদর্শের বিরুদ্ধে তর্ক আছে অনেক, কিন্তু একে অসম্ভব বলে জানি না। কিম্বা এই শিক্ষা-দীক্ষায় যে মানুষ হয়েছে, সে যে জগতের সকল কাজের বাইরে, এমন কথাও মানি না। বরং আমাদের দেশে এই আদর্শেরই বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি। শিক্ষার অভিমানে দু'চার জন আমরা যতই বিপথে দাঁড়িয়ে চীৎকার করি না কেন, সেদিকে সকলের কাণ দিলে চলবে না। আমাদের নিয়তি আর এক রকম।

যদি শিক্ষাকে বাস্তবিকই আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তবে তার উপায় কি ? উপায় খুব স্পষ্ট। যাঁরা অধ্যাত্ম রাজ্যের রাজা, সামাজিক শিক্ষার তরণীতে তাঁদের কর্ণধার করতে হবে। প্রাচীন যুগের স্মৃতি এখনো আমাদের লোপ পায়নি; প্রাচীন গুরুগৃহবাসের

পদ্ধতি এখনো আবার ফিরিয়ে আনা চলে। গুরু আমাদের ছেড়ে যাননি—আমরা তাঁকে চাইনি বলেই অভিমানে তিনি আড়াল হয়ে রয়েছেন। যদি নিজের কল্যাণ কিসে হবে তা বুঝতে পারি,সমাজকে যদি তুলতে চাই, সন্তানকে যদি মানুষ করতে চাই, তবে কায়মনোবাক্যে আবার সেই ব্রহ্মবিদ্ গুরুকে আবাহন করতে হবে। এ দেশের লোক চিরদিন তাঁকে ডেকে এসেছে—আবার ডাকলে তিনি আসবেন, ভুলে থাকবার অপরাধ গ্রহণ করবেন না। ব্রহ্মবিদ্ গুরু ভিন্ন শিক্ষার আধ্যাত্মিকতা বাজে কথা। ইহলোকের পরলোকের সকল শিক্ষাই তিনি নিয়ন্ত্রিত করতে জানেন, যদি তাঁকে আমরা আত্মসমর্পণ করতে পারি।

শিক্ষায় অন্তর্দৃষ্টি

ভালবাসাই হল শিক্ষার মূল মন্ত্র। কিন্তু ভালবাসা বল্‌তে কি বুঝব? সে কি কাউকে আগলে বসে থাকা? তা তো নয়। ভালবাসা তখনই জাগে, যখন কাউকে উপলক্ষ্য করে নিজকে দেহমনের গণ্ডীর চেয়ে বৃহৎ মনে করি। এই অর্থে ভালবাসার সঙ্গে কামনার প্রভেদ সুস্পষ্ট। কামনার সঙ্গে দেহ কিম্বা মনের কোন একটা বিকার জড়িত আছেই। কামনা সান্তের পেছনে অনন্তকে দেখতে পায় না—ব্যক্তিগত ইচ্ছার স্থানে ভগবদিচ্ছার প্রেরণাকে উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ ভালবাসার দোহাই দিয়ে কাউকে যখন আমরা কামনা করি, তখন তার যে ভাল

করতে চাই না, তা তো নয়। কিন্তু সে ভাল করায় অর্থ আমিই হয়ত কিছু বুঝি না—ঐশী ইচ্ছার জায়গায় নিজের সংস্কার আর খেয়ালকেই বড় করে দেখি। তাতে সত্যিকার ভাল কার হতে পারে না।

"ছেলে ভাল করব"—যদি এই কামনা মনে রেখে কাজ করি, তবে কিছুতেই শিক্ষার সত্য ফল ফলবে না। কেননা ভাল করব—এটা হচ্ছে সংস্কারের কথা। কার পক্ষে কতটুকু ভাল, তা আমরা ঠিক ঠিক জানি না—তাই ভালর আদর্শটা আমাদের সংস্কার অনুযায়ী গড়ে ওঠে। আমার সংস্কার আমার কাছেই ভাল হতে পারে, অপরের পক্ষেও যে তা ভাল হবে—এ কথা কি করে বলি? তাই কাউকে ভাল করবার চেষ্টা করতে গেলে একটু বিপদ আছে। হয়ত আত্মাভিমান নিয়ে ভাল করতে গিয়ে মন্দও করে ফেলতে পারি।

তা ছাড়া, ভাল করব, এই সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করতে গেলেই বিফলতার দুঃখ কিছু না কিছু পেতেই হবে। যে কোনও সংকল্প নিয়ে কাজ করতে গেলেই এই বিপদ। শিক্ষাকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনের সংকল্প-বিকল্পের অতীত ভূমি হতে দেখতে না শিখব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যথার্থ শিক্ষা—যে শিক্ষাতে আত্মার প্রকাশ, তা কখনও সিদ্ধ হবে না। তুমি শিক্ষক সেজে যতটুকু শিক্ষা দেবে বলে অভিমান করছ, সেটাও শিক্ষার বহিরঙ্গ মাত্র। তোমার অভিমানকে উপলক্ষ্য করেই তার সৃষ্টি। তোমার চেষ্টা ছাড়া প্রকৃতির আরও একটা নিগূঢ় শক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করছে—সেই হচ্ছে ঐশী প্রেরণা। তাকে ভুললে চলবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে এবং যেটা হবে, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাকে হৃদয়ঙ্গম করে তারই অনুকূলে নিজের জীবন ঢেলে দিতে পারলে তবে শিক্ষা সার্থক হবে।

এমনি করে প্রকৃতির উপর যদি বেশী পরিমাণে নির্ভর করতে যাই, তবে হয়ত কথা উঠবে যে, এতে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে একটা নিশ্চেষ্টতা আসতে পারে, এবং তার ফলে খুব ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও সফলতার চেয়ে বিফলতার মাত্রা হয়ত বেশী হবে। কিন্তু আমাদের মনে হয় ঠিক তার উল্‌টো। আমরা ক্ষুদ্র মানুষ, ক্ষুদ্র চেষ্টার ক্ষুদ্র সফলতা দেখলেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই, এবং যেখানে চেষ্টার একটা সোরগোল না দেখতে পাই, সেখানেই ফল সম্বন্ধে হতাশা এবং অবিশ্বাস এসে পড়ে। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টাকে পুরুষকার বলে আস্ফালন করা, আর ভগবানের নীরব প্রেরণাকে দৈব ভেবে তার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে থাকা—কোনটাই সমীচীন নয়। আমিত্বের নিরসন না হলে ঠিক ঠিক দৈবের উপর নির্ভরতা কারু আসতে পারে না ও যথার্থ পুরুষকারও কারু মাঝে জাগতে পারে না। আমিত্ব দূর করতে পারলেই দৈব আর পুরুষকারের মিলন ঘটবে —তাই হল ভগবদিচ্ছার স্বরূপ।

এই ইচ্ছার স্বরূপ যে বুঝতে পেরেছে, সে যেমন নিজের ক্ষুদ্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে কাজ করতে পারে না, তেমনি তার মাঝে নিশ্চেষ্টতা বা জড়ত্বও আসতে পারে না। ভগবদিচ্ছায় যদি বিশ্বাস থাকে, তবে সে ইচ্ছাকে আধা আধি ভাগ করে দেখলে তো চলবে না—সর্ব্বত্রই সে ইচ্ছার লীলা দেখতে হবে। কোন ঘটনাকেই তখন আকস্মিক বলা চলে না, সকলই তখন অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে। তোমার মাঝে যদি ভগবদিচ্ছার শুভ প্রেরণা জেগে থাকে, তবে সেই শুভেচ্ছার পাত্র করে ভগবান যাদের তোমার সঙ্গে জুটিয়ে দিয়েছেন, তাদের আর তোমার মিলনকে কখনও আকস্মিক বলা চলে না। তোমাকে উপলক্ষ্য করে ভগবদিচ্ছা যাদের উপর ক্রিয়া

করবে, জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধের টানে তারাই আজ তোমার সঙ্গে মিলেছে—এই বিশ্বাস যদি অন্তরে জাগে, তবে আর নিজের চেষ্টার কোনও বালাই থাকে না। কল্যাণ যেখানে, সেখানকার যোগাযোগ ভগবানেরই প্রেরণায়—এই কথাটী বিশ্বাস করে তাঁরই অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে, অহমিকা ছেড়ে দিয়ে যথাযথভাবে কর্ত্তব্য পালন করে যেতে হয়। সে কর্ত্তব্যও নিরূপিত হয়—কোনও সঙ্কল্প দ্বারা নয়। যাঁর কাজ তিনিই করিয়ে নেন, আত্মহারা মানুষ বুঝতেও পারে না, কি দিয়ে কি হল—সে কেবল আপনাকে তাঁর যন্ত্র করে দিয়েই আনন্দ পায়।

এমনি করে মন হতে অহং মুছে গিয়ে ভগবানের ইচ্ছা যার মাঝে সুস্পষ্ট হয়ে জেগেছে, সে-ই যথার্থ ভালবাসতে পারে। তার বন্ধনের চিহ্ন বাইরে থাকে না—কিন্তু অন্তরকে সে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে। এই ভালবাসায় স্নিগ্ধতা আছে, শান্তি আছে, বীর্য্য আছে—কিন্তু ফেনিল উচ্ছ্বাস নাই। তার বিক্ষোভহীন প্রচণ্ড শক্তির কাছে প্রতিকূল চিত্তও পরাভূত হয়ে যায়। মানুষ তখন বাস্তবিকই দৈববলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। সে দৈব কোন ফাঁকতালে পাওয়া কিছু নয়—সে তার আত্মারই শক্তি।

সম্পূর্ণ সংস্কারবর্জ্জিত না হলে যথার্থরূপে যেমন ভালবাসা যায় না, তেমনি যথার্থ শিক্ষাও দেওয়া যায় না। সাধারণতঃ শিক্ষাতে আমরা অর্জ্জন করবার পালাটাই বড় করে দেখি। আসলে বর্জ্জন করবার শিক্ষাই হল বড়। সংস্কার বর্জ্জন করতে না পারলে মনুষ্যত্ব জাগবে না—আত্মশক্তির স্ফুরণ হবে না। সংস্কারবর্জ্জিত মনুষ্যত্বের শিক্ষাই হল প্রধান কথা। জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্ম, এর কোনটাই সংস্কারের চাপে থেকে যথার্থরূপে বিকশিত হতে পারে না। যদি আত্মার সম্পদই না বিকশিত হয়, তবে তো জীবনই ব্যর্থ হল।

আমরা যেমন ভাবি, তেমন জগতই সৃষ্টি করি। শিক্ষার জগতও এমনিতর আমাদের মনঃকল্পিত একটা খণ্ড সৃষ্টি—তা আংশিকরূপে সত্য। জীবন যদি কল্যাণময় করতে হয়, তবে সত্যকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে। বাইরের রূপ যাই হোক্ না কেন, পূর্ণতাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রাখতেই হবে। যে শিক্ষা এই অন্তরের পূর্ণতা প্রতিষ্ঠার অনুকূল হবে, তাকেই বলব আদর্শ শিক্ষা। শিক্ষায় এই অন্তর্দৃষ্টি থাকা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন—এই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বাইরে যত ইচ্ছা কারিগিরি কর, তাতে কোনও গোল হবে না। পূর্ণের মাঝে অংশের স্থান সম্ভব, কিন্তু অংশের মাঝে পূর্ণকে পোরা যায় না। তেমনি আত্মার সম্পদ অর্জ্জন করে বহিরঙ্গ সম্পদ অর্জ্জন করা চলে, কিন্তু বহিরঙ্গ সম্পদ অর্জ্জনে মন থাকলে আত্মা সঙ্কুচিত হন। শিক্ষাকে যদি অর্জনের দিক দিয়েও দেখি, তবুও এ কথাটা ভুলে থাকা চলে না।

শিক্ষক নিজে যেমন ব্রহ্মসদ্ভাবের অনুশীলন করবেন, ছাত্রকেও তেমনি ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখবেন। দুটা বস্তুর মাঝে সাম্য থাকলে, তবে ভালবাসা হয়। আবার এই সাম্য যত নিবিড় হবে, ভালবাসাও তত গভীর হবে। জলের সঙ্গে জল মিশে গেলে, কিম্বা আলোর সঙ্গে আলো মিশে গেলে দ্বৈতের ভেদ কোথাও ধরা যায় না। কিন্তু দুটা কঠিন বস্তু মিলবার জন্য পরস্পরের সম্মুখীন হলেও ঠোকাঠুকি করে দুটা পরস্পরের বাইরে পড়ে থাকে, একান্ত ভাবে কিছুতেই মিলতে পারে না। শিক্ষাক্ষেত্রেও যদি ভালবাসাকে মূল বলে গ্রহণ করতে হয়, তবে সেখানেও শিক্ষক ও ছাত্রে যাতে আত্যন্তিক মিলন সম্ভব হতে পারে, তারই সাধনা করতে হবে। ব্রহ্মসদ্ভাবে দুটী সত্তা একাকার না হলে, আত্যন্তিক মিলন কখনও হতেই

পারে না। এর মাঝে যদি শুধু দেহ, মন, সংস্কারের কথা ওঠে, তা হলে মিলন কখনও একান্ত হবে না এবং যেখানে ভেদ থাকবে, সেখানে দুঃখ ও অকল্যাণও থাকবে।

শিক্ষার ক্ষেত্র এবং পাত্রকে এমনি সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুবিদ্ধ করে রাখতে হবে। এখানে শুধু মানুষের রক্তমাংসের পিণ্ডটাই দেখছি না—এখানে দেখছি ব্রহ্মকে। এই দৃষ্টি সত্য এবং ব্যাপক—এর কাছে আর সকলই খর্ব্ব হয়ে রয়েছে অথচ কারু সঙ্গে বিরোধ হচ্ছে না। এ দৃষ্টি পেলে আর কৃত্রিম চেষ্টা দিয়ে কোনও কিছু গড়ে তুলবার প্রাণান্তকর প্রয়াস করতে হয় না—সমস্ত সমস্যারই সহজ সমাধান হয়ে যায়।

যদি সিদ্ধদৃষ্টি মিলে, তবে যাকে যা ভাবা যায়, সে তাই হয়ে যায়। আর সে দৃষ্টির অর্থই হচ্ছে—যা সিদ্ধ বা সম্পাদিত, তারই দৃষ্টি অর্থাৎ ব্যক্তিগত ইচ্ছার বালাই সেখানে নাই, কাজেই কোনও সফলতা-বিফলতার কথাও নাই। এই দৃষ্টিতেই মায়ার আবরণ খসে যাবে, সত্য স্বমহিমার প্রকাশ হবে। শিক্ষক নিজকে এবং শিক্ষার্থীকে এই দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যাস করবেন—তবেই শিক্ষা অনাড়ম্বর হয়েও যথার্থ হবে।

শিক্ষায় নবচেতনা

মানুষের প্রতিভা এক একটা কাজ সহজ করবার যে সমস্ত সঙ্কেত আবিষ্কার করছে, তাতে সমাজের উপকার ও উন্নতি হচ্ছে যথেষ্ট। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিভার কারসাজি যখন অন্ধ আচারের বন্ধনে মানুষের প্রাণকে আড়ষ্ট করে তুলেছে দেখতে পাই, তখনি আমাদের মাঝে কলকৌশলের বিরুদ্ধে সহজ বুদ্ধির একটা সুস্পষ্ট বিদ্রোহ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহ আজ জগতের নানা জায়গায় নানা দিক দিয়ে ফুটে উঠেছে। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই বিদ্রোহের আভাস আমরা পাচ্ছি—কিন্তু এখানে এখন পর্য্যন্ত চরম তত্ত্বটা যে কি, তা তলিয়ে দেখবার জন্য কোনও ব্যাপক ও আন্তরিক চেষ্টা হয়েছে বলে মনে হয় না।

শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার আশ্চর্য্য। আমাদের গবর্ণমেণ্ট দেশের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একটী সচিব পোষণ করছেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর শিক্ষাবাহিনীর "অগ্রগমনের" জন্য দেশের টাকা দিয়ে তার রাস্তা মুড়ে দিচ্ছেন, ঘরে ঘরে আমাদের ছেলেদের অভিভাবকের মুখে শিক্ষার রকমারি বুলি—কিন্তু এ সত্ত্বেও শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য যে কি, সে সম্বন্ধে আমাদের সমাজ বা রাষ্ট্র কি সচেতন? যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, শিক্ষার গোড়ায় কি?—তবে শতকরা নিরানব্বই জনের উত্তর হবে—লিখন, পঠন আর গণন। লিখতে শিখা, পড়তে শিখা, আর আঁক কষতে শিখা—এ সবই খুব উঁচু দরের শিল্প, তাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এর মাঝেই যে সমস্ত শিক্ষাতত্ত্বের পর্য্যাবসান, এ ধারণা আমাদের কি করে মজ্জাগত হল, তাই

আশ্চর্য্য। এই জায়গাতেই আমরা দেখি মানুষের আদিম প্রতিভার দৌরাত্ম্য।

মানুষের ভাবাকে যিনি অক্ষরের রেখায় বেঁধেছিলেন, তাঁর মত বড় ওস্তাদ কেউ নাই, তা লক্ষবার স্বীকার করব। কিন্তু এই রেখাপাতের মোহই যে একদিন মানুষকে এমন আবিষ্ট করে ধরবে যে তার পায়ে মানুষ জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশটুকু বিসর্জ্জন দেবে, লক্ষ্যের চেয়ে উপায়টাই তার কাছে বড় হবে,—এ কথা কে মনে করেছিল? অবশ্য রেখাপরিচয়েই যে শিক্ষার সমস্তটা সময় ব্যয়িত হচ্ছে, তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু ওই পরিচয়ের সূত্রপাতেই শিক্ষার তাৎপর্য্য হতে আমাদের দৃষ্টি যে মোচড় খেয়ে বেঁকে যায়, সারাটা জীবন ধরে আর সে ভুলটা শোধরাবার আমাদের সময় হয় না। শব্দকে যেমন আমরা রেখায় বন্দী করেছি, তেমনি ভাবকে বেঁধেছি ভাষায়। ভাব হতে ভাষা—ভাষা হতে রেখা—এই হল আমাদের শিক্ষাশিল্পের বিবর্ত্তন। কিন্তু এমনি করে যে আমরা ক্রমে বাইরে ছুটে আসি, আর আমাদের ভিতরে ঢুকবার ফুরসৎ হয় কই? ভাবের সঙ্গে যোগ না ঘটিয়ে ভাষাকে যে বড় আসন দিল, সে-ও দিল শুধু খোলসটা; আবার এই ভাষার সঙ্গে পরিচয় না ঘটিয়ে যে চোখের সামনে রেখার মায়া মেলে ধরল, সে তো আমাদের আরও বাইরে টেনে আনল। বলতে গেলে এই বহির্মুখীনতা আমাদের শিক্ষার একেবারে হাড়ে হাড়ে ঢুকে গিয়েছে।

স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই শিক্ষার অধিকার আছে—কিন্তু সে শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের সমাজে নাই। অসামাজিক মানুষ শিক্ষাদীক্ষায় হীন হবে, এ কথা স্বীকার করতে পারি—কিন্তু সামাজিক মানুষের চেয়ে সে যে সব দিকেই হীন হবে, এ কথা তো তাল ঠুকে বলতে

পারি না। এতে মনে হয়, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাটাই পূর্ণাঙ্গ নয়—এখনও এখানে পরীক্ষাই চলছে, সত্যের আবিষ্কার এখনও শেষ হয়নি। সমাজ গড়ে যেমন আমরা শিক্ষার সুব্যবস্থা করেছি, তেমনি এই নিজে-হাতে-গড়া সমাজও অনেক সময়ে আমাদের সহজ শিক্ষার প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনুষ্য-সমাজের এই প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েও মানুষকে নিরর্থক শক্তির অপব্যয় করতে হয়। এইখানে আবার দেখি আদিম প্রতিভার দৌরাত্ম্য।

জীবনযাত্রা সহজ করতে মানুষ যে নিয়ম গড়ে, সেই নিয়মে আবার সে নিজেই বাঁধা পড়ে। কিন্তু মানুষের নিয়ম তো জড়ের নিয়ম নয় যে তার আর কোনও দিন নড়চড় হবে না। মানুষ যে প্রাণবন্ত, তাই তার নিয়মের বন্ধন হতে মুক্তি পাবার সঙ্কেত তার মাঝেই আছে। এই জন্য নিয়মের চাপে মানুষ কখনো মরে না। সমাজের নিয়ম সুবিধার দোহাই দিয়ে মানুষকে বাঁধে, কতকটা তার ভালর জন্য, কতকটা মন্দের জন্যও। কিন্তু এই ভালমন্দের দ্বন্দ্ব হতে বাঁচবার পথও মানুষের আয়ত্ত। যদি এ কথাটা অবস্থার বিপাকে সে ভুলে গিয়ে থাকে, তবে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে—নইলে সমাজপতির কর্ত্তব্যে ত্রুটী হবে।

এই দ্বন্দ্ব হতে বাঁচবার পথ হল অন্তরে। শিক্ষাকে সেই পথের পথিক করতে হবে। ভিতরের দিকে না তাকিয়ে যদি কেবল বাইরের হিসাবমতই একটা কিছু করতে যাই, তবে সে হিসাব কোনও দিনই মিলাতে পারব না—ঠিক যে জিনিষটা চাই, সে জিনিষটা আমরা পাব না। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির এই একটা বিশেষত্ব আছে যে কোনও অবস্থাতেই তার হিসাবের কোন গরমিল হয় না। বাইরে যেখানে বিরোধ, অন্তরে সেখানে সামঞ্জস্য। এই না হলে সংসারের

এত হট্টগোলে কি মানুষ বাঁচত? এই সূত্রটী যদি শিক্ষাব্যাপারেও প্রয়োগ করি, তবেই শিক্ষাসমস্যার মীমাংসা সম্ভব। দেশভেদে আচার ভিন্ন, সমাজ ভিন্ন, আদর্শ ভিন্ন—সঙ্গতিও ভিন্ন। এ জায়গায় পরের জিনিষের দিকে নজর দিলেই কি নিজের পেট ভরবে, না সবখানেই পরস্বটা আমরা আত্মসাৎ করতে পারব? অথচ জীবনের মাঝে কোন খুঁত রাখলে আমাদের চলবে না—পরের সঙ্গে অ-বনিবনাও হলেও চলবে না। এ জায়গায় আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে, অন্তরের মাঝে প্রশান্তি অর্জ্জন করা, বাইরের স্বাতন্ত্র্যকে প্রয়োজন মত অব্যাহত রেখে অন্তরে অন্তরেই সামঞ্জস্য ঘটানো।

এই দিক দিয়ে যদি আমরা শিক্ষাকে দেখি, তাহলে আমাদের এমন তর্কই আস্‌বে না যে, আমরা যে পদ্ধতিকে অনুসরণ করছি, সেটা গ্রীসের, না জাপানের, না হনলুলুর। শিক্ষা বলতে যে একটা মামুলী গৎ আমরা কোন মান্ধাতার আমলে শিখেছিলাম, আজ পর্য্যন্ত তারস্বরে তারই ঐক্যতানবাদন আমাদের আসরে চলছে। তার ফল যে কি হচ্ছে, তা দেখ্‌বার অবসর এখন পর্য্যন্তও আমাদের হয়নি। আমরা নিজেদের কসরতেই নিজেরা খুসী। আমরা ভাবি আমাদের সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র সবই তো পাকা বনিয়াদের উপর—তার মাঝে আর খুঁত কোথায়?

শিক্ষার সুরু করেছি বহির্ম্মুখীনতায়। প্রথম হতেই ব্যাপারটা কি তা তলিয়ে দেখিনি, কোথায় তার প্রাণ, খোঁজ করিনি—চোখ বুজে যুগ-যুগান্তরের বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছি। এই অন্ধতার একটা সাজা আছেই। শিক্ষার অভিনয়ে আমাদের অভিমানের তৃপ্তি হচ্ছে বটে, কিন্তু সত্যকে প্রত্যক্ষ না করার ফলে যে কৃত্রিমতায় আমাদের সমাজ ছেয়ে গিয়েছে, তার দুর্ব্বিপাক হতে পরিত্রাণ

কোথায়? যে শিক্ষা দেয়, সে জানে না, সে কি দিল; আবার যে শিক্ষা নেয়, সে-ও জানে না, সে কি পেল। অথচ শিক্ষার নামে এই মূঢ়তাকে সমাজ নির্ব্বিবাদে মঞ্জুর করছে; যথাসাধ্য একে দিয়েই তার বড় বড় কাজগুলো হাঁসিল করবার প্রত্যাশা করছে। কিন্তু সব জায়গায় কি তার আশা সফল হচ্ছে? আর তা যদি না-ই হয়ে থাকে, তবে সে দোষ কার?—ব্যবস্থার না ব্যবস্থাপকের?

এতখানি পুঞ্জীকৃত মিথ্যার চেয়ে এতটুকু সত্যও শ্রেয়ঃ। অন্ততঃ একটা জায়গাতেও যদি আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাই, তবে সেই তীর্থের পুণ্যে সমস্তটা দেশই একদিন পুণ্যময় হবে। দেশজোড়া ভুলকে আঘাত করতে পারে, এমন একটী সত্যনিষ্ঠ প্রাণেরও মূল্য অসীম। আমরা সংখ্যাবাহুল্য চাই না—আমরা চাই সত্য। সে সত্য পাবার অধিকার সকলের হয় না। কিন্তু যার মাঝে পাবার যোগ্যতা আছে, আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টাতে তার মাঝেই সত্য মুকুলিত হয়ে উঠ্‌বে। আমাদের মাঝে কণা কণা তপস্যার সঞ্চয় তারই শুদ্ধ আধারে মূর্ত্তি ধরে উঠ্‌বে। যে তপস্বী আমাদের মোহ ভাঙবে, আমাদের দুর্দ্দৈব দূর করবে—তাকে আমরাই আমাদের মাঝ থেকে জন্ম দেব—এই আকুলতাটুকু আমাদের থাকা চাই।

কি যে দুর্গতি আমাদের, তা যদি বুঝে থাকি, তবে এমনি করে আকুল হয়ে চাওয়ার আমাদের বিরাম হবে না কোনও দিন। দেহের জন্য যেমন অন্ন চাই, হৃদয়ের জন্য তেমনি চাই শিক্ষা। অন্নচিন্তা আমাদের চমৎকারা হয়ে দেখা দেয়, কিন্তু শিক্ষা-চিন্তা তো কোনও দিন চমৎকারা হয় না।—এ কি এতই তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করবার জিনিষ? ফোটাতে হবে প্রাণটি; কিন্তু তার উপর সংস্কারাক্রান্ততার পাথর চাপা

দিলে সে ফুটবে কি করে? আর যত দিন বাইরের দিকেই থাকব, পরের মুখের পানেই হাঁ করে রইব, তত দিন পর্য্যন্ত তো সংস্কার ছুটবে না। এমনি করে পুরুষানুক্রমে কেবল ভুলের বোঝা, সংস্কারের বোঝাই বয়ে মরব, আর জীবনে যদি বিপ্লব এসে দেখা দেয়, তবে তার জন্য দায়ী করব পরকে! পিতা হতে পুত্রে এই অভিনয়েরই তো পুনরাবৃত্তি চলছে—এর কি প্রতিকার হয় না? আগে গোড়া পাকা না হলে ইমারত দাঁড়াবে কিসের উপর?

এই জন্যই বলি, আজ নূতন করে এই সব কথা ভেবে দেখবার দিন এসেছে। সংস্কারের পথে শিক্ষাকে চালানো আর চলবে না—জীবনের মূল সুরটীর সঙ্গে তার যোগ রাখ্‌তে হবে। সংস্কারের মোহ যে টুটবে, তার প্রমাণ দেখছি—চারদিককার অস্পষ্ট বিদ্রোহের ভাবে। একটা নূতন ভাবের চমক এসে লেগেছে। সবার কাছে তা সুস্পষ্ট না হলেও যারা সংস্কারমুক্ত চিত্তে নূতনকে বরণ করতে পেরেছে, তারা জানে এই নবীনেরই জয় হবে একদিন—কেননা এ যে সেই চিরপুরাতন চিরন্তন আনন্দনিকেতনই আজ আবার নূতন বেশে আমাদের মাঝে দেখা দিতে এসেছে।

অভিনবকে গ্রহণ করবার জন্য আমাদের চাই সার্ব্বজনীন তপস্যা। তপস্বীর মত অন্তর্মুখী হতে না পারলে তো আদর্শকে চিনতে পারব না। জীবনের গোড়ার কথাই হচ্ছে শিক্ষা। আমাদের আচার আর সংস্কার গতানুগতিকের দাস হলেও রসিক শিল্পীর যে রসসাধনা আমাদের জীবনে চলছে, তা প্রত্যেক ব্যক্তিতেই অভিনব। শিক্ষাতেও এই ব্যক্তিগত অভিনবত্ব অব্যাহত রেখে জীবনের আদিম রসের উৎসটী অভিব্যক্ত করতে হবে। শিল্পী না হলে কেউ তা পারবে না। আবার সেই শিল্পী জন্মাবে সঙ্ঘবদ্ধ সমাজজীবনের মধ্য থেকেই। তার জন্যই

সমাজকে তপস্যা করতে হবে। কৃচ্ছ্রসাধনের তপস্যা তাকেই করতে হবে। কেননা ভাবের সঙ্গে যোগ না রেখে সে যেমন অভ্যস্ত সংস্কারে জীবনকে পঙ্গু করেছে, শিক্ষাকেও যেমন মানুষের আত্মার সম্পদ না করে তার বহির্ব্যসনে পরিণত করেছে, তেমনি প্রমাদ দূর করবার জন্য যে তীব্র প্রচেষ্টা, তার দায়িত্বও সমবেতভাবে সমাজকেই গ্রহণ করতে হবে। সমাজের মাঝে চেতনা না জাগলে অভিনবের স্ফুরণ সার্থক হবে না।

বিপ্লব ঘটাবেন যিনি, তিনি শক্তিধর পুরুষ। তাঁর আবির্ভাবে যুগযুগান্তরের আঁধারঘোর এক নিমিষে কেটে যাবে। কিন্তু আমরা তাঁকে চাইতে জানলে তবে না তাঁকে পাব? শক্তি যেমন একটা বিশিষ্ট আধারে বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হয়, তেমনি তার তরঙ্গ চারিদিকের ব্যষ্টি আধারে একটু না একটু ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ নবশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হবার দায়িত্ব সকলেরই। যারা শক্তিধর নয়, তাদেরও শক্তির আবাহন তো বৃথা যাবে না। সঙ্ঘেই শক্তির আবির্ভাব হবে।

সঙ্ঘের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সচেতন হবার সুযোগ প্রকৃতি দিয়েছেন। প্রকৃতির কাছে প্রত্যেকটী মানব-জীবনের স্বতন্ত্র একটা মর্য্যাদা আছে —সেইটী বুঝাবার জন্য প্রত্যেক সন্তানের জন্ম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রকৃতি অতি সহজভাবে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন। কিন্তু সমাজ সে শৃঙ্খলাকে লঙ্ঘন করেছে—পিতার দায়িত্ব মাতার দায়িত্বকে তার অবান্তর প্রয়োজনে সে খর্ব্ব করেছে। তার ফলে গোড়া হতেই মানবসন্তানের জীবন সহজ আনন্দে বিকশিত হতে পারেনি। এই শিশুই আবার কৃত্রিম শিক্ষায় পরিপুষ্ট হয়ে যখন পিতৃত্বের, মাতৃত্বের, আচার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তখন গতানুগতিক সংস্কারের অনুবর্ত্তন ছাড়া নূতন কোনও সম্পদ সে দান করতে পারেনি। এমনি করে সমাজ কৃত্রিম

হয়েছে। তার সংস্কার করতে হলে বাইরের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করলে তো হবে না—তার একেবারে আমূল সংস্কার করা চাই। সমাজ পরিশুদ্ধ না হলে শিক্ষাও কখনো সার্থক হবে না—কেননা যে দায়িত্ব প্রকৃতি সমানভাবে সকলকে বেঁটে দিয়েছেন, দুচার জন ব্যক্তির ঘাড়ে সে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা করলে প্রকৃতি তাতে ঠকবে না।

শিক্ষা, জীবন আর সমাজ—তিনটীর এমনি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক যে তাদের একটাতে ত্রুটী থাকলে আর একটা কিছুতেই ফুটবে না। এই জন্যই শিক্ষা ও জীবনের অভিব্যক্তিকে সমান্তরালভাবে দেখা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই; এবং তাদের আশ্রয়রূপী সমাজের দিকে না তাকিয়েও উপায় নাই। আধার বিশুদ্ধ হলে সত্য আপনি তাতে ফুটে ওঠে। শিক্ষার আধার সমাজ; এই সমাজে চেতনা জাগলে তবে শিক্ষার ধারা বদলাবে। অন্তর্মুখী দৃষ্টি না পেলে সমাজে চেতনা আসবে কোথা থেকে? শক্তিধর পুরুষ ছাড়া সমাজের দৃষ্টি অন্তরের দিকে ফিরাবে কে? অথচ শুধু একজনের শক্তিপ্রয়োগেই কার্য্যসিদ্ধি হবে না—শক্তির মূলে সঙ্ঘের ভিত্তি থাকা চাই। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে আকুল প্রাণে সঙ্ঘাধিষ্ঠাতা সেই শক্তিধর পুরুষেরই প্রতীক্ষা করব, যিনি নূতন ভাবের অঞ্জন চোখে মাখিয়ে অভিনবের দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করে দেবেন।

এই প্রতীক্ষা সকলকেই করতে হবে। শিক্ষায়, সমাজে, জীবনে নূতন চেতনা আনতে হবে। সংস্কারের পথে আর কল্যাণ নাই—নূতন ভাবে আবার সকলকে ভাবিত করে নিতে হবে। দেশের তরুণ তপস্বীরা এই ব্রত বরণ করে নিক্—আপন আপন জীবনকে মহিমময় করে সত্যের পথ, শক্তির পথ, আনন্দের পথ তারা উদার করে দিক। সিদ্ধি একদিন আসবেই।

শিক্ষায় ব্যক্তিত্ব

মানুষের প্রতিভা শিক্ষার আদর্শকে নানা দিক থেকে উঁচু করে ধরতে পারে, কিন্তু কি করে যে শিক্ষাকে জীবন্ত ভাবে শিক্ষার্থীর মাঝে সঞ্চার করে দেওয়া যেতে পারে, সেইটাই হল সব চেয়ে কঠিন সমস্যা। আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান খুব পাকা হলেই যে শিক্ষা সম্বন্ধে সব দায়িত্ব মিটে যায় না, তা আজ দেশের নানা ক্ষেত্রেই আমরা প্রত্যক্ষ করছি। যখন শুধু বুদ্ধির সংস্কার দিয়ে বা পরের মুখে ঝাল খেয়ে আমরা আদর্শ আবিষ্কার করি অর্থাৎ আদর্শের সঙ্গে যখন আমাদের সাধনার যোগ থাকে না, তখন তা অপরের মাঝে সঞ্চার করতে গিয়ে আমরা জীবনের পক্ষে তাকে ভার স্বরূপই করে তুলি। যেমন জীবজগতে, তেমতি অধ্যাত্ম-জগতে—প্রাণ থেকেই প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভবপর। শিক্ষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এই মন্ত্রটী ভুললে চলবে না। অর্থাৎ শিক্ষার দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে জীবন্ত মানুষের কাছ থেকে—কোনও বহুযুগপ্রতিষ্ঠিত কলের কাছ থেকে নয়।

কিন্তু এই কলিযুগে আমাদের কলের উপর ভক্তিটা বড় বেশী। সব বিষয়েই আগে আমরা চাই চাঁছাছোলা প্ল্যান—এখন সে প্ল্যানকে গতিসম্পন্ন করবার উপযুক্ত মানুষ থাকুক, আর নাই থাকুক; যে প্রতিষ্ঠানের গোড়ায় দেখবো, হাজার গণ্ডা রুল আর রেগুলেশন, আমরা ধরে নেব, তারই কাজটা খাটী হচ্ছে। অবশ্য আইন কানুনের যে কোনও দরকার নাই, এ কথা কেউ বলবে না, কিন্তু জ্যান্ত মানুষের চেয়ে মরা আইনের বাহুল্যই যদি কোথাও বেশী হয়ে ওঠে, তাহলে সেখানকার পরিণাম সম্বন্ধে মনে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হয় বই কি!

যখন দেখি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হতে ছোটখাট বিদ্যালয়গুলিতে পর্য্যন্ত ইট, চুণ, সুরকি, টুল, টেবিল, চেয়ার আর যন্ত্রপাতির সমারোহ, আর তার সঙ্গে দেখি অজস্র রুল, রেগুলেশন, স্কীম, সার্কুলার আর রুটীনের কাঁটা বেড়া—তখন মনে মনে মানুষের অতি সতর্ক কুশাগ্রসূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রশংসা না করে থাকৃতে পারি না। কিন্তু এতদিন ধরে এত ঘনঘোর গর্জ্জনের পরে আমাদের এই বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থার পর্ব্বত যে মূষিক প্রসব করেছেন, তাও তো আমাদের অজানা নাই। আবার আজ যদি আমরা এই প্রতিষ্ঠানকে ভেঙ্গে এরই উচ্ছিষ্ট মাল মসলা দিয়ে নূতন চটকে আর একটা নূতন বনিয়াদ গড়্‌তে যাই, তাহলে নূতন হাতে পড়েছে বলেই যে সেটাও একটা বিশেষ কিছু হয়ে দাঁড়াবে, তাও বিশ্বাস করা দায়। কেননা উপস্থিত এত বড় অনুষ্ঠান আর আয়োজনটা পণ্ড হল কিসে, তা না ধরতে পারলে শুধু নূতনত্বের জোরে পুরাণো গলদ কিছুতেই ঘুচবে না।

মানুষের জীবনকে আমরা যেমন গুটীকতক প্রয়োজনের মাঝে সঙ্কীর্ণ করে দেখি, শিক্ষাকেও ঠিক সেই চোখে দেখি বলেই তা হতে আমাদের সত্যকার কোন লাভই এতদিন হল না। উভয় ক্ষেত্রেই আগে আমাদের চাই ভাবের ব্যাপকতা। জীবনের লক্ষ্য যেমন কোনও মতে টিকে থাকার মাঝেই শেষ হয়ে যায়নি, শিক্ষাও তেমনি শুধু পরের ভাবের উপর দাগা বুলানোতেই শেষ হয় না। আগে জীবনকে বিস্তৃত বলে অনুভব কর্‌তে হবে, তারপর সেই অনুভূতির উপর দাঁড়িয়ে শিক্ষার আদর্শ গড়ে তুল্‌তে হবে এবং নিজের জীবনকে দান করে সে আদর্শকে শিক্ষার্থীর মাঝে জীবন্ত করে তুলতে হবে—তবেই শিক্ষাযজ্ঞের উদ্‌যাপন হবে।

কিন্তু জীবনের বিস্তৃতির অনুভূতি কি?—সে হচ্ছে প্রত্যেকের অন্তরের অন্তস্তলে যে গভীরতর আনন্দময় সত্তা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, নিত্য

কর্ম্মে জ্ঞানের যোগে তাকেই প্রস্ফুটিত করে তোলা। এমনি করে প্রথমে ধরতে হবে, মানুষের জীবনভরা বিচিত্র চেষ্টার প্রেরণা কোথা হতে আসছে, তারপর প্রেরণার মূল সূত্রটি ধরে অপরের জীবনেও তাকে পরিস্ফুট করবার সঙ্কেতটা আবিষ্কার করতে হবে। সেই হবে শিক্ষার খাঁটী বনিয়াদ। এর পর বাইরের দিক দিয়ে যদি তাকে মূর্ত্ত করে তুলবার জন্ত কোনও আয়োজনের প্রয়োজন হয়, তাহলে তাতে কারো কৃপণতা দেখা যাবে না—কিন্তু আসলে দেখতে হবে শিক্ষার ভিত্তিটা প্রাণের মূল থেকে গেঁথে তোলা হচ্ছে কি না।

শিক্ষাকে এইভাবে প্রাণ দিয়ে পূর্ণ করলে তা আগাগোড়া এমনি আশ্চর্য্যরূপ স্বচ্ছ হয়ে ওঠে যে, জীবনের আলো তার কোথাও বিন্দুমাত্র সঞ্চরণের বাধা অনুভব করে না—আর এতেই শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ সত্য ও সার্থক হয়। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা কি শিক্ষাকে এই ভাবে বুঝতে চাই? শিক্ষা ও জীবনকে পৃথক দেখতে আমরা এতদূর অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, শিক্ষা বলতেই আমাদের মনে হয়, সে যেন অলঙ্কারের মত বাইরের একটা বস্তু। এমন কল্পনা জীবনের সৌন্দর্য্যকেও যেমন অপমানিত করে, শিক্ষার আদর্শকেও তেমনি সঙ্কুচিত করে। জীবনকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করে যেমন আমরা তার একটা অংশের সঙ্গে আর একটা অংশের বিরোধ ঘনিয়ে তুলি, তেমনি শিক্ষাকেও মানসিক, আর্থিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি বহু কোঠায় ভাগ করে করে তার আসল তাৎপর্য্যটাই আমরা হারিয়ে বসি। এমনিতর বিশ্লেষণে সূক্ষ্ম বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কর্ম্মক্ষেত্রে তা থেকে কিছু সুবিধাও হয়ত মিলতে পারে, কিন্তু এতে সমস্ত ব্যাপারটাকে অখণ্ড দৃষ্টি দিয়ে দেখবার কোনও অবকাশ না রেখে শিক্ষার জীবনীশক্তিকে আমরা যে পরিমাণে আহত করি, জীবনের চরম সার্থকতা হতেও

আমরা নিজেকে সেই পরিমাণে বঞ্চিত করে থাকি। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে কোনটাই কোনটার সঙ্গে মিলে না, অথচ প্রাণশক্তির যোগে তাদের মাঝে এমন একটা ঐক্য সম্ভবপর হয়েছে যে, তাদের একের আঘাত আর সকলের মর্ম্মে গিয়ে বাজে। জীবনের বহুমুখী চেষ্টা আর শিক্ষার বিভিন্ন আদর্শ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। এ দুটীও তখনি ঠিক ভগবানের অভিপ্রায়ের অনুকূলে চলতে থাকবে, যখন দেখব, তাদের বৈচিত্র্যের মাঝেও এমন একটা গভীরতর ঐক্যের সঞ্চার হয়েছে।

ঠিক এই অর্থে শিক্ষা আর জীবন এক হয়ে দাঁড়ায়। জীবন যেমন ভিতরের শক্তিতে ভিতরের আনন্দে নিজকে ফুটিয়ে তোলা—শিক্ষাও ঠিক তাই; শিক্ষা জীবনে ফুটে উঠবার একটা বিশেষ ভঙ্গী মাত্র—তা কোনও কলও নয়, কসরতও নয়—সার্ব্বভৌম জীবন থেকে তার কোনও পৃথক অস্তিত্ব নাই। এই ভাবে দেখলে এই জীবনেরই প্রকাশের যেমন আদি নাই, অন্ত নাই, তার চিরসঙ্গী শিক্ষারও তেমনি আদি অন্ত নাই—সে-ও যেন আপনাকে ফুটিয়ে তুলবার জন্যই চিত্তের আনন্দভরা সজীব চেষ্টা। এ জায়গায় যে শেখে, তার দিক থেকে শিক্ষা আর জীবনের সকল পার্থক্য লোপ হয়ে যায়, কিন্তু সেই অনুপাতে সে শিক্ষায় তার দায়িত্ব তার প্রাণের চেষ্টাও তীব্র হয়ে ওঠে। এই জন্য শিক্ষা ও জীবনের পার্থক্য শিক্ষার্থীর চোখে পড়ে না এবং তার চোখে তা না পড়াই সব রকমে শ্রেয়ঃ; কিন্তু যিনি শিক্ষা দেন, তিনি দেখেন শিক্ষা দেওয়া তাঁর প্রাণ প্রকাশেরই একটা বিশেষ ভঙ্গী—তাঁর দিক থেকে শিক্ষা আর জীবনে যদি পার্থক্য কোথাও থাকে, তা শুধু বিভাবের পার্থক্য, মূলের পার্থক্য নয়।

জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে এমনিভাবে মিশিয়ে দিতে পারলে, বর্ত্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সব চেয়ে গুরুতর যে অভিযোগ, সেটা দূর হয়ে

যায়। আমরা এই বলে দুঃখ করি যে, শিক্ষার ফলে আমাদের মাঝে মৌলিকতার সৃষ্টি হয় না। সেটা যে আমাদের মাথার দোষ নয় বা বুদ্ধির দোষ নয়, একথা নিশ্চয়, কারণ পরের কথাগুলো বেমালুম হজম করে ফেলাটাও একটা কম শক্তির পরিচায়ক নয়, আর সে শক্তির পরিচয় দিতে আমরা কোথাও কসুর করিনি। কাজেই মৌলিকতার অভাব যদি কোনও কারণে ঘটে, তাহলে সে কেবল আমাদের শিক্ষার দোষে। জীবনে কারো অনুকরণ করা চলে না, এই সত্যকে মেনে নিয়ে শিক্ষার মাঝেও যদি আমরা জীবনসঞ্চার করতে পারতাম, তাহলে তার ফলে শিক্ষার গুণে মানুষ গোড়া হতেই মৌলিক হয়ে উঠ্‌তো। একটু লক্ষ্য করলে দেখ্‌তে পাব, এ জগতে মৌলিকতার অভাব কারো হচ্ছে না—মানুষকে শিক্ষার কৃত্রিম সংস্কার দিয়ে যে ক্ষেত্রে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে, সেই সেই জায়গা ছেড়ে আর সর্ব্বত্রই সে অল্পবিস্তর মৌলিকতার পরিচয় দিচ্ছে। যে জায়গায় তার প্রাণ কৃত্রিমতার বেষ্টনী হতে মুক্ত হয়েছে, সেই জায়গাতেই সে নূতন ভঙ্গীতে আপনাকে প্রকাশ করেছে। এই সৃষ্টি করবার প্রতিভাকে বাধাহীন করে রাখাই হচ্ছে আসল কথা। কিন্তু তা করবার জন্য যে নূতন করে কোনও মাল-মসলা জুটিয়ে আনতে হবে, তাও নয়—শুধু বাইরের কোনও আবর্জ্জনা এসে যাতে জীবনের এই সহজ চেষ্টাকে বাধা না দেয়, সেই দিকেই আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। গোড়াতে যদি জীবনকে কিছুতে আড়ষ্ট করে না রাখে, তাহলে নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে বুদ্ধিও দিন দিন জীবন্ত হয়ে উঠবে। এই বুদ্ধিই তো প্রতিভা—আর প্রতিভার দানই তো মৌলিকতা। শিক্ষাকে জীবন্ত করতে পারলে কর্ম্মে প্রতিভার স্ফুরণ আপনা হতেই হবে, তার জন্য কোনও সাধ্যসাধনার প্রয়োজন

হবে না। তার জন্য সজীব চেষ্টা চাই—কিন্তু সে তো জীবনেরই ধর্ম্ম।

এই জীবন্ত শিক্ষা আমরা পাব কার কাছে?—প্রাণের বিদ্যুতে ভরা মানুষের কাছে—আইনকানুনে বাঁধা কোনও কলের কারখানার কাছে নয়। কলছাঁটা জিনিষের পালিশ খুব চিক্কণ হতে পারে, কিন্তু তার মাঝে যে প্রাণ থাকবে, স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি থাকবে এমন সন্দেহ করবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। অবস্থাবিশেষে মানুষও যে এই কলের সামিল হয়ে যেতে পারে, তা তো আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা একে তো জীবনকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে, শিক্ষাকে রকমারি কোঠায় ফেলে তাকে কুশ্রী করেছেই, তার উপর যেটুকুও সে দেবার ভাণ করছে, সেটুকুও সে মনের সঙ্গে দিচ্ছে না। সমগ্র শিক্ষার অভিনয়ের মাঝে এমন একটা অঙ্কও দেখি না, যেখানে প্রাণের যোগে শিক্ষার্থীর মাঝে প্রাণকে জাগাবার কোনও চেষ্টা করা হচ্ছে। সব জায়গাতেই আছে কেবল আইন আর কানুনের শাসন, আর সার্থকতার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীর মনে ভুয়া সম্মানের লোভ জাগিয়ে। যেখানে সব জিনিষেরই বিচার হবে বাইরের লাভালাভ দিয়ে, সেখানে মনুষ্যত্ব জাগবে কিসের প্রেরণায়? তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার গুণে ডিগ্রীওয়ালার সংখ্যা অগুণ্‌তি হলেও খাটী মানুষ গুণ্‌বার বেলায় কাউকে পাওয়া ভার হয়। আর যদিও বা মানুষের মত মানুষ কেউ এ যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসে—সেও কেবল নিজের গুণে, যন্ত্রের এত নিষ্ঠুর পেষণেও তার কঠিন প্রাণটা থেঁৎলে যায়নি বলে।

স্নেহ ভালবাসা না পেলে মানুষের জীবন কিছুতেই ফুটে ওঠে না—তার জন্যই প্রাণতপ্ত বুকের স্পর্শে অপরের বুকের মাঝে প্রাণকে জাগিয়ে তোলা। যন্ত্রের গড়ন যতই সূক্ষ্ম হোক্ না কেন, মানুষের এই অন্তরের

দাবীটুকু মিটাবার সাধ্য তার কোথায় ? যন্ত্র যে মিথ্যা, তার একমাত্র প্রমাণ এই যে, সে ভালবাসতে পারে না। মানুষের মাঝে যেটুকু জড়, সেইটুকুর উপরই তার কারিগরি চলে, সেইটুকুকেই সে কাটতে ছাঁটতে পারে, কিন্তু মানুষের প্রাণটুকু তো তার কাছে ধরা পড়ে না। আমাদের দেশের শিক্ষার সময়টা যে এত নিরানন্দে কেটে যায়, তার মূল কারণও হচ্ছে এই প্রাণের অভাব। যৌবনের সীমা ছাড়িয়ে এসে যাঁরা ছাত্রজীবনের সুখের কথা স্মরণ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, তাঁদের এই ভুল হয় যে, ছাত্রত্বের বন্ধনকে তরুণ জীবনের স্বাভাবিক স্ফূর্তির সঙ্গে তাঁরা এক করে মিশিয়ে ফেলে ভাবেন যে মোটের ওপর তাঁদের “ছাত্র-জীবনটাই” বুঝি সুখের ছিল। কিন্তু এটাই একটা কত বড় লজ্জা আর পরিতাপের বিষয় যে, এই ছাত্রেরা যে দেশের ছাত্র—সেই দেশেরই বিপুল প্রাণের স্পন্দন তাদের বিদ্যালয়ের প্রাচীরে এসে কুণ্ঠাহত হয়ে ফিরে যায় ; বাইরে এলে তারা যেন নূতন আশায় উৎফুল্ল, নবীন তেজে উদ্দীপ্ত তরুণ যুবক আর বিদ্যালয়ের ভিতরে ঢুকলে তারা একেবারে নিতান্ত নিরীহ গোবেচারী—পড়ে-পাওয়া বিদ্যার রোমন্থনে মুদ্রিতনয়ন। সেখানে মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু এই দোটানার প্রবঞ্চনায় অপচয় হয়ে যায়, সেখানকার শিক্ষার উপর আমাদের ভরসা কি ?

এই প্রবঞ্চনা হতে বাঁচবার জন্ত দেশের প্রাণের সঙ্গে সত্যিকার যোগ রাখবার জন্ত যদি শিক্ষার প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙ্গে ফেলে আমরা নূতন প্রতিষ্ঠানও গড়তে যাই, তাতেও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, যদি একটি প্রাণবন্ত মানুষের হৃদয়কে আমরা তার সঙ্গে জুড়ে না দিতে পারি। শিক্ষার জগতে আমাদের সকলকেই দ্বিজ হয়ে জন্মাতে হবে—একবার যেমন মায়ের কোলে জন্ম নিয়েছিলাম, তেমনি

আবার মায়ের মতই আচার্য্যের বুকে দেশের সন্তানকে নূতন করে জন্ম নিতে হবে, তবেই জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগে শিক্ষার ধারা বিচ্ছেদহীন হবে। প্রতিষ্ঠানের আড়ম্বরে তত বেশী প্রয়োজন নাই, যত প্রয়োজন এমনিতর মানুষের মত মানুষের। মানুষের হাতেগড়া শিল্পের মাঝে যেমন একটি শ্রীসম্পন্ন মমত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, তেমনি মানুষের স্পর্শে উদ্বোধিত এই জীবনশিল্পেও এমন একটা অনির্ব্বচনীয় বীর্য্যশালী স্বাচ্ছন্দ্যের আভাস পাওয়া যাবে, যাকে খাঁটী বলে মান্‌তে কারু মনে কোনও দিন কোনও সঙ্কোচ আস্‌বে না। এমনি জীবন দিয়ে জীবন গড়ে তোলাই হবে শিক্ষার চরম আর্ট। এই আর্টে যতদিন না কোনও জাতির সিদ্ধি লাভ হচ্ছে, ততদিন ব্যর্থতার দুঃখে অসত্যের ঋণ তাকে শোধ করতেই হবে।

মানুষের চিত্তের চেষ্টার সঙ্গে আমরা শিক্ষাকে যুক্ত রাখ্‌তে চাই, কেবল এইটুকু বললেই সব বলা হবে না—আরও স্পষ্ট করে আমাদের বল্‌তে হবে, মানুষের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমরা শিক্ষার যোগসাধন কর্‌তে চাই, বড় বড় আদর্শ আর প্রতিষ্ঠান মানুষের সংঘবদ্ধ চেষ্টাতেই আজ পর্য্যন্ত গড়ে উঠেছে, এই ভরসাতেই যদি শিক্ষাকেও আজ কেবল পরামর্শকমণ্ডলীর পাশকরা আইন-কানুনের জোরেই সার্থকভাবে চালিয়ে নিতে পারব বলে আমরা মনে করি, তাহলে সেটা আমাদের মহাভ্রম হবে। পরামর্শসভা যতই জাঁকিয়ে তুলি না কেন, মনের মানুষটী যে পর্য্যন্ত না আসরে নেমে প্রাণের তারে ঝঙ্কার তুলছেন, সে পর্য্যন্ত বাক্যের আর কার্য্যের সকল আড়ম্বর নিশ্চয়ই বৃথা যাবে। একটা দলের জোটবাঁধা ভালবাসার কাল্পনিক সত্তা ছাড়া যেমন কোনও বাস্তব সত্তা নাই, তেমনি একটা দলের হুকুমে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার কল্পনাতেও কোনও সত্য নাই। শিক্ষা মানুষের আন্তর

ব্যাপার—এখানেই চাই কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রাণময় স্পর্শ। শিক্ষার ব্যাপক অর্থ যদি আমরা বুঝে থাকি, তাহলে এ কথার তাৎপর্য্য বুঝতেও আমাদের বেগ পেতে হবে না। আমরা শিক্ষা বা জীবনকে পৃথক বলে দেখিনি কিম্বা শিক্ষাকেও খণ্ড খণ্ড করে বিচার করিনি। কাজেই এই অখণ্ড অনুভূতির গোড়াতেও একটা অখণ্ড মানুষই আমরা চাই। কেউ শুধু বুদ্ধির সাহায্যে অপরের বুদ্ধিকে তুলে ধরবে, কিম্বা কেউ নিজের নৈতিক আদর্শ ধরেই অপরকে শাসন করবে—এমনিতর খণ্ড খণ্ড মানুষের খণ্ড খণ্ড চেষ্টায় আস্ত একটা মানুষ তো গড়ে উঠ্‌বেই না—যে সমস্ত টুক্‌রা মানুষ এমনি করে সৃষ্টি হবে, তাদেরও প্রত্যেক খণ্ডে খণ্ডে জোড় মিলানো কখনও সম্ভব হবে না। একটা পূরা মানুষের চেষ্টায় একটা পূরামানুষ সৃষ্টি হয়েছে—এমন ব্যাপার কি আজকাল আমরা কোথাও দেখ্‌তে পাই? সব জায়গাতেই দেখ্‌ছি, মানুষ মানুষের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে কৃত্রিমতার আবরণে সত্যকে ফুটিয়ে তুলবার বৃথা চেষ্টাই কর্‌ছে। শিক্ষার যদি নূতন বনিয়াদ গড়ে তুল্‌তে হয়, তাহলে এই কথাটাই আমাদের আগে মনে রাখ্‌তে হবে যে, প্রতিষ্ঠান যত বড়ই করি না কেন, একটা সম্পূর্ণ মানুষের সঙ্গে আর একটা সম্পূর্ণ মানুষের যদি অন্তরের যোগ সেখানে সম্ভবপর না হয়, তাহলে শিক্ষার যত আয়োজন আড়ম্বর—সকলি নিষ্ফল হবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি শিক্ষায় প্রাণ সঞ্চার করবেন, তাঁর সংজ্ঞাটা সুস্পষ্ট হওয়া চাই। নিজকে যিনি প্রাণবান্‌ করতে পেরেছেন, অপরের মাঝে প্রাণসঞ্চার তাঁর দ্বারাই সম্ভব। বাধাহীন বিচিত্র প্রকাশেই প্রাণের সার্থকতা—প্রাণ নির্দ্বন্দ্ব, তা কোনও ঝোঁক বা উত্তেজনা নয়। শিক্ষার প্রকৃত আচার্য্য যিনি হবেন, তাঁকে এই নির্মুক্ত প্রাণের প্রকাশভঙ্গীটা আয়ত্ত করতে হবে। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব যদি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে

আচ্ছন্ন করে, তার নিজের খেয়ালমতই তাকে গড়ে তোলে, তাহলে বুঝব শিক্ষাকে ব্যক্তির অধীন না করে তাকে দলের বাঁধনে বেঁধে রাখাই কল্যাণকর ছিল। এই জায়গাতেই আমাদের সমস্যা কঠিন হয়ে ওঠে। ব্যক্তির প্রভাব শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হোক্‌, এ ও আমরা যেমন চাই, সে প্রভাব কারো চিত্তকে সঙ্কুচিত না করে তারও ব্যক্তিত্বের সত্যটুকুই বাইরে আকর্ষণ করে আনুক্‌, এ ও তো আমরা চাই। আচার্য্যের চিত্ত কতদূর সত্য ও কল্যাণদৃষ্টিসম্পন্ন হলে এমন বীর্য্যশালী উদার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ সম্ভবপর, তা এ হতেও বুঝতে পারি। এ দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু অসাধ্য তো নয়। এই দুঃসাধ্যকে সাধন করবার জন্যই আমাদের তপস্যা করতে হবে—নইলে মিথ্যার ভারে আর কতদিন নিজকে, সমাজকে, দেশকে সঙ্কুচিত করে রাখব?

শিক্ষার্থীর স্বাবলম্বন

বচন আছে, "ছাত্রাণাম্‌ অধ্যয়নং তপঃ।" কিন্তু এ তপস্যার পরিমাণ যদি পাঠ্য-অপাঠ্য পুঁথির বহর আর ডিস্‌পেপসিয়া-জীর্ণ স্বাস্থ্য দিয়ে নির্ণয় করা হয়, তাহলে শাস্ত্র-বচনের মর্য্যাদা থাকে না। যা সহজ হয়েও কর্ম্মবিপাকে দুর্লভ হয়ে উঠেছে, তাকে পাওয়ার জন্য নিজকে তাপ দেওয়াই হচ্ছে তপস্যা। তপস্যায় ছোটকে ছাড়তে হবে—বড়কে পাওয়ার জন্য। বড় একটা সত্যের আদর্শ যদি পরোক্ষে অপরোক্ষে মনকে সামনের দিকে আকর্ষণ করবার সুযোগ না পায়,

তবে তপস্যা কখনও যথার্থ হয়ে উঠতে পারে না। যে ছাত্র, সে জীবন আরম্ভ করেছে মাত্র; সমস্ত সমাজের মমতাভরা দৃষ্টি তার উপর—কেননা একদিন সে যোগ্য হয়ে এই সমাজের জটিলতার অন্ততঃ একটা গ্রন্থি-মোচন করবারও ভার নেবে, এ আশা সমাজ তার কাছে করে। কাজেই কেবল পুঁথি গেলাটাই তার পক্ষে চরম কর্ত্তব্য নয়—তাকে সব দিক দিয়ে মানুষ হতে হবে—তিল তিল সাধনায় এমন একটা সত্যের অধিকার তাকে অর্জ্জন করতে হবে যা সমগ্র সমাজেরই একান্তভাবে মর্ম্মগত। জীবনের বাইরের রূপটা যেমন হয়েই ফুটে উঠুক না কেন, ভিতরের দিক দিয়ে সরল সহজ মনুষ্যত্বের গৌরবে সমগ্র সমাজের অন্তর-পুরুষের সঙ্গে যদি তার যোগ না থাকে, তবে শিক্ষা ব্যর্থ বলতে হবে। সমাজ যে তার শিক্ষার সময়টা সকল রকম আনুকূল্য দিয়ে নিরঙ্কুশ করবার চেষ্টা করেছে, সে চেষ্টা তাহলে বৃথা হয়েছে।

এই জন্য প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকেই সমাজ তপস্যার দাবী করতে পারে। শিক্ষার যে ঋণ জীবনের প্রারম্ভে সমাজের কাছে প্রত্যেক্যের জমা হয়ে উঠেছে, সত্যের তপস্যায় তাকে পরিশোধ করা প্রত্যেক্যেরই কর্ত্তব্য। হয়ত সমাজ আজ তার দাবীর কথা ভুলে গিয়েছে; কিন্তু তা বলে ভগবানের হিসাবে তো দেনার অঙ্ক একটাও মুছে যায় নি—তাঁর ন্যায় বিচারে ঋণের ক্ষতি যে উভয়কেই সইতে হবে।

সরল মনুষ্যত্ব অর্জ্জন—এই হল তপস্যার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য ধরেই শিক্ষার আদর্শকে আমাদের মনের মাঝে সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে। তপঃসাধনারও নানা দিক রয়েছে, তার মাঝে একটা হচ্ছে স্বাবলম্বন। শিক্ষার সঙ্গে স্বাবলম্বনের কি সম্বন্ধ, তাই নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

স্বাবলম্বনের মাঝে যে রিক্ততা, যে পৌরুষ, যে সরলতা রয়েছে, তাকেই আমরা বিশেষ ভাবে লাভ করতে চাই। আমাদের দেশের ছাত্রজীবন যে বাহুল্যের আবর্জনায় কতখানি ভারাক্রান্ত, অথচ সে যে কতখানি অশক্ত নিরুপায়, তা তো কারু অজানা নেই। হাত পাতলেই মিলে, এই নীতির উপর যদি জীবন গড়ে উঠে, তাহলে তাতে অশক্তি ছাড়া আর কি জন্মাবে? অবশ্য ছাত্রজীবনের চারদিকে যথেষ্ট পরিমাণে অবকাশ রচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এই অবকাশটুকু তো আবার বীর্য্য দিয়ে পূর্ণ করা চাই, আত্মশক্তির উদ্বোধনে তাকে নিযুক্ত করা চাই। তা করতে হলেই সামাজিক জীবনের যে সমস্ত বৈচিত্র্য রয়েছে, তার সঙ্গে ছাত্রজীবনেরও ঘনিষ্ঠতা প্রয়োজন। বৃহৎ মানবসমাজের যে সমস্ত কর্ত্তব্য, যে সমস্ত দায়িত্ব, তাদের সঙ্গেই যদি ছাত্রের পরিচয় না ঘটল, তবে শুধু কতকগুলি কেতাবের বুলি মুখস্থ করে তার কি কোন কার্য্যকরী শিক্ষা হবে? বর্ত্তমানের চলিত শিক্ষাতে বুদ্ধিবৃত্তির বিকৃত অনুশীলন হয় মাত্র। আর সেই অনুশীলনটুকুর সুবিধার জন্য, ছাত্রজীবনের চারদিক আমরা এমনি করে আঁটেঘাটে বেঁধে দিয়েছি যে, এই অনায়াসপ্রাপ্য সঙ্কীর্ণ জীবনের পরপারেও যে জীবনসংগ্রামের একটা ক্ষেত্র রয়েছে, মানুষের কর্ত্তব্যের একটা বৃহত্তর ভূমি রয়েছে, শিক্ষার্থী তার কোনও সন্ধানই পায় না। নিতান্তপক্ষে এই বৃহত্তর কর্ম্মজগতের সে দর্শকমাত্র, এর সুখ-দুঃখ-চেষ্টায় প্রতি তার ঔদাসীন্য ছাড়া কোনও শ্রদ্ধা বা মমতার ভাব নাই। অথচ এমনি কর্ম্মে অনভ্যস্ত জীবনের উপর যখন শিক্ষান্তে সংসারের দায়িত্ব চেপে বসে, তখন তার যে কি দুর্দ্দশা ঘটে, তার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

কর্ম্মজীবনের প্রতি শুধু ঔদাসীন্যই নয়—ছাত্রজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌষ্ঠব বাড়াবার জন্য আধুনিক সাম্যনীতির অনুমোদিত যে সমস্ত ব্যয়বহুল ব্যবস্থার পত্তন আমাদের দেশে হয়েছে, তাও জীবনকে অন্তঃসারহীন করবার পক্ষে কম সাহায্য করে না। শিক্ষার মাঝে যদি তপঃকৃচ্ছ তার আদর্শ প্রচার থাকৃত, তাহলে সেটা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক হত। ঐশ্বর্য্যের কোলে যার জন্ম, সে যদি শিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য দুঃখ-কষ্টকে স্বীকার করে নেয়, তাতে তার ক্ষতি বা অগৌরবের কোনও কারণ ঘটে না, কেননা দুঃখের ভূমিতে সাম্যই আত্মবিকাশের অনুকূল। কিন্তু শিক্ষা-জীবনের আদর্শ যদি সমাজের গুটিকতক সচ্ছল ব্যক্তির জীবনের আদর্শে গড়ে তোলা হয়, আর সৌষ্ঠব ও সুব্যবস্থার দোহাই দিয়ে গরীব দুঃখীর ছেলেকেও যদি সেই উচ্চ মঞ্চে টেনে তোলা হয়—তাহলে এই আপাতমনোরম সুখের সাম্য পরজীবনে যে বৈষম্যটুকু ঘটাবে, তার জন্য দায়ী হবে কে? নাগরিক সভ্যতার বনিয়াদের উপর শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন করতে গিয়ে এই ভুলটা ঘটেছে। দেশের কর্ম্মশক্তি, প্রাণশক্তি যেখানে যথার্থ পরিপুষ্ট হচ্ছে, সেখান হতে ছাত্রের জীবন নির্ব্বাসিত। সেখানকার যে দুঃখ-দ্বন্দ্ব, যে কর্ম্মপ্রেরণা, যে আশা-আকাঙ্ক্ষার আন্দোলন, তার ছোঁয়াচ হতে বাঁচিয়ে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ইন্দ্রজালে তাকে মুগ্ধ করলেই কি শিক্ষা সার্থক হবে? যে ঐশ্বর্য্যের অভিনয়ের সঙ্গে অধিকাংশ ছাত্রেরই হয়ত পরজীবনে কোনও সম্বন্ধ থাকবে না, তার পাঠটা এখন হতেই অভ্যাস করানো কি বড় সুখের হবে? আর সম্বন্ধ থাকলেও কি বাহুল্যকেই শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে স্বীকার করতে হবে?

শিক্ষার সময়টাতেই যে এমনি করে বিলাসব্যসন দিয়ে শিক্ষার্থীর মনুষ্যোচিত সরল অধিকারগুলিকে খর্ব্ব করা হয়, এর চেয়ে দুর্দ্দৈব আর কি হতে পারে? উঁচুদরের শিক্ষা লাভ করতে হলেই যে নাগরিক সভ্যতার আশ্রয় নিতে হবে, এই অন্ধ সংস্কার থেকেই এমনিতর বিপত্তি ঘটেছে। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের মাঝেও মানবজাতির সমগ্র বিবর্ত্তনের ধারার পুনরভিনয় হয়ে থাকে, বৈজ্ঞানিকের এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে যে যুগে মানুষ নগর-সভ্যতার পত্তন করতে শেখেনি, সেই যুগের প্রাকৃতিক আবহাওয়াটা প্রাথমিক শিক্ষা-জীবনে সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখা নিশ্চয় শিক্ষার্থীর শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক পুষ্টির পক্ষে অনুকূল হবে। শুধু প্রকৃতিকে ফিরিয়ে আনা নয়, তার সঙ্গে জীবনের সেই সরল আদর্শও ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। সে আদর্শ আমাদের দেশ থেকে এখনও তো সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি, এখনও তো তাকে আমরা বহু শতাব্দীর অতীত জীর্ণ স্মৃতির কোঠায় ফেলে দিইনি। সভ্যতার উন্নতির (!) সঙ্গেই জীবন ক্রমেই জটিল হয়ে উঠেছে, তা দেখতে পাচ্ছি; কাজেই আগেকার মত বনের কোলে ছোট একটী পাতার কুটীরের কল্পনা কতদূর কার্য্যকরী হবে, তাতে সন্দেহ করবার যথেষ্ট হেতু আছে। কিন্তু বাইরের খোলসটাই না হয় বদলিয়েছে, তা বলে মানুষের অন্তরের যে প্রয়োজন ছিল, তার কি কোনও অদল বদল হয়েছে? জটিল নাগরিক সভ্যতা গড়ে তুলেছি বলেই যে চিরদিন তার বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা আছে কি? সভ্যতার গুণ অনেক, কিন্তু তাই বলে তার দোষগুলির সংস্কার চেষ্টার কি কোনও প্রয়োজন নাই?

সমাজ-জীবনের কৃত্রিম অভাবগুলিকে খাটো করে তথাকথিত সভ্যতার বাহুল্যকে ছাঁটা যায় কি না, সে প্রশ্ন না হয় এখন থাক্। কিন্তু উপস্থিত মানুষের জীবনের অন্ততঃ একটা অংশকেও কি করে সভ্যতার নাগপাশ হতে মুক্ত করা যায়, তাই আমাদের ভাবতে হবে—শিক্ষাকে ভিতর বাইর সব দিক দিয়ে আবার প্রকৃতির কোলে ফিরিয়ে নেওয়া চলে কি না, তাই দেখতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে নাগরিক সভ্যতার সংস্পর্শের একটা বিষময় ফল এই দেখতে পাচ্ছি, এতে শিক্ষার্থীর মন একটা আড়ষ্ট সংকীর্ণ আবেষ্টনের মাঝে অবরুদ্ধ হয়ে থাক্ছে, জীবনের মাঝে কোন প্রচেষ্টার গতি সে অনুভব করছে না, নগরের বাইরে দেশের যে সত্য সরল রূপ, তার কল্পণা তার হৃদয়কে স্পর্শ করছে না,—কতকগুলি কৃত্রিম অভাব, কৃত্রিম আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে, তারই পরিপূরণে জীবনটাকে নিয়োজিত করাই সে পুরুষার্থ ভাবছে। সব চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, এতে সবরকমে তার পরনির্ভরতাই বাড়্ছে, নিজের মাঝে পুঁথি মুখস্থ করার অত্যাশ্চর্য্য শক্তি ছাড়া আর কি শক্তি যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তার পরিচয় সে পাচ্ছে না। এই জন্যই দেখা যায় বহু আড়ম্বরে, বহু অর্থব্যয়ে শিক্ষার পাঠ সাঙ্গ করে ছেলে যখন ঘরে ফিরে এল, তখন কৌলিক প্রথা অনুযায়ী চাকরীর চেষ্টা ছাড়া তার উদ্ধারের কোন উপায় রইল না। আজকাল Vocational trainingর কথা উঠেছে বটে, কিন্তু তার মাঝেও যদি, কতখানি কম চেষ্টায় বিলাতি বিদ্যার আধুনিকতম কলকৌশলগুলি হাতড়াতে পারব, এই ধুয়াটাই প্রবল হয়, তাতে তো তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল দুই-ই যাবে।

সহরে থেকে জান্ছি পয়সা দিলেই সব মিলে; কাজেই যা যখন দরকার, পয়সা দিয়েই তা কিনে আন্ছি—একটা জিনিষ

উৎপন্ন করবার কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব নাই, দরকার মত পয়সা দিলেই হল। এই অর্থবিনিময়-নীতির উপর সমস্তটা জীবন দাঁড় করানো ছাড়া যে আমাদের আর কোনও উপায় ছিল না, তা তো. মনে হয় না। এখনো আমাদের দেশের অবস্থা এমন হয়নি যে সূক্ষ্ম জ্ঞান-বিজ্ঞান কলা-কৌশলের উদ্ভাবনে আমরা সকলেই এত ব্যস্ত থাকি যে নিজের প্রয়োজনটুকু পয়সা দিয়ে মিটানো ছাড়া নিজ হাতে করে নেবার ফুরসৎ আর হয় না। অপরের পক্ষে কেমন ব্যবস্থা সম্ভব, তা বল্‌তে পারি না, কিন্তু যারা বিদ্যার্থী, অন্ততঃ তাদের তো অবকাশের নিতান্ত অভাব নাই, তাদের কেন করে-খাওয়ার খেটে-খাওয়ার বিদ্যাটা আমরা শিখাই না? অবশ্য বিলাতী ধরণে দশটার সময় ঘণ্টা বাজিয়ে পুঁথিপত্তর সামনে জড়ো করে লেক্‌চার দিয়ে ও বিদ্যা কতখানি শেখানো যায়, তা জানি না। কিন্তু জীবনের আদর্শ সরল করে, শিক্ষার মন্দিরে পল্লীর স্নিগ্ধতাটুকু সঞ্চারিত করে, ঠিক গ্রামের মাটীতে পা দিয়ে যে অনায়াসে এ বিদ্যা আমরা লাভ করতে পারি, তা বিশ্বাস করি। তবে মূলে ওই একটা কথা—সহরের লোভ ছাড়তে হবে, জুতা জামার কদর ভুলতে হবে, দেশমায়ের ধূলায় বিছানো আঁচলখানিতে আসন নিতে হবে। এই সরলতাটুকু চারদিকে বজায় রেখে কি উচ্চ শিক্ষার আমদানী করা যায় না? একটু আলো হাওয়া, দুচারটা গাছপালা, সকাল সন্ধ্যায় একটু পাখীর গান, দু'চারটী হাতেপায়ে খেটে-খাওয়া সহজ মানুষের সরল মুখ—উচ্চাঙ্গের বৈদেশিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি এমন আসরে নামলে জাত যাবে? তা ছাড়া যারা তার আলোচনা করবে, পৃথিবীর ধূলার অঙ্কে তাদের সংস্পর্শ কি দোষের হবে? আমাদের দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের তো এত কৌলীন্য ছিল না। উপনিষদ্-

জ্ঞানের রাজা রাজর্ষি জনকও তো লাঙলের খুঁটীতে হাত দেওয়াটা বর্ব্বরতা মনে করেন নি। কেবল আমরাই আমাদের যজ্ঞভূমি পরকে দিয়ে চষাব?

স্বাবলম্বনের মুখ্য অর্থটা আমরা সরল জীবন যাপনের দিক দিয়েই দেখ্‌ছি। এর ইকনমিক ফল কি হবে, ইকনমিষ্ট তার লাভ লোকসান খতিয়ে দেখুন; আমরা কেবল এইটুকু দেখছি, এর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ফল কি দাঁড়াবে। বর্ত্তমান শিক্ষায় আমাদের যেটুকু লাভ হচ্ছে, এর দরুণ তার মাঝে তো কোন কমতি পড়বে না—বরং সময়ের বহু উচ্ছৃঙ্খল অপব্যয় এতে সঙ্কুচিত হবে। নিজে করবার, নিজে খাটবার সুযোগ যদি থাকত, তাহলে আত্মগৌরব বজায় রেখে অনেক গরীবের ছেলেরও যেমন শিক্ষার সুব্যবস্থা হত, দুঃখের তপস্যায় ধনীর সন্তানের মনুষ্যত্ববোধও তেমনি প্রদীপ্ত হয়ে উঠত।

এই সঙ্গে প্রাচীন যুগের কথা মনে পড়ে। আধুনিক সভ্যতার বিকারে যে socialism মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তার একটা ব্যবস্থা প্রাচীন সমাজপতিরা গোড়া হতেই করে রেখেছিলেন। তবে তার প্রণালীটা ছিল psychological; শিক্ষার সময়েই ধনী আর গরীবকে তাঁরা একই জোয়ালে যুড়ে দিয়েছিলেন। তার ফলে উভয়ের মনে যে democratic মনোবৃত্তি জাগ্রত হত, তাতে কারু ন্যায্য অধিকারের উপর অন্যায় জবরদস্তি না করেও, সমস্তটা সমাজে প্রচ্ছন্ন socialismএর একটা একটানা স্রোত বয়ে যেত। আজকালকার যুগেও যদি সরল জীবনের আদর্শে আমরা এমনিতর একটা স্বাবলম্বী শিক্ষার্থীর সমাজ গড়ে তুলতে পারি, তাহলে সভ্য সমাজের সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্য স্বীকার করেও কি ভিতরে ভিতরে সমাজকে democratic করে তোলা যায় না?

কিন্তু democracyর কথা এখন থাক। স্বাবলম্বনের শিক্ষায় আমরা যে জিনিষটা চাই, সে হচ্ছে আমাদের আত্মশক্তির উদ্বোধন। অবশ্য democracyর কথা এর মাঝে আসবেই, কেননা মানবাত্মার মর্য্যাদা স্বীকার করে তার উপর বিনা প্রয়োজনে কর্ত্তৃত্ব করবার লোভ যদি সম্বরণ করতে না শিখি, কৃত্রিমতার বেড়াজাল হতে মুক্ত করে জীবনকে যদি স্বচ্ছন্দ ও স্বল্পসন্তুষ্ট না করতে পারি, তবে স্বাবলম্বনের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য থাকে না। সর্ব্বাগ্রে জানতে হবে, নিজের উপর যথার্থ শ্রদ্ধা থাকলেই পরকে শ্রদ্ধা করবার শক্তি জন্মে। কাজেই আগে আমাদের মাঝে "স্ব" কোথায় তাই বুঝে নিয়ে তাকে অবলম্বন করে জীবনকে গড়ে তুলতে পারলেই আমরা যথার্থ স্বাবলম্বী হব। তপস্যা নিজকে খুঁজবার জন্ত। স্বভাবতঃই আমরা বহির্ম্মুখ হয়ে জন্মেছি—এর উল্টা দিকে মোড় ফিরে না দাঁড়ালে "স্ব" এর সাক্ষাৎ পাব কোথায়? কিন্তু ভিতরের দিকে না তাকিয়ে যদি বাইরের আবরণগুলিকেই আরও পুরু করে তুলি, তবে প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে কি আমরা আরো দূরে সরে পড়্ব না? তাইতো বলি, জীবনের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে বাইরের জঞ্জালগুলোকে সকলের আগে বিদায় করা—ঠিক প্রকৃতির আইন বুঝে যতটুকু নইলে নয়, ততটুকুতেই তৃপ্ত থাকা। স্বাবলম্বীর পক্ষে সরল জীবনের আদর্শ এই জন্ত সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। বাইরের খাঁকতি যদি না কমে, তাহলে ভিতরের খোঁজ কোন দিন মিলবে না।

কিন্তু জীবনকে সরল করতে হলে সর্ব্বদা লড়াইর জন্ত প্রস্তুত থাকতে হবে—কারণ আমরা সংস্কার ছাড়তে চাইলেও সংস্কার তো সহজে আমাদের ছাড়তে চাইবে না। এই জন্ত অনেক গুণ অর্জ্জন করা প্রয়োজন হবে—তাই হল স্বাবলম্বীর সাধনা। প্রথম চাই তিতিক্ষা; শরীরের তিতিক্ষাও যেমন চাই, মনের তিতিক্ষাও তেমনি

চাই। কিন্তু তিতিক্ষা তখনই সহজ হবে, যখন আমাদের আকাঙ্ক্ষার, একটা সীমা থাকবে। মনের মাঝে যদি পর্য্যাপ্তি বোধ না জন্মে, তাহলে জীবনকে সরল করবার জন্য অল্প আয়োজন নিয়ে কাজ সুরু করলেও মনের লোলুপতা তাকে নানা অছিলায় বাড়িয়ে তুলবার চেষ্টা করবেই। কিন্তু আকাঙ্ক্ষাকে খর্ব্ব করতে গিয়ে চেষ্টাকেও যদি খর্ব্ব করি, তাহলে আবার একটা ভুল হবে। আত্মার শক্তি তো এতে উদ্বুদ্ধ হবে না। তা হলে চেষ্টাকে জাগ্রৎ রেখে যে শক্তি সঞ্চয় করব, নিজ প্রয়োজনে তার স্বল্প মাত্র অংশ রেখে উদ্বৃত্তটুকু দিয়ে কি করব? এইখানেই স্বাবলম্বী সমাজ গড়ে তুল্‌বে। তার "স্ব" এর তাৎপর্য্য তো কেবল অহং-এর মাঝেই সঙ্কুচিত নয়;—তাই আত্মার মাঝে যে মহত্ত্ব, যে প্রেম রয়েছে, তাকে আশ্রয় করেই নিজকে তার উৎসর্গ কর্‌তে শিখতে হবে। এই উৎসর্গের দীক্ষা যাঁরা নিয়েছেন, তাঁরা জানেন—নিজের চেষ্টায় কোনও কিছু লাভ করবার ভাগ্য যাদের হয়নি, তাদের দান করবার অধিকার কিছুতেই জন্মায়নি। পরের ধনকে গ্রাস করবার বেলাতেই তাদের মমতার পরিচয় মিলে, নিজের ধনকে বিলিয়ে দিয়ে পরকে মমতার টানে তারা টানতে পারে না।

স্বাবলম্বনের শিক্ষার এই চরম লক্ষ্য। সকল হতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করে, রিক্ত করে, আঘাত সয়ে, বেদনা বয়ে, আমাদের চল্‌তে হবে। কিসের জন্য? নিজকে উদ্বুদ্ধ করে পরের প্রয়োজনে বিলিয়ে দেবার জন্য। নিজেকে নিঃসঙ্গ করা নিজের একান্ত-ভোগের সুবিধার জন্য নয়,—নিজের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রৎ করে আত্মার ব্যাপ্তি উপলব্ধি করবার জন্য। এর মাঝে কোনও আধ্যাত্মিক আভিজাত্যের কথা নাই—এ ধর্ম্ম যাজন করা সকলের পক্ষেই সম্ভব। গৃহী তার নিত্যকার গৃহকর্ম্ম সমাপন করেও,—কার্য্যতঃ সব সময় না হোক্—অন্ততঃ চিন্তাতেও

আপনাকে সকলের সঙ্গে ব্যাপ্ত বলে অনুভব করতে পারে, যদি তার যৌবনের শিক্ষায় তার মাঝে অহং তৃপ্তির বাইরেও কোনও উদার ভাব জেগে থাকে। সব দিক দিয়ে নিজের শক্তিকে অনুভব করবার সুযোগ যার হয়নি, পরের জন্য যথার্থভাবে সে ভাব্‌তে শিখবে কি করে?—সে তো সঙ্কটের সঙ্গে হাতে-পায়ে যুঝে জীবনের বাস্তব আস্বাদ কোনও দিন পায়নি; সে কি করে বুঝ্‌বে—অবস্থার পীড়নে যাকে যুঝ্‌তে হচ্ছে, তার কি ব্যথা! আমাদের শিক্ষার মাঝে জীবনের এই যথার্থ আস্বাদ পাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নাই বলেই পরের জন্য দুঃখ দরদটা কেবল কাগজেই ফুটে উঠে—হৃদয় দিয়ে ব্যথা বুঝ্‌তে পারি না বলে তার প্রতিকারের মাঝেও অদূরদর্শিতা, আত্মপ্রবঞ্চনার অভাব থাকে না।

তাই বলি, শিক্ষার ব্যবস্থাটা আমাদের গোড়া হতে পরিশুদ্ধ করে তুলতে হবে। শুধু পুঁথির শিক্ষা নয়, জীবনগঠনের কাজেও শিক্ষানীতিকে প্রয়োগ করতে হবে। কেবল সামাজিক স্তরের কোঠায় কোঠায় ভাগ করে জীবনকে পঙ্গু করা নয়—মানুষের সকল প্রচেষ্টা সকল সংগ্রাম, সকল বিপত্তির সঙ্গে পরিচয় লাভ করা চাই। মানব-জীবনের বৈচিত্র্য বুঝবার রসবোধ তখনই জন্মাতে পারে, যখন বোদ্ধার নিজের জীবন থেকে সমস্ত সংস্কারের আবর্জ্জনা খসে পড়ে তাঁর অনাড়ম্বর নির্ম্মল আদিম মানুষের রূপটিই ফুটে ওঠে। আবার এই বোঝার সঙ্গে সঙ্গে অসত্যকে পরাজয় করবার জন্য, দুর্ব্বলতাকে উদ্ধার করবার জন্য, অক্ষমতাকে ক্ষমা করবার জন্যও শক্তি থাকা চাই। তপস্যা ভিন্ন এ শক্তি আসবে না। সে তপস্যা সমাজের প্রত্যেক সন্তানেরই কর্ত্তব্য। তপস্বী সমাজ-সন্তানের আত্মোৎসর্গেই সমাজ দৃঢ় হবে, তার অকল্যাণ দূর হয়ে যাবে। যাতে এমনি সর্ব্বতোমুখী উদার দৃষ্টিসম্পন্ন সন্তান গড়ে উঠে, তার জন্য সমাজের কি কোন দায়িত্বই নাই?

শিক্ষার্থীকে আত্মশক্তি উদ্বোধনের শিক্ষাই দাও। সে যেন মুহূর্ত্তের জন্তও মনে না করে যে, কর্ম্মবিমুখ হয়ে অপরের উপার্জ্জনে নিজকে বাঁচিয়ে রাখার মাঝে কোনও লজ্জাই নাই। শুধু কোনও রকমে টিকে থাকাতেই তার জীবনের সার্থকতা নয়, সব দিক দিয়ে নিজকে ব্যক্ত করে তুলতে পারলেই তবে সে সমাজের ঋণ শোধ করতে পারবে। দেহ, মন, আত্মা—এই তিন নিয়ে মানুষ, মানুষ! আত্মশক্তিকে কেন্দ্র করে দেহের কর্ম্মশক্তি আর মনের মনীষা উভয়কেই জাগ্রৎ করতে হবে ও পরস্পরের কল্যাণে তাদের ব্যাপ্ত করতে হবে। এই হচ্ছে স্বাবলম্বনের পথ ও লক্ষ্য। শিক্ষাকে এই পথ ধরাতে পারলেই ভগবান্ আমাদের মাঝে জেগে উঠবেন—তাঁর লীলার সঙ্গে আমাদের সার্থক পরিচয় ঘটবে।

শিক্ষা

চতুর্থ পর্ব্ব—প্রয়োগ

শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্য

শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে চাণক্য পণ্ডিত উপদেশ দিয়েছেন—"লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি—দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।" বাঙালীর ঘরে এ নীতির অমর্য্যাদা আমরা বড় কোথাও করি না। প্রথম পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত অত্যধিক লালন আর তার পর দশ কিম্বা ততোধিক বৎসর পর্য্যন্ত প্রচণ্ডবেগে তাড়ন—এই উভয় সঙ্কটের মাঝে পড়ে আমাদের ছেলেরা দস্তুরমত মানুষ না হয়ে একটা অনিয়ম আর অসামঞ্জস্যের বোঝা হয়ে পড়ে। চাণক্যনীতির দোষটা এই যে, এর কোথাও মানব-শিশুর প্রকৃত মর্য্যাদা স্বীকার করা হয়নি। শিক্ষার আরম্ভ যে একেবারে শিশুর গর্ভচ্যুতির পর থেকেই, বেশী মাত্রায় লালনের প্রতি মনোযোগ দিলে সে কথাটা ভুলে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা। আবার তেমনি জন্মমাত্রেই যে মানুষ কেবল কতগুলি অপরাধের পুঁটুলী হয়ে জন্মায় না—তাড়ন-শাস্ত্রকারেরা বোধ হয় সে কথাটাও খেয়ালে আনেন না। আসল কথা, মানুষের সন্তানকে ঠিক আমাদের ওজনে বিচার করলে চলে না। কেননা নানাকারণে আমাদের রুচি আর প্রবৃত্তি এমন বিকৃত হয়ে আর বাঁক ধরে রয়েছে যে, শিশুর উপর তার সমস্ত আইন-কানুন না-ও খাটতে পারে। তাই, যদি অন্ধ স্নেহ আর ক্ষমাহীন নির্ব্বিচার

ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে পর্য্যায়ক্রমে সন্তানকে লালন আর তাড়নই করি, তাতে আমাদের প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ঘটতে পারে, কিন্তু সন্তানের শিক্ষার ফল কি দাঁড়াবে—সেটা ভাবাবার বিষয়।

প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে, যে বস্তুটীর উপর আমরা শিক্ষাশাস্ত্রের আইন-কানুন প্রয়োগ করছি, কাদার তালের সঙ্গে তার উপমা চললেও বাস্তবিকই সে তো আর কাদার তাল নয়—সে একটা আস্ত মানুষ। তারও মন আছে, হৃদয় আছে, যুগযুগান্তর-সঞ্চিত মানবজাতির সাধারণ অভিজ্ঞতার পুঁজি আছে, পূর্ব্বপুরুষের মনোবৃত্তির প্রভাব আছে। এতগুলির উপরেও আবার তার মাঝে আছে তার বিরাট্ সম্ভাব্যতা; ব্রহ্মবীজ তার মাঝে নিহিত রয়েছে—আমাদের শ্রদ্ধায়, আমাদের সন্তর্পণ সেবায় ও ভালবাসার স্পর্শে সে বীজ একদিন অঙ্কুরিত হয়ে মহান্ বনস্পতির আকার ধারণ করতে পারে। আমাদের দেশের সামাজিক শিক্ষাবিজ্ঞানকে এই কথাটাই আগে স্বীকার করতে হবে যে, মানুষের স্বাভাবিক গতি ঊর্দ্ধমুখীই—সে যদি নেমে আসে, তাহলে তার জন্য তার স্বভাব তত দায়ী নয়, যত আমাদের সমাজ ও শিক্ষা দায়ী।

এই কথা স্বীকার করলে শিক্ষার মূল ধারাটাই পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। তখন দেখা যায়, শিক্ষকের কর্ত্তব্য কেবল গড়ে-পিটে তাড়া দিয়ে বদ্-ছেলেকে সায়েস্তা করা নয়; যে ভাল হবার জন্য স্বভাবতঃই উন্মুখ হয়ে রয়েছে, তার চারদিক এমন করে উন্মুক্ত করে দেওয়া, যাতে সহজে প্রকৃতির নিয়মেই সে ভাল হয়ে উঠ্‌তে পারে। অর্থাৎ মানব-প্রকৃতির মহত্ত্বকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যনীতির প্রবর্ত্তন করাই তখন শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

যেমন বীজের অঙ্কুরিত হবার শক্তির উপর বিশ্বাস রেখে আমরা কেবল জমি তৈরীর দিকেই বিশেষ মন দিই, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি

সন্তানের মনুষ্যত্বের উপর শ্রদ্ধা রেখে পারিপার্শ্বিককে সব রকমে তার বিকাশের অনুকূল করে গড়ে তুলবার চেষ্টাই করতে হবে। ভাল মন্দ দুই-ই যে আছে, তা স্বীকার করি। কিন্তু তবুও মানুষ যে কত যুগ যুগ বিবর্ত্তনের পর কত মন্দকে ডিঙিয়ে আজ মানুষ হবার অধিকার পেয়েছে, এই কথাটা স্মরণ করে তার ভাল হবার অন্তর্নিহিত প্রেরণাকে তো কিছুতেই অশ্রদ্ধা করতে পারি না। কৃত্রিম সামাজিক সংস্কার যার হৃদয়কে স্পর্শ করেনি, এমন শিশুর মাঝেই আমরা দেখি, ভাল হবার সম্ভাব্যতা তার কত বেশী—ভাল আর মন্দের দ্বন্দ্বে সে কত সহজে মন্দের উপর জয়লাভ করছে। যে মন্দটুকুর বীজ নিয়ে শিশু জগতে আসে, আমাদের কুশিক্ষার গুণে তার চেয়েও ঢের মন্দ সে এখানেই সংগ্রহ করে, আমাদের অসাবধানতা আর অবিচারে আমাদের কৃত-কর্ম্মের বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমরাই আবার তার দণ্ড বিধান করতে যাই। ছেলে আসলে তত মন্দ নয়, যত মন্দ আমরা তাকে করে তুলি।

এই মন্দের ভাগটা যাতে কমই থাকে, কৃত্রিম উপায়ে তাকে আর যাতে বাড়তে না দেওয়া হয়, তার দিকে দৃষ্টি রেখেই শিক্ষার অনুকূল পারিপার্শ্বিক গড়ে তুলতে হবে। এই আনুকূল্যই হল শিক্ষানীতির মূলমন্ত্র ; যে শাসন বা সংরক্ষণ করতে হবে—তা অনুকূল হয়েই করতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে মহত্ত্ব চাই, ঔদার্য্য চাই, স্বাতন্ত্র্যের অধিকার দেওয়া চাই। যদি আবহাওয়া বিশুদ্ধ রাখতে পারি, অথচ সন্তানকে অসঙ্কোচে সব দিকে চল্‌তে ফিরতে স্বাতন্ত্র্য দিতে পারি—তবে যা তার মন্দের পুঁজি, তা দুদিনেই উজাড় হয়ে যাবে, কেননা তার মাঝে ভালর জোরটাই যে বেশী। সমস্ত শরীরের চেষ্টা যেমন নিজকে সুস্থ রাখা, তেমনি শিশুরও অন্তর্নিহিত সমস্ত প্রাণশক্তি তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক

স্বাস্থ্যই অটুট রাখবার চেষ্টা করছে। আমাদের এ ক্ষেত্রে কেবল দু' জায়গায় সাবধান হতে হবে। প্রথমতঃ দেখ্তে হবে, নূতন করে যেন আর মন্দটা সন্তানের মাঝে সংক্রামিত না করি; দ্বিতীয়তঃ, যেটুকু মন্দ রয়েছে, আশঙ্কায়, অবিচারে বা অধৈর্য্যে তার উপর উগ্র হয়ে উঠে যেন তার বেগ বাড়িয়ে না তুলি। কিন্তু সবার উপর চাই চারদিকের উদার উন্মুক্ত আবহাওয়া।

মন্দের কথায় এখানে বংশানুক্রমের প্রসঙ্গ আস্তে পারে। মন্দটাই যার বংশে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে, এমন ছেলের বেলাতেও কি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে দেওয়ায় মন্দটাই প্রশ্রয় পেয়ে বেড়ে উঠ্বে না? স্বাতন্ত্র্যনীতির পরিবর্ত্তে তার বেলাতে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করাই কি শ্রেয় হবে না? এ প্রশ্নের মীমাংসা করবার পূর্ব্বে মন্দের স্বরূপ কি, তা বুঝে নিতে হবে। অনেক অবস্থাতেই যে মন্দ অভ্যাসটাকে আমরা খুব জটিল আকারে দেখ্তে পাই, তার আসল প্রণোদক নিদানটা হয়ত তত মারাত্মক নয়—এমন কি খুঁজলে তার একটা biological basis আবিষ্কার করাও কঠিন নয়। এমনি একটা সহজ নিদানই অবস্থার বিপর্য্যয়ে পড়ে এমন জটিল আকার ধারণ করে যে, মূলতঃ প্রতীকার সহজসাধ্য হলেও এখন ডাল-পালার বহর দেখে আমরা আর তার দিকে স্বচ্ছন্দচিত্তে এগোতে পারি না। তবে এ হল পরিণত বয়সের কথা—প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে মন্দটা বেড়ে গিয়ে যখন হাতছাড়া হয়ে পড়েছে, তখনকার কথা। কিন্তু বংশধারার অনুবর্ত্তনে এই মন্দের বীজটা যদি সন্তানে সংক্রামিত হয়, তবে তা আদিম সংহত আকারেই প্রকাশ পাবে। এ অবস্থায় তাকে সন্তর্পণে চালিয়ে নেওয়া তত দুরূহ হবে না। স্বভাববৃত্তিগুলির মাঝে যদি তখন বাছাই করা

যায়, তবে দেখা যাবে, সমস্ত মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি যা, শিশু তা থেকে বঞ্চিত হয়নি। অর্থাৎ ভ্রূণের আকারে ভাল মন্দ দুই-ই তার মাঝে রয়েছে। পারিপার্শ্বিকের আনুকূল্যে এই ভালগুলিকে ফুটবার সুযোগ দিয়ে অথচ মন্দগুলিকে অনুকূল খাদ্যের অভাবে নির্জ্জীব করে ফেলা তখন সহজ হবে। যে মন্দ প্রবৃত্তিগুলি সুযোগ পেয়ে কালে নানা জটিল মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি করে, ছোট বেলা হতেই তাদের চিনে নিয়ে পারিপার্শ্বিকের সুব্যবস্থার ফলে তাদের কেবল মাত্র biological tendencyর কোঠায় আটকে রাখা নিশ্চয়ই আমাদের হাতে।

কিন্তু মন্দের প্রথম প্রকাশেই শঙ্কিত হয়ে আমরা যদি তাকে অস্বাভাবিক উপায়ে চাপা দেবার চেষ্টা করি অর্থাৎ কোন্ আদিম মনোবৃত্তির আশ্রয়ে কি করে এ বিকার ফুটে উঠ্‌ল তার কোন হিসাব না রেখে, শুধু ভবিষ্যতে এর ফল কি দাঁড়াবে, তাই কল্পনা করে কঠোর শাসনীতির প্রবর্ত্তন করি, তাহলে কিছুতেই ফল ভাল হবে না। অনেক সময় নিয়মিত জরভোগের পর আপনা হতেই যেমন জরের বিরাম হয়, তাকে চাপতে গেলেই তা যেমন মাথায় চড়ে বসে বিকার ঘটায়, এ সব প্রবৃত্তিও কতকটা তেমনি। ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে যোগ না ঘটিয়ে কোনও স্থায়ী মানসিক পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নয়। তাই কোন্ আদিম ইচ্ছার প্ররোচনায় প্রবৃত্তি জেগেছে, তা যদি আমরা ধরতে না পারি, তা হলে বাইরে থেকে বাধা দিয়ে ভিতরের ইচ্ছাটাকে আরও প্রবল করে তুলব মাত্র। বাধার সঙ্গে লড়াই করাটা একটা জীবধর্ম্ম বলে, বাধা পেলেই প্রবৃত্তি যেন আরও জোর ধরে ওঠে। কিন্তু ভিতরের সঙ্গে যোগ রেখে, তার পথে তাকে কতকটা চলতে দিয়ে যদি ধীরে ধীরে তার

মোড় ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে ঝঞ্ঝাটও কমে, কাজও পাকা হয়। তাড়ন নীতির যাঁরা পাণ্ডা, তাঁরা এ কথাটাও মনে রাখ্‌বেন যে, "সবুরে মেওয়া ফলে" প্রবাদটা একেবারে ফাঁকা নয়—বিশেষতঃ শিশুর মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটাবার বেলায়।

উপরে যাদের কথা বললাম, সেগুলো মৃদু রকমের প্রবৃত্তি—যে ভালমন্দের নমুনা আমরা সচরাচর ছেলেদের মাঝে দেখতে পাই। কিন্তু এ ছাড়া একরকম স্বাভাবিক অপরাধপ্রবণতাও আছে। সে ক্ষেত্রে সুযোগ পেলেই অপরাধ করবার ইচ্ছা শিশু কিছুতেই দমন করতে পারে না। একজন ইংরেজ চিকিৎসক এর একটা সাংঘাতিক রকমের উদাহরণ দিয়েছেন। সে একটা দশ বার বছরের ছেলে। তার আর কোন দোষ নাই, কিন্তু ছোট থেকেই সে সমানবয়সী ছোট ছেলে দেখলেই ভুলিয়ে নির্জ্জন জায়গায় নিয়ে যেত। সেখানে তার সঙ্গে প্রথমে নানারকমে ভাব করে, তার পর তাকে ধরে আচ্ছা করে চাবুক লাগত এবং অবশেষে তার গলা টিপে ধরত। এমনি করে সে অনেক ছোট ছেলেকে মেরে ফেলেছিল। আর সব বিষয়েই সে ভাল কিন্তু তার এই সমবয়স্ক ছেলেদের হত্যা কর্‌বার প্রবৃত্তিকে কিছুতেই সে দমন কর্‌তে পার্‌ত না—কি করে যে তার মাঝে এ প্রবৃত্তি জাগ্‌ত, তাও সে কিছু বল্‌তে পার্‌ত না। অবশ্য এ দৃষ্টান্তটা চরম, কিন্তু খুঁজলে আমাদের চারিদিকেই স্বাভাবিক অপরাধপ্রবণতার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এগুলোকে বাগ মানানো যে শক্ত, তা বলাই বাহুল্য; কিন্তু তবু পারিপার্শ্বিকের প্রভাব যে এর উপরে খাটে, তা স্বীকার করতেই হবে। তাই অপরাধের অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোনও ব্যতিক্রম না করে, কেবল অপরাধের দণ্ড দিলেই এর কোনও প্রতীকার হবে না—অপরাধের

যাতে সুযোগ না ঘটে, তারই চেষ্টা করতে হবে। তা ছাড়া স্বাভাবিক অপরাধপ্রবণতা অনেক ক্ষেত্রেই স্নায়ুঘটিত বিকার মাত্র। এ বিকার স্নায়ুজালের সঙ্গে এমনি গভীরভাবে জড়িত যে, অপরাধের প্ররোচনা অপরাধীর অবচেতনার ভিতর থেকেই আসে, সুতরাং সাক্ষাৎভাবে তার ইচ্ছাকে সে কোনও রকমে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। এই জন্তই অপরাধের আকারপ্রকারও প্রায়ই একই রকমের হয়। এই সূত্রটুকু ধরে যদি আমরা এর চিকিৎসা আরম্ভ করি, তবে যে কিছুই ফল হবে না—তা বলা চলে না। তবে উৎপীড়ন দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে বিশেষ কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না। এর আর এক প্রতীকার হচ্ছে—যে অবচেতনা থেকে প্রবৃত্তির প্রেরণা আসে, তার ওপর শক্তি প্রয়োগ করা। এটা কতকটা সম্মোহনের সামিল।

সমাজধর্ম্মের অবান্তর প্রভাব মানব-সন্তানের ওপর ক্রিয়া করলেও সে যে জন্মের সঙ্গেই সমস্ত আদিম প্রাকৃত সংস্কার বর্জ্জন করে পুরামাত্রায় সামাজিক হয়ে জন্মায়, এ কথাটা সব জায়গায় খাটে না। তাই এই আদিম সংস্কারগুলির সঙ্গে বোঝা-পড়া করাও শিক্ষার একটা অঙ্গ। সাধারণ ছেলের যে দোষের প্রতি প্রবণতা দেখা যায়, তা প্রায়শঃই এই আদিম প্রাকৃত সংস্কার। যেমন ধরা যাক্ দেহের সঙ্গে নিজকে জড়িয়ে নিয়ে তার প্রতি মমতাশালী হওয়া, এটা আদিম সংস্কার। সামাজিক পরিণত মানুষ দেহের দুঃখকষ্টকে একটা কোনও বিশিষ্ট ভাবগত আদর্শের কাছে হয়ত সহজেই বলি দেবে, কিন্তু শিশু তা পারবে না। তাই দেখি, দেহের উপর পীড়নের ভয়ে সে যেমন অন্তায় থেকে নিবৃত্ত থাকে, তেমনি আবার সেই পীড়নকে এড়াবার জন্ত অন্তায় গোপন করে মিথ্যাচরণ করতেও

শিখে। এখানে কাপুরুষতা বা মিথ্যাচার গৌণ—মূল এই দেহের প্রতি মমতা। ক্ষমার মাহাত্ম্য শিশুকে বুঝান দায়—সে জানে আঘাতের বদলে আঘাত করতেই হয়। বিরক্তির কারণ ঘটলে তখনি সেটাকে প্রকাশ করে ফেলা—কোনও রকম সৌজন্যের আবরু না রেখে—এও তার পক্ষে স্বাভাবিক। এগুলিই হচ্ছে আদিম জীবধর্ম্মানুকূল প্রবৃত্তি। প্রায় সবখানেই এগুলি অল্প বিস্তর দেখা দেবে। শিক্ষার বেলায় এগুলোর সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে হবে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এই সমস্ত ত্রুটির সঙ্গে আমরা কি রকম বোঝাপড়া করব। সাধারণতঃ দেখতে পাই, "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি"র উপরেই আমাদের আস্থা বেশী। প্রথমতঃ এইটা ছাড়তে হবে। হুঁসিয়ার হয়ে দণ্ড দেবার প্রয়োজন যদি কখনও হয়, তা এই ছেলেবেলায়। কোথায় থেকে কোন প্রবৃত্তি কি করে জাগছে, কি করে তাকে বাধা দিলে সে বাধা ঠিক জাঁতে গিয়ে কাজ করবে—এ সব খুবই তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। এই সময়টায় অবিচারের দরুণ কত তরুণ মনোবৃত্তি যে আমরা দুমড়ে-মুচড়ে একেবারে অস্বাভাবিক করে তুলি, বদখেয়ালে একটা অপরাধের অবিচার করে আর কতগুলো অপরাধের সম্ভাবনা যে জুটিয়ে আনি—তা ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে। শিশুর মনোযন্ত্রের কাছে আচার্য্য বসুর সূক্ষ্মতম যন্ত্রের সৌকুমার্য্যও হার মানে। ঠিক তার উপযুক্ত পরিচালনা আমরা কখনও করতে পারব কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও, বিষয়টা যে কত গুরুতর আর কত সূক্ষ্মদৃষ্টিসাপেক্ষ, তা স্মরণ করে আমাদের বিচারবুদ্ধি ও সতর্কতাকে অতিমাত্রায় সচেতন করে রাখা উচিত। কিন্তু আমরা হয়ত মনে করি, একটা রাজ্য পালন করা কত কঠিন আর একটা ছেলে পালন তার তুলনায় কত সহজ।

আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে, পারিপার্শ্বিকের প্রতি। প্রকৃতির একটা আইন আছে, সে আইনকে অব্যাহতভাবে ক্রিয়া করতে দিতে হবে—নিজেরা কেবল গাধা পিটে ঘোড়া করবার জন্য তাড়াহুড়া করলে চলবে না। ১প্রাকৃতিক বিধানের যে কল্যাণময় ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন একটা সার্থকতা আছে, এইটী ভাল করে বুঝে নিতে হবে। কল চালাবার কলাবিৎ যিনি, তিনিই কল চালিয়ে দিয়েছেন—জীবনের শিল্পী তিনিই, আমরা শুধু মুটেমজুর মাত্র, আবর্জনা দূর করা আর সময়মত কারিগরের হাতে মাল-মসলা জুটিয়ে দেওয়া, এই হল আমাদের কাজ।

এতে কেউ মনে করবেন না যে জীবনে ভালমন্দের দ্বন্দ্বটা আমরা অস্বীকার করছি। প্রকৃতির আইনে দ্বন্দ্ব আসবেই—আর আলোক ও আঁধারের দ্বন্দ্বে আলোকই জয় লাভ করবে—এই হচ্ছে শাশ্বত সত্য বিধান। কিন্তু আমাদের নাকি এতটা তর সয় না, তাই তাড়াতাড়িতে সবটাই আমরা নষ্ট করে ফেলি। যা অসুন্দর, যা অশিব, যা অসত্য—তা হতে যদি পারিপার্শ্বিককে মুক্ত রাখতে পারি, তাহলে যে মন্দের বীজ সন্তানের মাঝে আছে—হোক্ তা আদিম প্রাকৃত সংস্কার বা বংশগত সংস্কার—একদিন তার অঙ্কুর উৎপাদনের শক্তি নষ্ট হবেই; আর সে নষ্ট একেবারে চরম নষ্ট। তার জন্য যতটা দেরী হবে বলে আমরা ভয় করি, ধৈর্য্য ধরে আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করে গেলে দেখব, অসত্যের পরাজয়ে ততটা দেরীও হয়নি। এ সত্য এত সহজ যে, আমাদের বাঁকা দৃষ্টিতে তা সহজে ধরা পড়বার নয়।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বৃত্তিরই পরিপুষ্টি ঘটে থাকে। যদি সন্তানের মাঝে এমন কোন মন্দের বীজ থাকে, আদিম সুসংযত আকারেও শিক্ষাব্যবস্থার গুণে যাকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি, তবে

বয়োবৃদ্ধির সময় বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মন্দটাও ঘোরালো হয়ে দেখা দেবে, কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষার গুণও তার উপর ক্রিয়া করবে এবং তার ফলে ভাল আর মন্দের দ্বন্দ্বটা আরও তীব্র হয়ে উঠ্‌বে—বাইর থেকে কেউ বুঝতে পারবে না, ভিতরে ভিতরে কি প্রচণ্ড অগ্নিক্রীড়াই চলছে। এই অন্তর-দহনই মানুষকে পুড়িয়ে খাঁটি সোণা করে দেয়। অন্তরের এই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্তির সঙ্গে বিবেকের যে লড়াই চল্‌তে থাকে, তাতে প্রবৃত্তির দংশনজ্বালা তীব্র হলেও, মানুষ বুঝতে পারে, একটু একটু করে সে সত্যের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে, আর তাই ভেবে সহস্র গ্লানির মাঝেও সে প্রচুর স্বস্তি ও আনন্দ পায়।

সুযোগ পেলেই যে উচ্ছৃঙ্খলতা বাইরে আত্মপ্রকাশ কর্‌ত, তাকে এমনি অন্তরের সীমার মাঝে আট্‌কে রাখা যায় কেবলি বিচার-বুদ্ধি-পরিচালিত সুশিক্ষার গুণে। প্রত্যেকের জীবনের দ্বন্দ্বের মীমাংসা তার নিজেকেই কর্‌তে হবে, মহৎ ভাব আর মহৎ আকাঙ্ক্ষা অলক্ষ্যে তার মাঝে সঞ্চারিত করে দিয়ে—এইখানেই হল শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য। যার ভিতরে গলদ, সে যদি নিজে তার শোধনের ভার না নেয়, তাহলে বাইরে থেকে আমরা যতই চেঁচামিচি করি না কেন, বিশেষ কিছু ফল তাতে হবে না; ছেলে যদি ছোট হয়, তাহলে আমাদের চেঁচামিচিতে সে কেবল থম্‌কে যাবে; এবং যথারীতি শাসনের পর আমরা যে মুহূর্ত্তে থামব, তার পরের মুহূর্ত্তেই ভিতরের প্রবৃত্তিতে সে আবার যন্ত্রবৎ সেই গলদের কাজটাই করে ফেলবে। আর ছেলে যদি বড় হয়, তবে তর্জ্জন আর গর্জ্জনে তার মাঝে জাগবে শুধু ক্ষুব্ধ আত্মাভিমান—নিজকে হেঁট করতে হবে ভেবেই সে আরো কোমর বেঁধে অন্ততঃ নিজের কাছেই নিজের পক্ষে ওকালতী জুড়ে দেবে। শাসনে যে ছেলে অনেক সময় বাগ মানে না, তার কারণ

হচ্ছে, কোনদিকে যে আমরা ছেলের অন্তর স্পর্শ করতে পারব, তা না ভেবে কেবলি আন্দাজের উপর ঢেলা মেরে থাকি। মানুষ তো আর জড়পিণ্ড নয়; কাজেই শিক্ষার একটা কল বানিয়ে নির্দ্দিষ্ট একটা সময়ের মাঝে একই প্যাটার্ণের কতকগুলি মাল বের করে দেওয়া কোথাও সম্ভবপর নয়। তাই শিক্ষাপ্রণালী যতই সূক্ষ্ম হোক্ না কেন, সব দিক দিয়ে একটা আদত মানুষ তা থেকে গড়ে তোলার ভরসা বৃথা। জগতে যত কাজ চল্‌ছে, সমস্তই একটা রফার উপর নির্ভর করে। বাইরে তুমিও সুজন, আমিও সুজন, তাই দুজনে বেশ বনিবনাও হয়ে গেল, আর যে কাজটায় আমরা হাত দিলাম, হুহু করে তা হয়ে গেল। কিন্তু ভিতরে যে কার কি আছে, তা কে বলতে পারে? আমার ভিতরও তুমি জান না, তোমার ভিতরও আমি জানি না—পরস্পর পরস্পরের কাছে আমরা সামলে রয়েছি, তাই আমাদের সমাজ চল্‌ছে। এই সাম্‌লে থাকাটুকুই শিক্ষার একটা মস্ত ফল। প্রবৃত্তির ধর্ম্মে যেটা বাইরে প্রকাশ পেত, দশের ধর্ম্মে দেশের ধর্ম্মে সেটাকে ভিতরে আট্‌কে রাখতে জানলেই মানুষ সামাজিক হয়। যার যার অন্তরের বিষে সে নিজেই জ্বলুক, অপরের প্রাণে সে জ্বালা ছড়িয়ে দেবে কেন—এই হল মানুষের সামাজিক বুদ্ধির নিদান। শিক্ষায় যদি মানুষের বাইরে এমনি একটা সামঞ্জস্য আন্‌তে পারে, তার মাঝে যথার্থ সামাজিকতা জাগিয়ে তুলতে পারে, তবেই শিক্ষার বহিরঙ্গ সার্থক হয়েছে বলা চলে। শিক্ষায় সাম্য ঘটাতে পারে এইখানেই—এইখানেই তার কাজের একটা হিসাব পাওয়া যায়। নইলে অন্তরের হিসাব কেবল অন্তর্য্যামীই জানেন।

কিন্তু অন্তরঙ্গ শিক্ষাকে তো আমরা ছোট বলে মনে করতে পারি না। বরং শিক্ষার বীজ অন্তরে উপ্ত হলেই বাইরে তার

ফুল পাতা ছড়িয়ে পড়বে—এইটাই আমরা বিশ্বাস করি। এই জন্যই যতটুকু শাসন, সংরক্ষণ ও সংস্কার করতে হবে, সে ভিতরের দিক থেকেই করতে হবে—বাইরের আয়োজন উপকরণগুলি এমনি গুছিয়ে নিতে হবে যে অন্তরের সঙ্গে তার কোথাও বিরোধ জন্মে স্বভাবের বিকৃতি না ঘটায়। যদি ভিতরের দিক থেকে কাজ করতে পারি, তবেই দেখব, বাইরে ক্রমে সাম্য দেখা দিচ্ছে। নইলে টেনে বুনে বাইরটাকে যেমন-তেমন করে দাঁড় করালেই তো সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হবে না।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, শিক্ষার দুটা দিক—একটা অন্তরঙ্গ আর একটা বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ শিক্ষায় আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব জাগবে আর তারই বহিরঙ্গ অভিব্যক্তিতে সামাজিক সাম্য ও সৌজন্য আসবে। এই দুটা দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের শক্তি প্রয়োগ করতে হবে; কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করছি, এই অভিমানে প্রকৃতির উপর কারসাজি করলে চলবে না। প্রকৃতির মাঝেও কোথায় দ্বন্দ্ব আর কোথায় সাম্য, সেটুকু বুঝে নিয়ে, সেই প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গেই আমাদের চেষ্টার যোগ ঘটাতে হবে। আমাদের বর্ত্তমান সমাজে ঠিক এই যোগটা ফুটে ওঠে না, তাই তার মাঝে নানা অসামঞ্জস্য, নানা বিকৃতি। হাজার হাজার মানুষ নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে সব দিক দিয়ে যে কি করে সামঞ্জস্য হবে, সেটা প্রাণে খুব জোর না পেলে কেউ ঠাউরে উঠতে পারে না। কাজেই সংসারে অল্পবিস্তর গলদ থেকেই যাবে। তাই বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, আগাগোড়া দ্বন্দ্বটাই বুঝি সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু আসলে তো তা নয়। একটা ছোট্ট জীবনের মাঝে যে চেষ্টা, যে লক্ষ্য—একটা বৃহৎ সমাজের মাঝেও ঠিক সেই চেষ্টা, সেই লক্ষ্য—সে হচ্ছে

সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসানে কোনও একটা utopiaতে পৌঁছান—এখন সে utopia ব্যবহারিকই হোক্ আর আধ্যাত্মিকই হোক্।

বুঝতে হবে প্রকৃতিও এই utopiaকে লক্ষ্য করে করে চলছে। একে পায় না বলেই তার ব্যথা ও দ্বন্দ্ব, নইলে দ্বন্দ্ব তো ঠিক আত্মার বিশ্রামভূমি নয়। সমগ্র শিক্ষাবিজ্ঞানে আমাদের এই সত্যটাই বিশেষ করে আঁকড়ে ধরতে হবে। যাই করি না কেন, দ্বন্দ্বটা যেন কোথাও আমরা উগ্র করে না তুলি। শিক্ষয়িতার সঙ্গে শিক্ষার্থীর কোনও দ্বন্দ্ব নাই—আবার শিক্ষার্থীর সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের কোনও দ্বন্দ্ব নাই—সমস্তটা প্রতিষ্ঠান যেন একটা বিক্ষোভহীন, অনুগ্র অথচ অমিত-বীর্য্যশালী অধ্যাত্মশক্তির প্রেরণায় চলছে—এই ভাবই শিক্ষাক্ষেত্রে জাগ্রৎ করে তুলতে হবে। এই প্রাণময় অন্তর্গূঢ় শক্তি নিয়েই সন্তানের অন্তরে প্রবেশ করে ভাবের বিদ্যুৎস্পর্শে তার প্রাণপুরুষকে জাগিয়ে দিতে হবে। ঠিক স্পষ্ট করে সে বুঝবে না, কোন্ শক্তি তার ভিতরে জেগে উঠছে, অথচ অলক্ষ্যে একটা তীব্র দাহে তার সমস্ত কলুষ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে—তার হৃদয়ে বিপুল দ্বন্দ্ব শুধু তার মাঝেই অবরুদ্ধ থাকবে, বাইরে কেউ তা জানবে না। সে অন্তরের দ্বন্দ্বও তাকে সাম্যের পথেই শুধু এগিয়ে দেবে।

এ তো শুধু শিক্ষার সাধনা নয়—এ যে তপস্যা। তাই তপস্যার মতই বাইরটাকে সমস্ত দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ হতে নির্মুক্ত করে প্রশান্ত বীর্য্যে পরিপূর্ণ রাখতে হবে। মনের সঙ্গে মনের সংঘর্ষে যে আগুন জ্বলে উঠে, সে আগুনে শিক্ষাভূমির আবহাওয়া তপ্ত করে তুললে তো হবে না। কাজেই মানসিক বিক্ষোভ জমে যাতে দেহ-মনে কোথায়ও বেসুর বাজিয়ে না তোলে, সেই জন্যই পারিপার্শ্বিকের দিকে আমাদের কঠোর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বাইরের কোনও

বিচারশূন্য অতর্কিত আঘাত এসে যদি তরুণ তপস্বীর মনকে তার ঊর্দ্ধমুখী লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট করে, তবে সমস্ত প্রকৃতিই তার প্রতিকূল হয়ে উঠবে—তখন তার নিষ্ঠুর প্রতিঘাত সামলানো বড় সহজ হবে না।

কেউ হয়ত বলবেন—অমন মোলায়েম করে চারিদিক গড়ে তুললে সন্তান কি সৌখীন হয়ে উঠবে না?—সংসারের আঘাত না পেলে সে শক্ত হবে কিসে? আমরা বলি, ভালবাসা যদি একটা সত্যিকার শক্তি হয়, তাহলে এই কোমলতা হতেই তারা এমন একটা শান্ত কঠিন বীর্য্য লাভ করবে, যা নাকি ভবিষ্যতে সমস্ত বিপদের বিরুদ্ধে এদের জয়ী করে তুলবে। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগে সন্তান যদি মানুষ হয়ে ওঠে, তবে তারা কি শুধু কাব্যে গড়া রঙীন স্বপ্ন দেখেই মুগ্ধ হয়ে রইবে? মহৎ হৃদয়ের একটু উত্তাপও কি তাদের মাঝে সঞ্চারিত হবে না?

তা ছাড়া, সঞ্চয়ের একটা সময় আছে—সেটাই হচ্ছে Reynoldsর Age of Innocence; এই সরলতা আর শুচিতা কেবল সৌন্দর্য্যের বীর্য্যেই অব্যাহত থাকতে পারে। সুন্দর এই শৈশব—আনন্দ আর সৌন্দর্য্যের অমৃতধারা পান করেই এর পুষ্টি হবে। তার পর যখন যৌবনের ডাক পড়বে, তখন আপনিই তার ভাববিভোর ঢলঢল চক্ষু হতে জ্বালাময় অগ্নিবীর্য্য সন্দীপিত হয়ে উঠবে। যে যত শান্ত, যত সুন্দর, যত মধুর—তারই শাসন তত অলঙ্ঘ্য;—এ প্রকৃতির আইন।

যদি সকল আঘাত হতে বাঁচিয়ে সন্তানের হৃদয়কে আমরা শিরীষ ফুলের মত সুকুমার রাখতে পারি, অথচ সত্য বীর্য্যে, ন্যায়ের দীপ্তিতে তাকে উজ্জ্বল করতে পারি, তা হলে শিক্ষার শেষে

সংসার-কর্ত্তব্য পালন করবার সময় যখন আসবে, তখন সংসারের অন্যায় আর অধর্ম্ম কি তাদের শুভ্র সুকুমার প্রেমময় চিত্তে আরো বেশী করে বাজবে না—তাকে প্রত্যাহত করবার জন্য প্রাণ দেওয়াও কি তাদের কমনীয় চিত্তের পক্ষে সহজ হবে না ?

শিক্ষার বহিরঙ্গ

শিক্ষার সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম যে, শিক্ষায় বাস্তবিক কোন সুফল ফলাতে হলে আমাদের কেবল কর্ত্তৃত্বাভিমান নিয়ে তাড়া-হুড়া করা চলবে না—যা বাধা, তাকে মাত্র দূরে সরিয়ে দিয়ে, যা স্বভাব, তাকে ফুলের মত অনায়াসে ফুটতে দিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই হল স্বাতন্ত্র্য নীতি। কিন্তু এ হল শিক্ষার অন্তরঙ্গ দিক। এর একটা বহিরঙ্গ দিকও আছে, সেইটা নিয়েই আমরা একটু আলোচনা করতে চাই। তার পূর্ব্বে শিক্ষার লক্ষ্যটা কি, তাই আবার আমাদের স্মরণ করে নিতে হবে।

কোনও পুঁথির বুলি শিখা, শিল্প শিখা বা সামাজিক ও নৈতিক গুণ অর্জ্জন করাই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য নয়। এ জগতে মানুষের জীবন নানা কোঠায় ভাগ হয়ে পড়েছে; তার যে কোনও একটা কোঠার উপযুক্ত করে কাউকে গড়ে তুললেই তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। এখানে পথের বিভিন্নতা থাকলেও সমস্ত পথ যে কেন্দ্রবিন্দুতে এক হয়েছে, সেইখান থেকে সূত্র ধরে এই জগতের দিকে আমাদের নেমে আসতে হবে এবং সেই মূল একের সঙ্গে যোগ রেখেই শিক্ষার অভিব্যক্তি ঘটাতে হবে—এই হল শিক্ষার লক্ষ্য। আমরা কাউকে শিল্পী করব

বা পণ্ডিত করব বা দেশভক্ত করব বা কাজের লোক করব—শিক্ষার ক্ষেত্রে এগুলো হল অবান্তর কথা। ওগুলো হবার যোগ্যতা সকলের মাঝে একরকম থাকে না, সুতরাং এদের ধরে কখনও শিক্ষার সমন্বয় আসতে পারে না। কিন্তু সমস্ত জগৎ যে এক হতে অভিব্যক্ত হয়ে এসেছে এবং উর্দ্ধমুখী তপস্যায় আবার সেই একের পানেই ছুটে চলছে, এই কথাটিকে সমগ্র মানবজীবনের তাৎপর্য্য রূপে গ্রহণ ক'রে শিক্ষার লক্ষ্যকে তারই সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

মানুষ তার হারামণি আবার ফিরে পেতে চায়—তার অন্তর্য্যামী তার বুদ্ধিকে অহরহঃ সেই পথেই প্রচোদিত করছেন। কিন্তু ফিরে যাবার পথ তো তার একটা নয়। তাই তার জীবনে পথের বৈচিত্র্য থাকবেই। কিন্তু এই বিচিত্র পথ ধরেও সে যে এক লক্ষ্যেই পৌঁছাবার চেষ্টা করছে, তাকে পরিচালনা করবার সময় এই কথাটাই স্মরণ রাখতে হবে। মানুষের সাধনা যে কেবল শিল্পের সাধনা, বিদ্যার সাধনা বা কর্ম্মের সাধনা নয়—এই সমস্ত অবান্তর বিষয়ের ভিতর দিয়ে সে যে ব্রহ্মত্বেরই সাধনা করছে—এই কথাটা স্মরণ রেখে তার শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য সেই একের প্রতি—পথ তার যত বিচিত্র হোক্ না কেন। দেশব্যাপী সমগ্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানুষের ব্রহ্মত্ব উদ্বোধনের লক্ষ্য জাগ্রৎ হয়ে উঠুক। তাহলে আর স্থূল শিক্ষার যে বৈচিত্র্য, তা হতে মানুষে-মানুষে কোনও বিরোধের সম্ভাবনা থাকবে না—অথচ বৈচিত্র্যের মাধুর্য্যও অব্যাহত থাকবে।

এই অন্তরঙ্গ একের সাধনাকে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিস্ফুট করতে হলে অন্তরের শিক্ষার প্রতিই আমাদের জোর বেশী দিতে হয়। কিন্তু শিক্ষার বেলায় অন্তরের কথাটাই আমরা ভুলে যাই। আমরা

লেখা-পড়া শিখাই, শিল্প-কলা শিখাই, বাণিজ্যনীতি, রাষ্ট্রনীতি আরও কত কি শিখাই—কিন্তু অন্তরে যে অহল্যা পাষাণ হয়ে রয়েছে, সত্যের শ্যামলস্নিগ্ধ স্পর্শে তাকে জাগাবার কোনও উপায়ই তো করি না। অপরাবিদ্যার জৌলুষে সভ্যতার চাকচিক্য যতই বাড়ুক না কেন, তার পরিণামকে কখনও শ্রেয়ঃ বলে গ্রহণ করতে পারব না—কেননা মানুষের বিবর্ত্তন যে মোটেই এই অপরাবিদ্যার সূত্র ধরে হচ্ছে না। অপরাবিদ্যার যতটুকু ব্যবহারিক প্রয়োজন আছে, ততটুকুকে স্বীকার করে নিয়ে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরাবিদ্যাকেই শ্রেষ্ঠ আসন ছেড়ে দিতে পারবে, আমরা তাকেই সার্থক বলে মানব। তার আয়োজন ক্ষুদ্র হলেও পুঞ্জীকৃত অন্ধকারের মাঝে একটী দীপশিখার মত সত্যের মহিমায় একমাত্র সেই উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। জগতের পটোয়ারি বুদ্ধি আজ তাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু অন্তর্য্যামীর অলঙ্ঘ্য নির্দ্দেশে একদিন এই সত্যের সম্মুখেই জগৎকে অশ্রুসজল হয়ে এসে দাঁড়াতে হবে।

অন্তরকে জাগাতে হলে অন্তরের নিগূঢ় আয়োজনই সবচেয়ে প্রয়োজন, একথা আমরা বলেছি। এখন অন্তরের এই আয়োজন কি করে বাইরেও অভিব্যক্ত হবে, আমরা সে প্রসঙ্গ তুলতে চাই। একেই আমরা বলি শিক্ষার বহিরঙ্গ। কিন্তু এ-ও অন্তরেরই শিক্ষা। অন্তরকে ভাবানুরক্ত রেখে তার সঙ্গে ব্যবহারিক জগতের যে শিক্ষাই আমরা জুড়ে দিই না কেন, তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। কিন্তু এর দিকে নজর না দিয়ে ব্যবহারিক দিকটাকে বড় করে তুললেই গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা হবে। এই কথাটুকু স্মরণ রাখতে হবে।

খুব ছোট অবস্থা থেকেই ধরা যাক। এ অবস্থাতেও স্বাতন্ত্র্য দিতে হবে, কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য দেবেন আচার্য্য—তাঁর নিগূঢ় তপঃশক্তি ও মর্ম্মাবগাহী ভালবাসার উপর নির্ভর করে। সুতরাং তার ক্রিয়া অন্তরে অন্তরেই চল্‌বে। কিন্তু বাইরে এর সঙ্গে শৃঙ্খলার যোগ করে দিতে হবে। সন্তানের দিক থেকে, স্বাতন্ত্র্য উচ্ছৃঙ্খলতায় নয়—শৃঙ্খলার সংযমেই তা সার্থক হয়ে উঠে। এ কথাটা আমরা সব সময়ে তলিয়ে দেখি না। আমরা মনে করি উচ্ছৃঙ্খলতাই বুঝি শিশুর স্বভাব, তাই শাসন করে তাকে আমরা দমন রাখ্‌তে চাই। কিন্তু আসলে উচ্ছৃঙ্খলতা হচ্ছে স্বভাবের বিকৃতি—তার জন্য আমাদের অব্যবস্থাই ষোল আনা দায়ী। নইলে মানুষের জীবনে যে একটা ছন্দ, একটা সুর রয়েছে, তার সঙ্গে চল্‌তেই মানুষ সবচেয়ে বেশী আরাম পায়। যাঁরা অভিনিবেশসহকারে লক্ষ্য করবেন, তাঁরা দেখবেন, এই ছন্দঃপ্রিয়তা শিশুর মাঝে কেমন স্বাভাবিক হয়ে ফুটে উঠে। উচ্ছৃঙ্খলতায় তার অস্বস্তি বাড়ে বই কমে না। কিন্তু তার মন অতি মাত্রায় নমনীয় বলেই এই অস্বস্তিবোধ বেশীক্ষণ তাকে পীড়া দিতে পারে না—ক্রমে এটা সে হারিয়ে ফেলে। অবশ্য এ সমস্তই আমাদের ব্যবস্থার দোষে ঘটে থাকে। তারপর স্বভাবের বিকৃতি এসে যখন আমাদের আঘাত করে বসে, তখন আমরা হঠাৎ সচেতন হয়ে আইন কানুনের কড়া শাসনে সন্তানকে নিয়ন্ত্রিত করতে চাই। কিন্তু তত দিনে হয়ত সর্ব্বনাশের আনন্দ তাকে পেয়ে বসেছে,—শৃঙ্খলা রাখার চেয়ে শৃঙ্খলা ভাঙাই তখন হয়ত তার পছন্দ বেশী। আমরাও দু চারবার ঠেঙিয়ে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বলি—"না, আর ওকে পেরে ওঠা যাবে না"—এবং এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তার স্বভাবকেই দোষী সাব্যস্ত করে নিজকে খালাস মনে করি।

নিয়মানুবর্ত্তিতা মানুষের প্রকৃতির গভীরতর সত্য—এইটুকু ধরে বহিরঙ্গ শিক্ষার গোড়া পত্তন করতে হবে। যেখানে ব্যবস্থার দোষে প্রকৃতি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে, সেখানেও অন্য দোষের দিকে দৃষ্টি দিবার পূর্ব্বে নিয়মানুবর্ত্তিতার দিকে আগে নজর দিতে হবে। শুধু শাসন আর আদেশে এ কাজটী হবার নয়। এর জন্য সজীব আদর্শ চাই। অহরহঃ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা, পুনঃ পুনঃ সংশোধন দ্বারা কর্ম্মের সজীবতা দ্বারা শিশুর মনে এই ভাবটী জাগিয়ে দিতে হবে যে, তার চার দিকটাই এমনিতর সুরে বাঁধা যে, এর মাঝে তার ব্যবহারে কোথাও বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখা দিলে তা এমনি বেসুরো বেজে ওঠে যে সেটা তাকে আঘাত না করে ছাড়ে না। এমনি করে তার অন্তর্নিহিত ছন্দোজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যবোধ জেগে উঠবে—সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তার মনে জাগবে যে, সে একটা বৃহৎ সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত এবং তারই অঙ্গহিসাবে তার একটা গৌরব আছে, দায়িত্বও আছে।

এই অনুভূতি হতেই সংযমের সূচনা। অথচ এইটুকুই আমাদের বাঙ্গালী সমাজে ঘটিয়ে তোলা যে কত দুরূহ, তা আমরা সবাই জানি। সকাল হতে সন্ধ্যা আর সন্ধ্যা হতে সকাল পর্য্যন্ত আমরা কোনও নিয়মের অধীন নই। নিজের গড়া কোন নিয়ম মানি না বলেই পেটের দায়ে যখন পরের গড়া নিয়ম মেনে চলতে হয়, তখন এর দরুণই দাসত্বের বেদনা দ্বিগুণ তীব্র হয়ে দেখা দেয়। কেউ হয়ত মনে করতে পারেন, এমনি করে নিয়মের বাঁধাবাঁধির মাঝে চলতে গেলেই তো মানুষের জীবনে একটা কৃত্রিমতা এসে পড়বে, সে তখন কলের সামিল হয়ে পড়বে। এ আশঙ্কা মিথ্যা নয়। কিন্তু নিয়মেরও দুটা রূপ আছে। এক রূপে সে কেবল বাইরে থেকে বাঁধে—শুধু শাসনের জোরে। এমনি বাঁধনে নিয়মানুবর্ত্তিতা

স্বাতন্ত্র্যকে পঙ্গু করে অন্তরকে স্ফূর্তিহীন করে তোলে। কিন্তু এই নিয়মই যখন নিষ্ঠার আকার ধরে ভিতরের দিক থেকে মানুষকে বাঁধে, তখন মানুষ স্বেচ্ছায় আনন্দে সে বাঁধনে নিজকে সঁপে দেয়। এই নিষ্ঠার বন্ধনেই স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃত স্ফূর্তি হয়, জীবনে যে অন্তর্গূঢ় ছন্দ রয়েছে, তারই সাক্ষাৎ মিলে।

এই ছন্দ জাগাতে হলে শুধু নিয়ম কর্‌লেই চলবে না—একটা মানুষের সম্পূর্ণ হৃদয়কে সেই নিয়মের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। এইটুকুই বড় কঠিন সমস্যা। যাদের নিয়ে আমরা কাজ করছি, তাদের অপরিণত চিত্ত এখনও বৃহৎ একটা কিছুর ধারণা কর্‌তে শিখেনি অথচ এই বৃহতের অস্পষ্ট অনুভূতি তাদের মাঝে জাগিয়ে তুলতে হবে। তারা বুঝতে পারবে, নিয়ম ধরে যে তারা চল্‌ছে, শুধু এর মাঝেই তাদের চেষ্টা নিরুদ্ধ থাক্‌ছে না—এই নিয়ম দিয়ে আরও বড় কোনও একটা বস্তুকে যেন তারা স্পর্শ করতে চাইছে। শিশুর অবোলা মনে এই অনুভূতি জাগিয়ে তোলা সাধনাসাপেক্ষ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্তটা আবেষ্টন যদি একটা শুদ্ধ শান্ত হৃদয়ের তালে তালে স্পন্দিত হয়, একটা কল্যাণসম্পন্ন তীক্ষ্ণদৃষ্টি মমতা দিয়ে যদি কেউ তার সবটুকু আগ্‌লে রাখতে পারে, তবেই প্রাণের উত্তাপ এক প্রাণ হতে নিঃশব্দে অপর প্রাণে সঞ্চারিত হবে। যেমন নাড়ীর রসের সঙ্গে মায়ের হৃদয়ের সূক্ষ্মতম অনুভূতিগুলিও ভ্রূণের মাঝে সঞ্চারিত হয়, তেমনি সর্ব্বগ্রাসী ভালবাসা দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠানকে আচ্ছাদিত করতে পারলে অবোলা প্রাণেও ভাবের স্পন্দন জাগিয়ে তোলা যায়।

নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে অহরহঃ এমনি একটা জীবন্ত অনুভূতিকে জাগ্রৎ রাখ্‌তে হবে। এই অনুভূতি হতে সর্ব্বত্র আনন্দ উৎসারিত হয়ে

পড়বে, সেই আনন্দের সঙ্গেই কর্ম্মের চক্র আবর্ত্তিত হবে—তাহলেই আর নিয়মের মাঝে কোথাও বন্ধনের পীড়ন থাকবে না। নিয়মের লক্ষ্যই হচ্ছে বহিঃপ্রকৃতি হতে চিত্তকে ভারমুক্ত করে ক্রমশঃ অন্তরের দিকে তাকে প্রেরিত করা। বাইরের ভাবনা নিয়েই যদি আমাদের সব সময় ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয় তাহলে অন্তরের দিকে দৃষ্টি পড়ে না; আর অন্তরের উৎস যদি শুকিয়ে যায়, তবে বাইরের কাজেও আর রসের জোগান পাওয়া যায় না। সমগ্র মানব-জীবনের এইটা হল একটা ব্যাপক সত্য। এই সমস্যার যথাযথ মীমাংসা করবার জন্যও নিয়মানুবর্ত্তিতার শিক্ষা প্রয়োজন। কর্ম্মশক্তিকে এমনভাবে গঠিত করে তুলতে হবে যে, যখন যে অবস্থাতেই মানুষ পড়ুক না কেন, বাইরটাকে সামনে নিয়ে ভিতরটার জন্য সে যেন বেশী করে অবসর ও শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। এই অন্তর্মুখীনতা শিক্ষা দিবার জন্যই নিয়মের প্রবর্ত্তন—এই কথাটা মনে রেখে নিয়ম বাঁধলে তা হতে কোনও সঙ্কোচের আশঙ্কা থাকবে না। অন্তর্মুখীনতা উদ্দেশ্য, নিয়ম তার উপায়। যিনি নিয়ম করবেন, সন্তানের হৃদয়কে অন্তর্মুখীন করবার সঙ্কেতটাও তাঁকে শিখে নিতে হবে।

নিয়মের প্রবর্ত্তন যিনি করবেন, তাঁর দিক দিয়ে চাই ভাবের বিশুদ্ধি। নিয়ম যে মহৎ অন্তর্নিহিত সত্যের অভিব্যক্তি, সেই সত্যকে যদি তিনি কায়মনোবাক্যে বহন করে না চলতে পারেন, তবে নিয়মের মাঝে কিছুতেই শ্রদ্ধা থাকবে না, বীর্য্য থাকবে না—এমন নিয়ম করলেও আপনা থেকেই তা বারবার ভেঙ্গে পড়বে। নিয়মের সঙ্গে অন্তরের যোগ না থাকলেই সেটা জবরদস্তি হয়ে দাঁড়ায়। শিশুর চিত্ত বুদ্ধিবিকাশের দিক দিয়ে অপরিণত হলেও অন্তর দিয়ে অন্তর বুঝবার তার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। যদি নিয়মের মাঝে

কোথাও নিষ্ঠার বা ভাবের ব্যতিক্রম থাকে, তাহলে অমনি সেটা তার চিত্তে আঘাত কর্‌বে এবং তেমন কৃত্রিম নিয়মের বিরুদ্ধে তার মন আপনা হতেই বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌বে। নিয়মপ্রবর্ত্তন শুধু যারা নিয়ম পাল্‌বে তাদেরই পরীক্ষা নয়, যে নিয়ম কর্‌বে, তারও পরীক্ষা বটে।

সকলের পিছনে চাই একটা শুদ্ধ, শান্ত, মহৎ ভাবের আদর্শ। প্রকৃতির সঙ্গে লড়্‌তে হলে এই হল অভেদ্য বর্ম। যা কিছু আমরা গড়্‌তে যাই না কেন, নিরঙ্কুশে তা হবার নয়। শিক্ষাজীবনের ছন্দ জাগানোও সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু আমরা বাধাগুলিকে বাইরের দিক দিয়ে দেখ্‌ছি না—আমরা মনে কর্‌ছি, যত বাধাই উপস্থিত হোক না কেন, তার পনের আনাই বোধ হয় আমাদের অশুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি। যন্ত্রটা আমরা পেয়েছিলাম ভালই, কিন্তু ওস্তাদ নই বলে তাতে সুর তুল্‌তে পার্‌লাম না—তার ছিঁড়ে গেল। এমনি করে প্রত্যেক ত্রুটীর জন্য অপরের জবাবদিহী না চেয়ে নিজের কাছে যদি আগে জবাবদিহী চাই এবং নিজের দোষটুকু শুধ্‌রে নিতে পারি, তবে দেখ্‌ব যতগুলি বাধার আশঙ্কা করেছিলাম, ততগুলির সঙ্গে আমার লড়্‌তে হয়নি। তা ছাড়া নিজকে আত্মপ্রতিষ্ঠ রাখ্‌তে পার্‌লে প্রত্যেকটা বাধার যথার্থ মীমাংসা করা সম্ভব হবে; তখন আর আমরা অপ্রবুদ্ধ চিত্তে একটা বাধা ঠেকাতে গিয়ে আর দশটার পত্তন করে বস্‌ব না।

শাসনে দ্বিধা

"তদৈক্ষত—অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়"—এই ঈক্ষার পর সৃষ্টি হয়েছিল। মূলে যা ঘটেছিল, আজ পর্য্যন্ত তার পুনরাবৃত্তি চল্‌ছে। অর্থাৎ এখনও জগতে দেখছি, আগে ঈক্ষা, আলোচনা বা কল্পনা—তারপর সৃষ্টি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ঈক্ষার যে কত প্রয়োজন, তা বলে শেষ করা যায় না। এইখানেই তো আদত সৃষ্টি। দেহ হতে দেহ নয়—তার চেয়ে বড়—মন হতে মনের, হৃদয় হতে হৃদয়ের—প্রবুদ্ধ আত্মার স্পর্শে সুপ্ত আত্মার জাগরণ। এই সৃষ্টি সফল করতে হলে আদি পুরুষের অভিমান নিয়ে বলতেই হবে, "অহম্ ঈক্ষে—বহু স্যাং প্রজায়েয়।"

কিন্তু আমাদের মুখ থেকে কখনও এই ঈক্ষার ঘোষণা প্রচারিত হয় কি? শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা ঈক্ষাপূর্ব্বক কিছু সৃষ্টি করে থাকি কি? —উত্তরে বলব, প্রায়শঃই না। সংসারে আমাদের সর্ব্বদাই একটা ত্রস্ত ভাব; তাড়াহুড়া করে কোনও রকমে কাজ বাগিয়ে নিতে পারলেই আমরা বাঁচি। জীবনটা এত তাড়াতাড়ি ছুটে চলেছে যে, দু'দণ্ড এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে শুনে ঈক্ষাপূর্ব্বক একটা কিছু বলতে আমাদের সময়ে কুলাবে না। তাই পথে ছুটতে ছুটতে যতটুকু নজরে পড়েছে, ততটুকুর উপরেই ভিত্তিস্থাপন করে আমরা চলার মুখে একটা রায় দিয়ে যাচ্ছি। সংসারে আমাদের বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ বলে যদি সুনাম থাকে, তবে ভরসা আছে, ঐ চলার মুখের রায়টাই সবাই বেদবাক্য বলে মেনে নেবে।

শিক্ষার বেলায় এমন রায় আমরা অনেক বিষয়েই দিই। এর মাঝে গতানুগতিকের পথ ধরে চলার ঝোঁকটাই বেশী। বিচার দিয়ে, কল্পনা দিয়ে নূতন একটা কিছু উদ্ভাবন করবার দৃষ্টান্ত প্রায়শঃই চোখে পড়ে না। বাস্তবিক নিজের সম্বন্ধে যার যতটুকু অজ্ঞতা, অপরের হিতাহিত সম্বন্ধে কল্পনা ও বিচারের অপ্রাচুর্য্য তারই তত বেশী। আজ আমরা সমস্তটা জাতিই আত্মবিস্মৃতির তলে তলিয়ে আছি—আমাদের প্রাণ নাই, জাগৃতি নাই, আমরা সৃষ্টি করব কি? আমাদের আছে শুধু শঙ্কা; বুঝি আর নাই বুঝি, কোনও রকমে পুরাতনের ঠাটটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে পড়ে আছি—এখন তার মাঝে যতই অসঙ্গতি থাক না কেন। হতে পারে এতে আমাদের ভুলের সংখ্যা কমই হচ্ছে; কিন্তু যে বিচারশীল, যে জীবন্ত, তারই ভুল হয়, আবার সে-ই বিচার দিয়ে সে ভুলের সংশোধন করে নেবার সামর্থ্য রাখে। যে বিচারহীন জড়বৎ, তার আবার ভুল হবার আশঙ্কাই কোথায়? মোটকথা ভুল করে ক্ষতি সহ্য করবারও একটা তেজ থাকা চাই। আমাদের আজকাল সে সব নিভে গিয়ে একেবারে পরম সাম্য লাভ হয়ে গিয়েছে।

যাক সে কথা। বলছিলাম, শিক্ষার অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অবিবেচনা আছে। তার একটা বিষয় নিয়েই আমরা আলোচনা করব। শিক্ষার মাঝে শাসনের স্থান কোথায়, তাই দেখ্‌তে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের মাঝে সরাসরি দুটা মত প্রচলিত আছে বলা চলে। কেউ কেউ বলবেন, শিক্ষার ক্ষেত্র হতে শাসন ব্যাপারটা তুলে দেওয়াই উচিত। আবার কেউ বলবেন, শাসনই মূল—শাসন ছাড়া শিক্ষা অসম্ভব। দু'দলের কথাতেই সপক্ষে বিপক্ষে কিছু না কিছু বলবার আছে। উভয়েরই কথা নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করেই আমাদের একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

প্রথমতঃ যাঁরা শাসনের বিরোধী, তাঁদের কথাই বলি। এঁরা বিশ্বাস করেন, মানুষ আসলে মন্দ নয়, ভাল হবার বীজ তার মাঝে নিহিত রয়েছে, একদিন তা ফুটবেই। আজ যাকে আমরা মন্দ বলছি, তা মানুষের অপরিণত অবস্থা মাত্র। অবিকশিতকে বিকশিত করবার জন্য প্রকৃতির মাঝে একটা অবিশ্রাম চেষ্টা চলছে। এই চেষ্টার স্বরূপ সব সময় আমাদের প্রত্যক্ষ না হলেও এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোনও কারণ নাই। মানুষের সভ্যতার বিবর্ত্তনের ইতিহাসই এই প্রাকৃত চেষ্টার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিবেচনার একটা বিরোধ আছে। মানুষ আপন খুসীতে একটা কিছু করবার স্পর্দ্ধা রাখে বলেই অনেকে সময় অনধিকারচর্চ্চা করে বা তাড়াতাড়ি ফল পাবার লোভে প্রকৃতির কাজকে বাধা দিয়ে নিজেরই সর্ব্বনাশ ঘটিয়ে থাকে। শিক্ষার শাসন এই অসহিষ্ণুতারই পরিচয়। কর্ত্তৃত্বাভিমান নিয়ে মানুষ একটা কিছু করে তুলব বলে আস্ফালন করে বটে, কিন্তু কোন্ শক্তির পরিচালনায় যে তার কর্ত্তৃত্ব সফল হবে, তার কোনও খবরই সে রাখে না। ফলে শক্তির সঙ্গে শক্তির বিরোধ ঘটিয়ে সে কেবল মানবের ক্রমোন্নতির পথে কাঁটাই দেয়।

শাসনও যে শিক্ষার একটা অঙ্গ হতে পারে, তা আমরা একেবারে অস্বীকার করতে চাই না। যে নীতিশাস্ত্রকার বলছেন, "তাড়নে বহবো গুণাঃ" অতএব "তাড়য়েৎ, ন তু লালয়েৎ"—তিনি মানবচরিত্রের একটা দিক সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথার মাঝে যে কোনও সত্যই নাই, এমন কথা বলছি না—বরং ছেলেবেলায় বহুবার আমাদের পিঠের উপর দিয়ে তাঁর কথার সত্যতা প্রামাণিক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবুও তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে যা হচ্ছে,

তারই কথা বলে গিয়েছেন, কি হওয়া উচিত, তার কথা বলেননি। ওটা শুধু ইতিহাসের কথা—সৃষ্টির মন্ত্র নয়।

শাসনকেই যেখানে শিক্ষানীতির অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, সেখানে বিবেচনার অভাব যে ঘটবে, এ কথা বলাই বাহুল্য। আঘাত পেয়ে আঘাত ফিরিয়ে দেবার স্বভাবটা মানুষের মজ্জাগত—এর মাঝে আছে শুধু নিছক দেনা-পাওনার হিসাব। কিন্তু লাভক্ষতির বিচারের উপরে যে উঠে গিয়েছে, সে-ই যথার্থ নির্ব্বিকার থেকে ক্ষতিকে সহ্য করতে পারে, তার পূরণ করতে পারে—সে ক্ষমা করতেও জানে। আমরা যখন দণ্ডধর হই, তখন লাভক্ষতির হিসাব থেকে কতটা যে মুক্ত থাকি, তা পরিমাণ করে বলা শক্ত। অনেক জায়গাই হয়ত কোথায় কোন গুপ্ত স্বার্থে আঘাত পড়ছে—হোক্ না সে স্বার্থ মনোগত বা বস্তুগত—আর স্বার্থহানির উত্তাপে উত্তপ্ত হয়েই আমরা শাসনদণ্ডের পরিচালনা করতে গিয়েছি। এই হচ্ছে নির্ব্বিচার শাসনের অপকৃষ্টতম ফল। যে শিক্ষক অসহিষ্ণু হয়ে শাসন করে, সে শিক্ষকের মাঝে অধমাধম।

তারপর শাসনের পক্ষে একটা মস্ত বড় ওজর হচ্ছে, বিচার্য্য কর্ম্মের দৌর্নীতিকতা। কাজকে আমরা মোটামুটী দুটা ভাগ করে নিই—তার কতকগুলি সুনীতিদ্বারা প্রণোদিত, আর কতকগুলি দুর্নীতি দ্বারা প্রণোদিত। তাই শিক্ষাক্ষেত্রের বিচারালয়ে দণ্ড-পুরস্কারের ভাগটাও আমরা সোজাসুজি করে ফেলি। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাই যে কাজের মাঝে শুধু সুনীতি আর দুর্নীতির বিচার করলেই চলে না—এমন কতকগুলি কাজ আছে, যারা সুনীতি বা দুর্নীতি কোনটারই আমলে পড়ে না—তারা একেবারে নীতিশাস্ত্রের আইনের বাইরে—ইংরেজীতে যাকে বলে non-moral; এ কিন্তু immoral

থেকে পৃথক। মূল কথা—ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও নির্বাচনশক্তি না জন্মান পর্য্যন্ত কোন কাজকেই নীতির কোঠায় আনা যায় না। ভাল মন্দ দুটাই বেছে নেবার শক্তি যার জন্মায়নি, তার কাজকে আইনের গণ্ডীতে ফেলা চলে না। আগে কাজের বাছাই করতে শেখাও, কোনটা আদর্শ তা বুঝিয়ে দাও—তারপর আইন ভাঙলে সাজা দিও। কিন্তু ছেলেকে শাসন করবার সময় আমরা এত কথা ভেবে দেখি না। আমরা ছেলে আর বুড়োর বুদ্ধি এক তোলে ওজন করে বিচার করি। এটা কতদূর সঙ্গত, তা বিবেচ্য।

এই সম্পর্কে শাসননীতির আর একটা গলদের কথা মনে পড়ে। সে হচ্ছে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে organisationর অভাব। ভালমন্দের বিচার করে ভালটা গ্রহণ করতে শেখাতে হবে, এই হল আমাদের মৎলব। কিন্তু কি করে তা করা যায়? আমরা সাধারণতঃ বুঝি, তাড়নায় কাজটা সহজ হয়ে আসে, ছেলের পেছনে পেছনে ঘুরে সময়ের অপব্যবহার না করে বিজ্ঞ অভিভাবক সংসারের অন্যান্য হিতকর কাজে সে সময়টুকু ব্যয় করতে পারেন। অতএব বলতেই হবে "তাড়নে বহবো গুণাঃ।" কিন্তু এই নীতির পেছনে যে কতখানি ঈক্ষার অভাব রয়েছে, সেইটাই আমাদের ভেবে দেখবার বিষয়। এ ক্ষেত্রে শাসন মানে কি? অর্থাৎ যে কাজটা আমি সঙ্গে থাকলে তুমি করতে না বা করবে না, সেই কাজটাই যাতে ভবিষ্যতে না কর, তার জন্ত অগ্রিম কিছু দক্ষিণা দিয়ে রাখা। আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারব না—অতএব আমার এই লাঠিগাছটাকে আমার প্রতিনিধিস্থলে রেখে গেলাম। আমি যদি সঙ্গে থাকতাম, তবে হয়ত তোমার অন্যায়টা বুঝিয়ে দিয়ে তোমায় সাবধান বা প্রতিনিবৃত্ত করতে পারতাম, কিন্তু যেহেতু সে সুযোগ আমার নাই, কাজেই আমার

এই নির্ব্বাক প্রতিনিধির উপর তোমাকে বোঝার ভার দিয়ে গেলাম। এ ব্যবস্থাটা মন্দ কিসে? আমরা বলি, সত্যই তো—এতে সাপও মরল, লাঠিও ভাঙ্গল না।

অবশ্য মানুষ যে অন্যায় করবে না, এমন কথাও যেমন বলা যায় না, তেমনি সে অন্যায়ের কোনও সাজাও যে পাবে না—এমন আবদারও আমরা করতে পারি না। প্রকৃতির মাঝেই দেখি, প্রত্যেকটা আইনভঙ্গের জন্য শাস্তি পেতেই হয়—সেখানে কেউ রেহাই পায় না। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে শাসনপদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা থাকলেও আমরা তাকে প্রকৃতির অনুবর্ত্তনেই গড়ে তুলতে চাই। ছেলে যদি অন্যায় করে, তবে সে অন্যায়ের যা স্বাভাবিক ফল, তাই তাকে ভোগ করতে দাও। সে বুঝুক "আমি এই অন্যায় করেছি, সুতরাং তার জন্য আমাকে এই দণ্ড পেতে হবে—কোন মানুষের বিচারে নয়, একেবারে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য আইনের বিচারে।" বিচারক যদি অপ্রধৃষ্য স্থানে থেকে বিচার করেন, তবে আর অপরাধীর বলবার কিছু থাকে না—প্রতিহিংসাটা পর্য্যন্ত নেবার সুযোগ থাকে না। মানুষের নাগাল পাওয়া যায়, তাই মানুষের বিচারে স্বভাবতঃই একটা সন্দেহ, একটা প্রতিহিংসা-লালসা জেগে ওঠে। কিন্তু প্রকৃতির বিচারকে আর তুমি কি বলবে? তাই তার শিক্ষাটা মানুষের পক্ষে বড় কার্য্যকরী হয়। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে শাসননীতিকে প্রকৃতির অনুকূলেই পরিচালনা করা উচিত।

এই হল এক দিককার কথা।

এই সমস্ত যুক্তির মূলে কতকটা সত্য আছে। বাস্তবিক আমরা সাধারণতঃ লাঠির প্রতিনিধিত্বে যে বিচার করে থাকি, তার মাঝে দেনাপাওনার ভাবটা সময় সময় এত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তরুণ

মনের উপর তার ছাপ পড়তে বেশী দেরী হয় না। এই জন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসনের ফলে শিক্ষা না হয়ে অন্তায় জেদ, প্রতিহিংসার স্পৃহা ইত্যাদি দানবীয় বৃত্তিগুলিই জেগে ওঠে। ধর, ছেলেটা দুষ্টুমী কর্‌ছে; তার ব্যবহার ভাল কি মন্দ, কতটুকু প্রশ্রয় তাকে দিতে হবে, তার হিসাব কর্‌বার সময় আমার হয়ে উঠ্‌ছে না। এদিকে দুষ্টুমীর মাত্রাটা বেড়ে গিয়ে শেষে একটা অকাণ্ড বাধিয়ে তুল্‌ল। এই অবস্থায় আমার অনবধানতার ত্রুটী যদি ছেলের পিঠে লাঠি ভেঙে সংশোধন কর্‌তে যাই, তবে ছেলে মনে কর্‌বে কি? প্রথমতঃ আমার এতখানি উষ্মার কারণটাই সে বুঝ্‌তে পার্‌বে না। তার আচরণটা যে অসঙ্গত হয়েছে, তা ক্রমে ক্রমে হয়েছে, একেবারে হয়ে ওঠেনি; সুতরাং পরিণামে তার কতখানি গুরুত্ব জন্মেছে, তা বুঝ্‌বার বেচারীর অবসরই হয়নি, কেননা বালকসুলভ মনোবেগের বশে সে কেবল একটা ঝোঁকের মাথাতেই কাজ করে গিয়েছে—পদে পদে বিচার এসে তার আচরণ সম্বন্ধে তাকে সজাগ করে দেয়নি; সুতরাং সঙ্গতি-অসঙ্গতিবোধ তার গোড়াতেও যতটুকু ছিল, পরিণামের অকাণ্ডটা পর্য্যন্তও সেটা ততটুকুই আছে। এমন অবস্থায় শাসনের মাত্রাটা অধিক এবং আকস্মিক হলে ছেলে কিছুতেই তার সঙ্গতি বুঝ্‌তে পার্‌বে না। ফলে আমার শাসনটা তার কাছে অন্তায় বলেই মনে হবে। তখন হয় সে সেটা অগ্রাহ্য কর্‌বে, নতুবা আমাকে নির্ব্বিবাদে উত্যক্ত কর্‌বার জন্ত তার মাঝে একটা প্রবল স্পৃহা জন্মাবে। এদিকে আমি যদি আত্মানুসন্ধিৎসু হই, তবে আমিও বুঝ্‌ব, আমার শাসনের মূলে কল্যাণাকাঙ্ক্ষা ততটা নাই, যতটা আছে বিরক্তি ও সাংসারিক লাভলোকসানের হিসাব।

এই কথাটা যখন বিচার করি, তখন বুঝ্‌তে পারি, শাসনের চেয়ে সংরক্ষণ কত প্রয়োজন।

শিক্ষার শাসনকে যাঁরা প্রকৃতির অনুবর্ত্তী কর্‌তে চান, তাঁদের স্বপক্ষে যে যুক্তি আছে, তার কথা বলা হল। বাস্তবিক শাসনের মাঝে যেখানে সমাহিত চিত্তের বিচার নাই, অতি অস্পষ্ট হলেও বিরক্তি ও প্রতিশোধস্পৃহা যেখানে লুকিয়ে আছে, সেখানে শাসনে সুফল না হয়ে কুফলই হয়ে থাকে। এই হিসাবে শাসকের মনোবৃত্তিকে একটা নির্বাত নিষ্কম্প অবস্থায় নিয়ে যাবার জন্য প্রকৃতির অনুবর্ত্তন প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, শাসনের মাঝে একটা জিঘাংসা ছাড়া কি আর কিছুই থাক্‌তে পারে না?

প্রকৃতির অনুবর্ত্তননীতি যে ভাব থেকে জন্মগ্রহণ করেছে, তার মূলে একটা জাতিগত আদর্শবৈষম্যের বীজ রয়েছে। যে দেশে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত অধিকারের দাবী করে, সাম্যনীতির কথা যেখানে পথে ঘাটে বিকায়, সেখানে প্রেমে কাউকে শাসন কর্‌তে একটা সঙ্কোচ বোধ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অবশ্য এখানে শাসক বলতে আপাত নিঃসম্পর্ক শিক্ষককেই লক্ষ্য কর্‌ছি। আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শে আচার্য্য গুরু হয়ে দাঁড়ান;—আর গুরু যে কত বড় আত্মীয়, পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের চেয়েও যে তাঁর অধিকার কতদূর বিস্তৃত, তা আমরা শুধু সংস্কারবশেই নয়, যুক্তিবিচার দিয়েও বুঝতে পারি। সুতরাং এ দেশে ছাত্রের উপর আচার্য্যের অপ্রতিহত অধিকার থাকা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। ছাত্রের উপর আচার্য্যের বাৎসল্যের যেমন সীমা নাই, তেমনি তাঁর শাসন করবার অধিকারও অপর্য্যাপ্ত।

কিন্তু এই ভাবটা পাশ্চাত্যদেশে ফুটে উঠ্‌বার সুযোগ পায়নি। অন্ততঃ আমাদের ভাগ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার যতটুকু দর্শন-স্পর্শন মিলছে, তাতে ব্যক্তিগত অধিকারটা বজায় রাখাই যে পুরুষার্থ, এ ভাবটা ক্রমশঃ আমাদের মাঝেও সংক্রামিত হচ্ছে। পশ্চিমে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার বলতে গেলেই অধিকার-অনধিকারের কথা এসে পড়ে। এই হিসাবে পিতামাতাও সন্তানের উপর অধিকার বিস্তার করতে সঙ্কুচিত হন। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠাই যেখানে শিক্ষার মূলমন্ত্র, সেখানে শাসনরূপ অধিকারসঙ্কোচের কথাই উঠতে পারে না। তবুও যে শাসনের প্রয়োজন আছে, এ কথাটা মুখে স্বীকার না করলেও কার্য্যক্ষেত্রে স্বীকার করতেই হয়। তাই শাসননীতিটাকে যথাসাধ্য মোলায়েম করবার জন্য, মানুষের অধিকারের সীমা অব্যাহত রাখবার জন্য ওটাকে প্রকৃতির ঘাড়ে চালান দেওয়া হয়েছে। এতে শাসন করাও চলে, অথচ মানুষের সম্বন্ধে অনধিকারচর্চ্চারও দোষ আসে না এবং শাসিতের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও কোথাও ক্ষুণ্ণ হবার অবকাশ পায় না—কেননা সে জানে শাসক প্রকৃতি—মানুষ নয়; প্রকৃতির হাতের উপর যখন হাত চলে না, তখন বাধ্য হয়ে শাসনটাকে হজম করতেই হয়।

কিন্তু এখানে দুটো কথা আমাদের খেয়ালে আসেনি। প্রথমতঃ মানুষকেও প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া চলে—কেবল জড় জগতের আইনটাই ন্যায়ান্যায় বিচারের মাপকাঠি নয়—মনোজগতের একটা আইন-কানুন আছে এবং সেটাও প্রাকৃতিক। দ্বিতীয় কথা—সকল কাজের বিচারের জন্য সব সময় প্রকৃতির প্রতীক্ষা করে থাকলেও চলে না। ঠেকে শেখাটাই জগতের দস্তুর হলে

মানব-জাতির অতীত অভিজ্ঞতার পুঁজি নিরর্থক হত। আর শিক্ষা যদি অতীত অভিজ্ঞতার উপর না দাঁড়ায়, তবে তাকে কখনও উন্নতিশীল বলা চলে না।

এমন কল্পনার পেছনে মানুষের হৃদয় বলে যে একটা পদার্থ নাই, তা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। যাকে ভালবাসব, তার উপর আমার অসীম অধিকার। ভালবাসার মাঝেও যদি অধিকার-অনধিকারের বিচার করে ব্যবহার চালাতে হয়, তা হলে ভালবাসার মাধুর্য্য থাকল কোথায়? ভাল যদি বাসি, তবে শাসন করবার জন্য কি কারু মুখ তাকিয়ে থাকতে হবে? যাকে ভালবাসি, তাকে আমরা যতখানি দুঃখ দিতে পারি, অপরকে ততখানি পারি না। আপন জনের উপর কঠোর হওয়াটাই হল প্রাণের টানের পরিচয়। যেমন একবার রুদ্ররূপে শাসন করব, তেমনি আবার সেবায় যত্নে স্নেহে মায়ের আসন অধিকার করব—এই হচ্ছে ভারতীয় আচার্য্যের নীতি। ছেলে কি আমার পর যে প্রকৃতির আড়াল থেকে গা বাঁচিয়ে তাকে শাসন করতে হবে? আমি মানুষের মতই সুখে-দুঃখে, হর্ষে-বেদনায় স্পন্দমান, কাজেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ অসঙ্কোচ ব্যবহারেই আমার প্রাণ স্ফূর্ত্তি হয়। এই জন্য আমরা সোহাগ করতেও জানি, আবার শাসন করতেও জানি। আমরা প্রকৃতির অন্ধনীতিকে কবুল করি না—আমরা জানি মানুষের প্রাণের আইনকে।

শাসন সম্বন্ধে দুই তরফের কথাই বলা হল। এখন শাসনের যথার্থ স্বরূপ কি তাই বুঝতে হবে।

শাসনের স্বরূপ

পূর্ব্বে আমরা বলেছিলাম, প্রকৃতির অনুবর্ত্তনের দোহাই দিয়ে শাসনকে শিক্ষাক্ষেত্র হতে একেবারে নির্ব্বাসন করা চলে না; আবার নির্ব্বিচার শাসননীতিকেও শিক্ষার নিয়ামক বলে গ্রহণ করা চলে না। এই দুই কোটীর মাঝে একটা সুসঙ্গত মধ্যপথ আমাদের আবিষ্কার করতে হবে। সেই জন্ত প্রকৃত শাসনের স্বরূপ কি, তার আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষার স্বরূপ কি, তা না বুঝলে শাসনের স্বরূপ কি, তা বোঝা যাবে না। কেননা শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য, শাসন তার একটা উপায় মাত্র। সাধারণতঃ শিক্ষাকে আমরা একটা বহিরঙ্গ ব্যাপার বলে কল্পনা করে থাকি। আমরা ধরে নিই যে, শিক্ষার্থীর মাঝে যেন কিছুই নাই, অথচ শিক্ষকের মাঝে সবই আছে; শিক্ষক যে তাঁর পূর্ণ ভাণ্ডার থেকে শিক্ষার্থীর শূন্ত ভাণ্ডার পূরণ করেন, তারই নাম শিক্ষা। হতে পারে লেখাপড়া বা কতকগুলি আচার-ব্যবহারের সম্বন্ধে এই সূত্রটা খাটতে পারে—যদিচ এখানেও সব জায়গাতেই খাটে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু আসলে এমন বিশ্বাস নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে অবিবেচনা ও আত্মম্ভরিতায় সমস্ত কাজই পণ্ড হয়ে যাবে। শিক্ষাকে জীবনের একটা অন্তরঙ্গ ব্যাপার বলে মনে করতে হবে, তাকে অধ্যাত্মদৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। ব্রহ্মবীজ সবার মাঝেই নিহিত রয়েছে, আত্মার শক্তি সকলের মাঝেই স্ফুরণোন্মুখ হয়ে আছে—অনুকূল অবস্থার সহায়ে এবং প্রতিকূল অবস্থার অপসারণে এই

বীজকে অঙ্কুরিত করা, আত্মশক্তিকে স্ফুরিত করার চেষ্টার নামই শিক্ষা। মহর্ষি পতঞ্জলির ভাষায় বলতে গেলে, শিক্ষা অর্থে একটা আভ্যন্তর পরিণাম ঘটানো; প্রকৃতির আপূরণ দ্বারাই তা সম্ভব। তা করতে হলে আমাদের কেবলমাত্র আবরণ ভেদ করতে হবে—বাধা সরিয়ে দিলেই আত্মশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে উঠবে।

ধীরভাবে বিচার করলে বোঝা যায়, মানবশিশুকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখে শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে যখন শিক্ষার ভার গ্রহণ করি, তখন অন্তঃপ্রেরণাবশতঃ তাড়ননীতিকে বর্জ্জন করতেই হয়। বাগানের মালী ফুলগাছকে "লালন" করেই ফুল ফোটায়, "তাড়ন" করে নয়। আগাছাগুলিকে তাড়ন করতে হয় বটে, কিন্তু কেবলমাত্র আগাছা-তাড়নই কোন মালী তার একমাত্র কর্ত্তব্য বলে বুঝবে না। সে জানে, গাছগুলোকে লালন করাই মুখ্য কাজ, লালনকে সহজ করবার জন্য তাড়ন একটা উপলক্ষ্য মাত্র। শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমনি পোষণকে মুখ্য স্থান দিয়ে শাসনকে গৌণ স্থান না দিলে কিছুতেই সুফল ফলবে না। আর এই লালন আর তাড়ন, পোষণ আর শাসন এক হাতে না থাকলেও ফল ভাল হবে না। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের ছেলেদের যেমন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাতে এ বিষয়ে বেশ শ্রমবিভাগ করে নেওয়া হয়েছে। মা বাপ প্রভৃতি স্নেহময় আত্মীয়েরা নিয়েছেন লালনের ভার এবং এ বিষয়ে তাঁরা যথাসাধ্য কর্ত্তব্যের কোনও ত্রুটী করছেন না; আর স্নেহসম্পর্কশূন্য অন্নচিন্তা-পীড়িত অর্থদাস মাষ্টার নিলেন তাড়নের ভার। এমন অবস্থায় শিক্ষার যে কি ফল ফলবে, তা সহজেই অনুমেয়।

প্রাচীন আদর্শ অনুসারে শিক্ষা ছিল ব্রহ্মযজ্ঞ—"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ।" নিত্যানুষ্ঠেয় পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে এই যজ্ঞই ছিল শ্রেষ্ঠ;

এই যজ্ঞফলে মানুষ ঋষি-ঋণ হতে মুক্ত হত। এই অর্থে শিক্ষা আর সেবা এক—শিক্ষাদানই হচ্ছে আত্মোৎসর্গের শ্রেষ্ঠ সাধনা। আজকাল এ আদর্শ আমরা ভুলে গিয়েছি। এখন গণমতের প্রাবল্য, তাই গণ-শিক্ষার উপর মানুষের খুব ঝোঁক পড়েছে। সে শিক্ষার আদর্শ মোটামুটী একটু লেখাপড়া শিখিয়ে দুটো করে-খাওয়ার উপায় করে দেওয়া। এমন শিক্ষা সারা দেশময় বাধ্যতামূলক করলেও আপত্তি নাই, কেননা একেবারে কিছু না হওয়ার চেয়ে অন্ততঃ এটুকু হওয়াও ভাল। কিন্তু সকলকেই যে এক হাড়িকাঠে কোপ দিতে হবে, এমন কথা মানি না। সমাজের কল্যাণের জন্ত জাতির বলাধানের জন্ত কতকগুলি লোককে এই বৈশ্যশূদ্রতন্ত্র শিক্ষা হতে পৃথক রেখে শিক্ষায় ব্রাহ্মণ্য আদর্শ প্রচার করতেই হবে। তারা সংখ্যায় অল্প হলেও ক্ষতি নাই—কিন্তু তাদের চাই-ই চাই।

এমন শিক্ষার সঙ্গে শাসনের কি সম্পর্ক, তা "শাসন" শব্দটা এবং সেই ধাতুমূলে আরও কয়েকটা শব্দের আলোচনা করলে বোঝা যাবে। শাসন আর "শাস্ত্র" মূলে এক অর্থজ্ঞাপক। আমরা শাস্ত্র বল্‌তে যা বুঝি, বৌদ্ধপরিভাষায় শাসন বল্‌তে ঠিক তাই বোঝায়। বুদ্ধদেব অজ্ঞানান্ধ জীবকে শাসন করতেন বলে, তাঁর এক নাম ছিল "শাস্তা" এবং তাঁর এই নামই তাঁর অন্তরঙ্গমণ্ডলীতে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করবার পূর্ব্বে সকলকে বলেছিলেন, "আমি চলে গেলেও তোমরা কেউ মনে করো না যে আমাদের শাস্তা কেউ রইল না; আমি যে ধর্ম্ম ও বিনয়র উপদেশ করেছি, আমার অভাবে তারাই তোমাদের শাস্তা হবে।" যে শাস্তার শাস্ত্র বা শাসন মেনে নেয়, তাকে বলে "শিষ্য"। এই শিষ্যের ভাব কেমন, তা গীতায় অর্জ্জুনের

উক্তিতে সুন্দর ফুটে উঠেছে—"কার্পণ্যদোষে আমার স্বভাব উপহত হয়ে আছে, কোনটা আমার ধর্ম্ম, সে বিষয়ে আমার চিত্ত সংমূঢ়; আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ কি, তা তুমি নিশ্চয় করে বল। আমি তোমার কাছে প্রপন্ন, তুমি আমাকে **শাধি**—শাসন কর।"

শিক্ষা ও শাসনের এই পবিত্র ও গম্ভীর প্রাচীন আদর্শ সর্ব্বদা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। বাইরে আমরা যে উপায়ই অবলম্বন করি না কেন, অন্তর সর্ব্বদা এইভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে। জান্‌তে হবে—শিক্ষা ব্রহ্মযজ্ঞ—আত্মোৎসর্গের সাধনা; তার উপায় আবরণভেদদ্বারা প্রকৃতির আপূরণ। এই হচ্ছে **ধর্ম্ম**; আর ধর্ম্মের অনুকূল যে আচার, তাই **বিনয়**। যিনি শিক্ষক, তিনি শাসন করবার সময় এই ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিনয় অনুসারেই শাসন করবেন। শুধু নির্ব্বিচারে শাস্তি দিয়ে শাস্তা হলে চল্‌বে না; স্বয়ং প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত থেকে মূঢ় চিত্তকে শ্রেয়ঃপথে পরিচালিত কর্‌তে হবে। তাই শাসনের আধ্যাত্মিক প্রতিরূপ।

এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ থেকে কার্য্যকালে শিক্ষক বা শাস্তা কেমন ব্যবহার করবেন, এখন তারই আলোচনা করা যাক্।

শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, শাসনের উদ্দেশ্য তিনটী—সংশোধন, সংরক্ষণ ও উদ্বোধন। আমরা কিন্তু সাধারণতঃ কেবল সংশোধন-কল্পেই শাসনের অপব্যবহার করে থাকি। যে অন্যায় বা অনাচার হয়ে গিয়েছে, তার বর্ত্তমান কুফল হতে শিক্ষার্থীকে রক্ষা কর্‌তে হবে। এটা যেন রোগের চিকিৎসাস্থানীয়। শাসনের এই অঙ্গটা দূরদৃষ্টি অভাবে এবং কতকটা পরিস্থিতির স্বাভাবিক প্রতিকূলতাবশতঃ শিক্ষার্থীর কাছে অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে। রোগ হলে তিক্ত ওষুধ খেতেই হয়—সুতরাং সংশোধনকল্পে শাসন একটু অপ্রীতিকর হবেই।

তবে চিকিৎসক কেবল ওষুধের ব্যবস্থাই করেন না, পথ্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখেন; রোগী যাতে প্রাণশক্তির প্রেরণায় স্বভাবতঃই রোগের বীজগুলি দূর করে আরাম হয়ে যেতে পারে, সেই জন্যই সুপথ্যের প্রয়োজন। সুতরাং সংশোধনের জন্য যে শাসন করা হবে, তাতেও দৃষ্টি রাখতে হবে, এই শাসন শিক্ষার্থীর পক্ষে পথ্য হচ্ছে কিনা, এর ফলে অন্যায়কে নির্জ্জিত করবার জন্য সে ভিতর থেকে স্বভাবতঃই শক্তি পাচ্ছে কি না!

প্রাচীনকালের দুটী কথা তুলনা করলে সংশোধনমূলক শাসনের তাৎপর্য্য বোঝা যায়। একটী হচ্ছে দণ্ড, আর একটী প্রায়শ্চিত্ত। অপরাধ করলে রাজা যে শাস্তি দেন, তা দণ্ড; আর শাস্ত্র যে শাস্তি দেন, তা হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত। রাজা সমাজশৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্যই শাস্তি দিয়ে থাকেন, সুতরাং তাঁর উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু তবুও তাঁর শাসনকে আমরা অন্তর দিয়ে স্বীকার করি না—স্বীকার করি ভয়ে। রাজা আমার অন্তরে প্রবেশাধিকার পাননি, তাই তাঁর শাসন দণ্ড বা তাড়না। আর শাস্ত্র আমার অপরাধের বিচার করেন ধর্ম্মদৃষ্টি দিয়ে, প্রজ্ঞাচক্ষু দিয়ে। তাই শাস্ত্রের শাসন আমাদের অন্তর স্পর্শ করে; আমরা অপরাধ বুঝে অনুতপ্ত হই এবং স্বেচ্ছায় শাস্ত্রের শাসন স্বীকার করি। এরই নাম প্রায়শ্চিত্ত। কনেষ্টবলের শাসনের চেয়ে পিতার শাসন যে সুসহ ও হিতকর, এ কথা কে না স্বীকার করবে?

সুতরাং সংশোধন কল্পে যে শাসন হবে, তাতে যেন শুদ্ধ তাড়না না থাকে। এখানেও শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, লজ্জা ও ভয়ের ভাব জাগিয়ে তুলতে হবে—শাসকের প্রতি নয়। শাসন দিয়ে অন্যায়কে বাধা দেবার শক্তি ও ইচ্ছা

শিক্ষার্থীর মাঝে জাগিয়ে তোল। তার উপায় হচ্ছে দণ্ডবিধান নয়—স্বেচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ।

শাসনের দ্বিতীয় অঙ্গ হচ্ছে সংরক্ষণ। এটা একটা গুরুতর কর্ত্তব্য, আর এর জন্যই মাথা খাটাতে হবে সব চেয়ে বেশী। অনেক শিক্ষক হয়ত বেতের চোটে এটা সংক্ষেপে সারতে চান। ছেলে অন্যায় করেছে, তার জন্য হয়ত পাঁচ ঘা বেত সে পেতে পারে; সে জায়গায় বুদ্ধিমান শিক্ষক পনের ঘা বসিয়ে দিলেন—উদ্দেশ্য পাঁচ ঘা'তে বর্ত্তমান অন্যায়ের সংশোধন হল, আর বাকী দশ ঘা'তে ভবিষ্যৎ অন্যায় থেকে সংরক্ষণ করা হবে। কিন্তু অন্যায়দণ্ডে যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই কতটা মানসিক হীনতা জন্মে, তা কেউ ভেবে দেখেন না।

সংরক্ষণের শাসন লাঠির মধ্যস্থতায় একদম করতে নাই। শাসনকে যে ব্যাপক অর্থে আমরা গ্রহণ করেছি, তা বুঝতে পারলেই আমরা সংরক্ষণের যথার্থ উপায় কি, তা বুঝতে পারব। সংরক্ষণের মূলে ভবিষ্যৎ-চিন্তা। তার জন্য স্নেহ থাকা প্রয়োজন। একটা কথা আছে, "স্নেহঃ পাপশঙ্কী"—যেখানে স্নেহ, সেখানে অনিষ্টের আশঙ্কা। শিক্ষক যদি যথার্থ স্নেহশীল হন, তাহলে শিক্ষার্থীর হিতচিন্তা সর্ব্বদাই তাঁর মনে জেগে থাকবে, আর সেই হিতচক্ষু দিয়ে তিনি কোথায় অনিষ্টের কারণ বর্ত্তমান, তা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবেন এবং অনিষ্ট ঘটবার পূর্ব্বেই তার প্রতিকার করতে পার্‌বেন। তিনি এমন নিঃশব্দে কাজ কর্‌বেন,—এমন অতর্কিতে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা করে রাখবেন, যাতে শিক্ষার্থী অজ্ঞাতসারেই অকল্যাণ হতে নিবর্ত্তিত হয়ে কল্যাণের পথে চল্‌বে। সংরক্ষণকল্পে পূর্ব্ব হতেই ব্যবস্থা না থাকার দরুণ কত যে অনিষ্ট ঘটে, তার ইয়ত্তা নাই।

আমাদের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীতে প্রথম হতেই ব্রহ্মচারীকে কতকগুলি বিধিনিষেধের অধীন করে দেওয়া হত। বুঝুক আর না বুঝুক, আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ সরল বিশ্বাসে ব্রহ্মচারী তা পালন করে যেত। তার ফলে তার মাঝে প্রলোভন হতে আত্মরক্ষার একটা স্বাভাবিক শক্তি জন্মাত। অত আগে থেকে এই ব্যবস্থা না থাকলে প্রলোভন সাম্‌নে এসে পড়লে পর তা হতে আত্মরক্ষা করা কি সহজ হয়? এই সমস্ত বিধিব্যবস্থাই সনাতন ধর্ম্মের আচার। আপাতদৃষ্টিতে হয়ত কারু কাছে তা নিরর্থক মনে হতে পারে, কিন্তু কল্যাণকামী ঋষিরা অধ্যাত্মদৃষ্টি দিয়ে মানুষের পরিণাম দেখেই এই সমস্ত বিধান করে গিয়েছেন। যে শ্রদ্ধার সঙ্গে ঋষিপ্রদর্শিত পথে চলেছে, সে-ই এগুলির সার্থকতা বুঝতে পেরেছে।

সংরক্ষণ করতে হলে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে, প্রতিকূল কারণগুলি দূর করতে হবে, আচার-নিষ্ঠা সহ আদর্শের অনুসরণ করতে হবে। এর কোনটাই সহজ নয় বা বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করলে এতে সফলকাম হওয়া সম্ভবপর নয়। শিক্ষকের যা কিছু শিক্ষানৈপুণ্য, এই সংরক্ষণনীতিতেই তা ফুটে উঠ্‌বে। একটা বিদ্যালয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা দেখেই তার মর্য্যাদা নিরূপণ করা যেতে পারে। দূরদর্শিতা, নেতৃত্বশক্তি, প্রতিভা ও মমতার উপর সংরক্ষণের শাসন যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে। সংরক্ষণে সুদক্ষ হলে শিক্ষককে আর সংশোধনের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কঠোরতার আশ্রয় নিতে হয় না।

সংশোধন আর সংরক্ষণকে শিক্ষার বহিরঙ্গ বলতে পারি। এর জন্য যে শাসনের প্রয়োজন ছিল, তার প্রাচীন পারিভাষিক

নাম ছিল বিনয়। এই জন্য শিক্ষকের নাম ছিল বিনেতা আর শিক্ষার্থীর নাম ছিল বিনেয়। ভগবান্ বুদ্ধদেব এই বিনয়মূলক শাসনকে ফলপ্রসূ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য আজীবন যেরূপ প্রাণপাতী চেষ্টা করেছিলেন এবং শিক্ষার্থীদিগের জীবন যেরূপ সংহত ও সুশৃঙ্খল করতে পেরেছিলেন, শিক্ষাজগতের ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

তারপর তৃতীয় অঙ্গ বা অন্তরঙ্গ হচ্ছে—উদ্বোধন। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে পরিভাষা ব্যবহার করেছি, তারই অনুবৃত্তিস্বরূপে একে ধর্ম্মমূলক শাসন বলতে পারি। ধর্ম্ম এখানে খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যা আমাদের ধারণ করে, আমাদের ধীবৃত্তিকে কল্যাণের দিকে প্রচোদিত করে, তাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মমূলে শাসন করাই হল প্রকৃত শাসন। হিন্দু এই শাসনবিধিকেই শাস্ত্র বলে জানেন। যিনি এই শাসন মেনে নেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য। শিক্ষা আর এখানে নৈতিকজগৎ বা মনোজগতের বিচার্য্য বিষয় নয়—এখানে শিক্ষা আধ্যাত্মিক ব্যাপার। যথার্থ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন হতে না পারলে ধর্ম্মমূলক শাসন করা একেবারেই অসম্ভব। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাশাস্ত্রে এই জন্য আচার্য্য ও গুরু একই অর্থ প্রকাশ করে। শিক্ষার্থীরা যেমন ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী, আচার্য্যও তেমনি ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত—"ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ।" এই আচার্য্য বা গুরুর শক্তি সম্বন্ধে ব্যাসদেব পাতঞ্জল সূত্রভাষ্যে বলেছেন, "দুর্ব্বল ধানুকীর তীর যেমন চর্ম্ম মাত্র ভেদ করে, কিন্তু মর্ম্মভেদ করে না, অব্রহ্মচারী আচার্য্যের উপদেশও তেমনি শিক্ষার্থীর হৃদয়ে স্থান পায় না। কিন্তু লব্ধবীর্য্য ব্রহ্মচারী আচার্য্যের উপদেশ একেবারে শিষ্যের

মর্ম্ম বিদ্ধ করে।" এমনি শক্তিসঞ্চারের ক্ষমতা না থাকলে ধর্ম্মমূলক শাসন অসম্ভব। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে এরই সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। শুধু কতকগুলো কসরত শেখালেই তো হবে না, শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—সুপ্ত সিংহকে জাগিয়ে তুলতে হবে। যে স্বয়ং অপ্রবুদ্ধ, সে অপরকে কি করে প্রবুদ্ধ করবে?

এই অন্তরঙ্গ শাসনে শিষ্যের বা শিক্ষার্থীর প্রপন্ন থাকা চাই। পূর্ব্বে যে অর্জ্জুনের উক্তি উল্লেখ করেছি, তাতে প্রপন্নভাবটী সুন্দর ফুটে উঠেছে। অর্জ্জুন বলছেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁর চিত্ত মোহগ্রস্ত; মোহের স্বভাব—সে তো সত্যকে জানতে দেবেই না, উপরন্তু তার একটা বিকৃতরূপ দেখিয়ে দেবে। অর্জ্জুনেরও প্রথমটায় তাই হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকে প্রথমতঃ তিনি খুব লম্বা এক লেকচার ঝেড়েছিলেন—ধর্ম্ম কি তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হেসে বলেছিলেন, "পণ্ডিতের মত কথা বলছ বটে! কিন্তু তুমি অনার্য্যের পথ ধরেছ। দূর কর এ ক্লীবত্ব, দূর হোক এ তুচ্ছ হৃদয়দৌর্ব্বল্য!—ওঠ, জাগ!" তখন অর্জ্জুনের খেয়াল হল। বললেন, "আমি স্বধর্ম্ম বুঝতে পারছি না—স্বভাব চিনতে পারছি না—শ্রেয়ঃ কি তা জানছি না, আমি প্রপন্ন, তুমি আমায় শাসন কর।" তারপর শ্রীকৃষ্ণের শাসন সুরু হল।

এ চিত্র অতি বাস্তব। আজকাল আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিষাদযোগের আবির্ভাব হয়েছে। আমরা বুলি ঝাড়ছি খুব—অথচ কাজ কিছুই হচ্ছে না। পার্থসারথি অন্তরালে থেকে হাসছেন আর বলছেন, "প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" কিন্তু কই, এখনও তো তিনি শাস্তারূপে দেখা দিলেন না। দেখা আর কি দেবেন—আমাদের প্রপন্ন ভাব জাগলে তো তিনি শাসন করবেন।

পার্থের মত শিক্ষার্থী আর শ্রীকৃষ্ণের মত আচার্য্য—এই হল শিক্ষার জাতীয় আদর্শ।

একটা মজা এই, শিক্ষার্থীর মাঝে প্রপন্ন ভাবটা নিয়ে আসতে শিক্ষক খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন—কারণ ওটা বিশেষ উপভোগ্য বস্তু কিনা। কিন্তু প্রপন্নভাব যদি স্বাভাবিক না ফোটে, তাহলে জোর করে ফোটাতে গেলে শিক্ষক আর শিক্ষার্থীর সম্বন্ধটাই মাটী করে ফেলা হবে। আজকাল এর দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু এতে যে নিজেরই অপদার্থতা প্রমাণ হয়, আনাড়ী শিক্ষক সেদিকে খেয়াল করে না। প্রাণ আকর্ষণ করে আনতে হবে—ও কি সাধ্য-সাধনায় বা চালকীতে হয়? সংস্কৃতে ওই শক্তিকে বলে অনুভাব। অনুভাব থাকলে শাসন সহজ হয়ে যায়। শাসন সহজ হলেই শিক্ষা সার্থক। একদিকে শ্রদ্ধা, প্রণিপাত, প্রীতি, সেবা ; আর একদিকে মমতা, বীর্য্য, শীল, প্রজ্ঞা। এই মণিকাঞ্চনের যোগ হলে তবে শাসন সফল হবে। ধর্ম্ম আর বিনয়—শাসনের এই দুটী পরিভাষা মনে রাখতে হবে।

শাসক ও নায়ক

শাসন করবার অধিকার কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে, এ সম্বন্ধে মতভেদ ও রুচিভেদ দুই-ই আছে। যেখানে নাড়ীর সম্পর্ক আছে, সেখানে এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে হয় না, কেননা প্রকৃতির কোনও নিগূঢ় নিয়মে মাত্রাধিক্যটাও সেখানে ক্ষমার্হ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যেখানে নিঃসম্পর্ক শিক্ষকের হাতে শাসনভার পড়ে,

সেইখানেই শাসনের মাত্রা ও প্রকারসম্বন্ধে নানা দিক দিয়ে ভাববার কথা আছে। এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে শাসনের একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা দরকার। আদর্শের দিক দিয়ে শাসনের যে একটা পারিভাষিক অর্থ আছে, এ কথা আমরা "শাসনের স্বরূপ" নামের প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করেছি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা শাসন বল্‌তে তার ব্যবহারিক অর্থটাই লক্ষ্য করছি। ধীরভাবে চিন্তা করলে বুঝ্‌তে পারি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শাসনের যত বিভিন্ন মূর্ত্তিই দেখি না কেন, তার মূলে কিন্তু শাসকের পীড়নেচ্ছাটাই সুস্পষ্ট। অর্থাৎ এ শাসন অর্থে ছেলেকে কোনও একটা স্বাচ্ছন্দ্য হতে বঞ্চিত করা। এর পর আমরা যা বলব, তা মুখ্যতঃ শাসনের এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বল্‌ব।

অন্যায় করেছে, তার জন্য শাস্তি দিলাম—এই হল শাসনের মূল নীতি। এ ধরে বল্‌তে পারি, অন্যায় না করলে শাসনও করা চলে না। এই সহজ কথাটাও স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে দেখ্‌তে পাই। কোন্‌টা যে ন্যায় আর কোন্‌টা অন্যায়, কোন্ আঘাতের মূলে শাসকের মঙ্গলেচ্ছা আর কোনটার মূলেই বা স্বার্থহানিজাত উত্তেজনা, নির্ণয় করা বড় কঠিন। বয়সে বড় হয়েছি বলেই যে আমরা ন্যায়ান্যায় খুব বুঝি, এ কথা কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না। প্রবৃত্তিকে পরাস্ত করে বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রৎ করা বহু সাধনা সাপেক্ষ। শাসক মাত্রেই সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, এ কথা বলা চলে না। নিজ নিজ ছেলেবেলাকার কথা যদি কেউ মনে করে দেখেন, তাহলে এমন অবিচারে শাসনের কত গ্লানি স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে দেখতে পাবেন। সে কথা মনে রেখে, ঠিক অন্যায় দেখতে পেলে তবে শাসন করাটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ।

এ হতেই সিদ্ধান্ত কর্‌তে পারি, যেখানে অন্যায় প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ কর্‌তে পার্‌ছি না, সেখানে শাসনদণ্ডের প্রয়োগ করাও উচিত নয়। করলে তার ফল বিপরীত হবে। এ কথাটা আমরা আরও সহজে ভুলে যাই। জুলুম করবার প্রবৃত্তিটা আমাদের মাঝে স্বাভাবিক, মানুষকে ভাল ভাবার চেয়ে মন্দ ভাবার ঝোঁকটা আমাদের বেশী। অন্যায়ের সন্দেহকে উপেক্ষা করে বা সহ্য করে পাছে ঠকে যাই, এই ভয়ে আন্দাজের উপর ঘা মারাটাই আমরা সেয়ানার কাজ মনে করে থাকি। কিন্তু এই অসহিষ্ণুতা ও অতিসন্দিগ্ধ ব্যস্ততার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কত অনর্থপাত হয়, তা বল্‌বার নয়। বরং ছেলে সত্য গোপন করছে এমন সন্দেহ সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করা উচিত, তবুও অন্যায়ভাবে বা প্রমাণাভাবে শাসন করা উচিত নয়। জানি, এ কথায় সকল শাসকের মন সায় দিতে চাইবে না। এ ক্ষেত্রে ক্ষমা কথাটা অনেকে অবিবেচনা ও দুর্ব্বলতা মনে করবেন। কিন্তু সন্দেহ ও প্রমাণকে একই পর্য্যায়ভুক্ত কর্‌লে তার ফল কিছুতেই ভাল হতে পারে না। যেখানে সন্দেহ, সেখানে সতর্কতাই প্রয়োজন, শাসন প্রয়োজন নয়। ক্ষমা সেখানে মহৎ হৃদয়ের শাসন।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখ্‌তে হবে। ছেলেদের ন্যায়ান্যায়বোধ যে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, এ কথা শাসককে সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌তে হবে। ছেলে যদি জানে যে, সে অন্যায় বিচারে শাস্তি পেল, তাহলে সে বিচারককে প্রাণপণে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা করবে। এই যে শাসকের সঙ্গে তার মনভাঙাভাঙি হবে, এ আর কিছুতেই জোড়া লাগতে চাইবে না। অন্যায় শাসনে যদি কোনও শিক্ষক শিক্ষার্থীর অশ্রদ্ধাই অর্জ্জন করে থাকেন, তবে সে তাঁর নিতান্ত দুর্দ্দৈব্‌ বলতে হবে। ছেলেরা কিছুদূর পর্য্যন্ত অকপটে সকলকেই বিশ্বাস করে, অন্যায়ের কথাটা খুলে

বল্‌তে কোনও শঙ্কা অনুভব করে না। যতদিন তাদের ন্যায়ান্যায়বোধটা আমাদের অনুরূপ না হয়, ততদিন এই ভাবটা প্রবল থাকে। কিন্তু অলক্ষ্যে কখন যে তারা শৈশবের অকপট ভাব ছেড়ে আত্মগোপনের আশ্রয় নেয়, তা অতি আত্মীয়েরাও অনেক সময়ে বুঝতে পারেন না। এই সময়ে যে আঘাতটা তাদের বিচারে অন্যায় বলে মনে হয়, তাকে তারা কিছুতেই ক্ষমা কর্‌তে পারে না। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষেই এ একটা সঙ্কট মুহূর্ত্ত।

তারপর অন্যায় কর্‌লে যে শাস্তি দেব, সেটা কোন্ ভাব প্রণোদিত হয়ে, তাও বিচার কর্‌তে হবে। ভবিষ্যতে আর অন্যায় কর্‌বে না, এই জন্য শাস্তি দেওয়া চলে কি না, তা বিচার সাপেক্ষ। এখানে সাবধান হতে না পার্‌লে শাসক ও শাসিত উভয়েরই ক্ষতি। উভয় ক্ষেত্রেই শাসিত বালক শাস্তিটা তুল্য ভাবেই ভোগ কর্‌বে বটে, কিন্তু শাস্তির ধারা অনুযায়ী শাসক ও শাসিতের মাঝে যে সমস্ত মনোবৃত্তির খেলা চল্‌বে, তার প্রভাব উভয়কেই স্পর্শ কর্‌বে। ভবিষ্যতের কথা ভাবলাম না, কেবল অন্যায় করেছে বলেই শাস্তি দিলাম—এটা হল প্রতিশোধ নেওয়ার মত। ছোট ছেলের ওপর "প্রতিশোধ নেওয়া" কথাটা খুব কটু শোনায় বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, অনেক সময়ে মা বাপের শাসনের মূলেও এই পশুভাবটাই প্রচ্ছন্ন থাকে। শাসকের মনে তার চেহারাটা সুস্পষ্ট নয় বলে সে এটাকে উপেক্ষা কর্‌তে পারে বটে, কিন্তু শাসিতের ক্ষুদ্র হৃদয়টী যে তারই বিষে জর্জ্জরিত হয়ে যায়, এ কথা বোঝে কয়জনা?

এ সম্বন্ধে একটা সহজ সূত্র এই বল্‌তে পারি, যেখানেই দেখব, শাসন কর্‌তে গিয়ে রাগ হয়ে গিয়েছে, সেখানেই বুঝব মূলে প্রতিশোধস্পৃহা জেগেছে—সে এখন যত সূক্ষ্ম আকারেই হোক্ না কেন। অবশ্য

সঙ্গত শাসন করতে গেলেও রাগ হয় বটে, কিন্তু সে রাগে শাসক আত্মহারা হয় না—সে যে রাগের অভিনয় করছে, এ কথাটা সে বেশ বুঝ্তে পারে। যেখানে ভবিষ্যতের বিচার নাই, কেবলমাত্র অতীতের অন্যায় ধরেই শাসন—সেখানে স্বরূপচ্যুতি না হয়েই যায় না। রুদ্ররসে শাসক প্রচুর পরিমাণে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন বটে, কিন্তু ন্যায্যের ওপর কয়গণ্ডা উপরিলাভ হল, শাসিতের অন্তর্যামী তার পাকা হিসাব রাখেন। শাস্তি অপরিমাণ হলেই সেটা অন্যায় হবে। তখন শাসিত বালক দোষী হওয়া সত্ত্বেও এই অন্যায়টা হজম করতে চাইবে না।

প্রতিশোধস্পৃহা কতরকম ছদ্মবেশে আস্তে পারে, তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সকলের মূলেই এক নিদান—স্বার্থের অপঘাত। শুধু বৈষয়িক স্বার্থই নয়—মানসিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি স্বার্থও আছে। এই ক্ষতির বেগটাও অনেক সময় নিরুপায় ছেলেপিলেকেই সইতে হয়। বল্তে পারি, প্রতিশোধস্পৃহার এগুলো হল তির্য্যক রূপ।

ভবিষ্যতে আর এমন কাজ করবে না, এই ভেবে যে শাসন করা সেটা মন্দের ভাল। শাসিতের হিত করবার ইচ্ছা শাসকের মনে সুস্পষ্ট হয়ে আগে এলে তার চিত্তস্থৈর্য্যের ব্যাঘাত হয় না এবং ফলে শাসনে ন্যায়বিচার হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী থাকে।

একটা বিষয়ে শাসকের বিশেষ নজর থাকা দরকার। অন্যায় দেখ্লে বা জান্লে তৎক্ষণাৎ উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়া মনুষ্য-মনের ধর্ম্ম। কিন্তু উত্তেজনাকে শাসনের বাহন করলে তো চল্বে না। এই জন্য অবিচলিত থেকে অন্যায় দেখ্‌বার—সইবার কথা বল্‌ছি না—অভ্যাস করা প্রত্যেক সুশাসকের পক্ষে অতি প্রয়োজন। তার পূর্ণ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হতে হবে। "ছেলে ভাল করব"—এই কামনাই হল শাসকের পক্ষে সেরা ওকালতী। কিন্তু এই অভিমানটুকু না

ছাড়্‌লে নির্ব্বিকার হওয়া যাবে না—অন্যায় দেখলে অন্তরে উত্তেজনা আসবেই এবং সে জন্য শাসনের মাত্রা ও ফলে তারতম্য হবেই হবে। অন্যায় ও অকল্যাণ দেখবামাত্র শিক্ষক আত্মসম্বরণ করুন, ইন্দ্রিয়গুলিকে শান্ত করে চিত্তকে আত্মসংস্থ করুন, তার পর অবিক্ষুব্ধ হয়ে বিচার করুন; এর মাঝে সত্যস্বরূপের প্রতি প্রপন্নভাব থাক্‌লে তিনিই অন্তর হতে নির্দ্দেশ করে দেবেন, কোথায় শাসন প্রয়োজন, কোথায় বা ক্ষমা প্রয়োজন। শাসন রুদ্রশক্তি; নিঃস্পৃহ হৃদয়ে সে শক্তিকে ধারণা না কর্‌তে পার্‌লে তার পরিচালনায় বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী—শক্তি সেখানে মোঘা। জিতেন্দ্রিয়ের শাসনই অমোঘ শাসন।

শাসনের প্রয়োজন হচ্ছে ব্যবহারের ক্ষেত্রে। একটা অ-দৃষ্ট শক্তি ছেলের মাঝে ক্রিয়া কর্‌ছে—ছেলের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সেটা ন্যায় বা অন্যায় দুইয়েরই বাইরে, কেননা তার মাঝে সেটা স্বভাবের প্রেরণা; সুতরাং তার জন্য তার কাছে জবাবদিহী চাওয়া বৃথা। শাসককে এই অদৃষ্টশক্তির সঙ্গে লড়তে হয়; ন্যায়ান্যায়বোধ-বর্জ্জিত বলেই এই শক্তির প্রকাশে আমাদের ক্ষুব্ধ হওয়া সাজে না; যদি কোথাও তার মাঝে অন্যায় দেখি, তাহলে ধীর স্থির হয়ে তার প্রতীকার কর্‌তে হবে; রাগের মাথায় ছেলে ঠ্যাঙালেই চল্‌বে না—শাসককে এই কথাটী মনে রাখতে হবে।

যেখানে বিচারবিমুক্ত স্বভাবের প্রেরণায় কাজ হয়, সেখানে আনুষঙ্গিক হৃদ্‌বৃত্তিগুলিও ঠিক স্বভাবের অনুকূলেই কাজ কর্‌বে—এটা সহজ বুদ্ধির কথা। এই জন্যই দেখি, পীড়নাত্মক শাসনের ফলটা দূর ভবিষ্যতে যত মধুময়ই হোক্ না কেন, প্রথমতঃ ছেলের মাঝে তা কেবল পীড়নজনিত সন্তাপটাই জাগিয়ে তোলে—সে কিছুতেই শাসনকে ন্যায্য পাওনা বলে স্বীকার কর্‌তে চায় না।

তীব্র কঠোরতায় শিশুমনের সুকুমার দেববৃত্তিগুলি নষ্ট হয়ে গিয়ে ভয়, কুটিলতা, প্রতিশোধস্পৃহা, অক্ষমতার ক্ষোভ, মিথ্যা আপ্যায়নের অভিনয় ইত্যাদি দানবীয় বৃত্তিগুলি প্রশ্রয় পায়। হয়ত পীড়নে একটা কু-অভ্যাস দূর হতে পারে, কিন্তু তার ফলে শিশুর কচি বুকে এতগুলি অশুভ শক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে যে তখন বাস্তবিকই সন্দেহ হয়, "তাড়নে বহবো গুণাঃ"—কথাটা ঠিক কিনা।

কিন্তু কঠোরতারও দরকার আছে; পশুশক্তিকে নিরস্ত কর্‌বার জন্য ওটা হচ্ছে প্রকৃতির সরাসরি উপায়। আমরাও তো প্রকৃতি-মাতার শিশু; শুধুই আদর পেলে দিব্যি গা ঢেলে দিয়ে জাহান্নামের পথে নেমে যেতে কোনও আপত্তিই নাই; মাঝে মাঝে দুটা-চারটা আঘাত পেলে তবে না একটু চেতনা হয়। তাই চেতনা জাগাতে হলে আঘাতেরও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে বৈ কি। তবে তার মাত্রা ঠিক রাখা হচ্ছে সুবিবেচনার কথা—দরদের কথা।

আবার আঘাতের ফলে প্রতিঘাত—এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমও তো দেখতে পাই। মা যদি ছেলেকে মেরে আধমরাও করে ফেলে, তবুও ছেলে মাকে জড়িয়ে ধরেই কাঁদে, একটু পরে চোখ মুছে আবার সেই মায়ের কাছে গিয়েই দাঁড়ায়। অথচ বাইরের কোনও লোক যদি ছেলের গায়ে একটু হাতও ছোঁয়ায়, ছেলে তা কিছুতেই ক্ষমা কর্‌তে পারে না। কেউ বলেন, এটা রক্তের টান। কিন্তু রক্তসম্পর্ক থাক্‌লেই যে এমন হয়, তাও বল্‌তে পারি না—খুঁজলে বিপরীত দৃষ্টান্ত ঢের পাওয়া যেতে পারে। তবে শৈশবের সংস্কারপ্রবলতাতে এমন হয়, এ কথা বল্‌তে পারি। মা ছাড়াও ছেলে অপরের ন্যাওটা হয়, শুধু শৈশব-সাহচর্য্যের ফলে।

এই সাহচর্য্যের প্রকৃতিটা একটু তলিয়ে বিচার কর্‌লে বুঝতে পারি, যেখানে আপন-জ্ঞান, সেখানেই সহিষ্ণুতা, সেইখানেই ক্ষমা। মাকে ছেলে আপন মনে করে, তাই তাঁর শাসন মুখ বুজে সহ্য করে; তোমাকে সে আপন মনে করে না, তাই তোমার শাসন সইতেও পারে না। মায়ের উপর ছেলের যতটা বিশ্বাস, অনাত্মীয় ব্যক্তিও যদি তাঁকে উপলক্ষ্য করে ছেলের মাঝে তেমনি ভাব জাগিয়ে দিতে পারেন, তবে তাঁরও শাসক হবার অধিকার জন্মাবে। এখন কি করে এই অধিকার পাওয়া যেতে পারে, তারই আলোচনা প্রয়োজন।

গোড়াতেই একটা কথা বলে রাখা ভাল, শিক্ষার মাঝে কোথাও মেকী চল্‌বে না; মা হতে গিয়ে শুধু মাতৃত্বের বাহ্য অভিনয় কর্‌লেই চল্‌বে না—ঠিক মায়ের দরদটা পাওয়া চাই। আর সমাজে হরঘড়ি আমরা যেমন ছাঁচের মা দেখ্‌তে পাই—যাদের স্নেহে তেজ নাই, কল্যাণ নাই—আছে শুধু মোহ আর মাদকতা—তেমন মায়ের আচরণ অনুকরণ কর্‌লেই ঠিক মা হওয়া যায় না। মা হতে হলে জগজ্জননীর অভিমান আন্‌তে হবে। একেবারে ছেলের স্থূল আবরণ হতে অন্তরের মজ্জাগত প্রকৃতিটা পর্য্যন্ত, তার জন্মজন্মান্তরীণ সুদূর সম্ভাব্যতা পর্য্যন্ত সবটুকু নজরে আনা চাই। এই ভাবের মননে সিদ্ধ হয়ে ব্যবহার-জগতে নাম্‌তে হবে—তবে ব্যবহারের সঙ্গতি রক্ষা হবে, শিক্ষা কল্যাণপ্রদ হবে।

প্রথমতঃ ছেলেদের হৃদয় জয় করা চাই। মা ছেলের হৃদয় জয় করেন কতকটা প্রকৃতির অনুকূলতায়, কতকটা বা নিঃসহায় অবস্থায় ছেলেকে আশ্রয় দিয়ে। আগের দিকে ভালবাসার প্রয়োজন মায়ের, শেষের দিকে প্রয়োজনটা ছেলের। এই শেষের দিকের কথাটাই

বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রকৃতির আনুকূল্য যে কোনও মায়ের পক্ষে যেমন সহজলভ্য, অপরের পক্ষে তেমনি সেটা অত্যন্ত দুর্লভ। যে পর্য্যন্ত মায়ের প্রকৃতি না পাবে, সে পর্য্যন্ত প্রকৃতিদত্ত শাসনাধিকার মিল্‌বে না—এটা হচ্ছে তপঃসিদ্ধির কথা; আর এ হলে শাসনতন্ত্রের ও শিক্ষানীতির সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে।

যদি ছেলের আশ্রয়স্থল হতে চাও, তবে প্রথমতঃ তার অভাবের অনুসন্ধান কর। সে কি চায় আর তুমিই বা তার কাছে কি চাও, এ দুটোই খুঁজে দেখ্‌তে হবে। সে যা চায়, তার দিকেই আগে দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে এবং তার অভাব পূরণের অন্তরালে ক্রমশঃ তোমার দাবীগুলিও আস্তে আস্তে সুকৌশলে এগিয়ে দিতে হবে।

ছেলেদের মাঝে ভাব কর্‌বার যে রীতি রয়েছে, তারই অনুবর্ত্তন করে শিক্ষককেও তাদের বিশ্বাস ও প্রীতি আকর্ষণ কর্‌তে হবে। ঠিক সমযোগ্য না হলে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই ছেলের দরদ পেতে হলে, তার অভাব বুঝ্‌তে হলে শিক্ষককেও ছেলের সঙ্গে ছেলে হতে হবে।

এইখানেই অনেকে তাল ঠিক রাখ্‌তে পারেন না। ছেলে হওয়াকে কেউ চপলতা মনে করে, নিজের গাম্ভীর্য্য বিসর্জ্জন দিতে নারাজ হন; কেউ বা অতিরিক্ত চপলতায় ছেলের মন ভুলাতে গিয়ে নিজকে হাল্কা করে ফেলেন। দুটাতেই বাড়াবাড়ি আছে। এস্থলে বিশেষ বিবেচনা করে মধ্যপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়।

ছেলের সঙ্গে ছেলে হওয়ার মাঝে যতটা বিপদ আমরা কল্পনা করি, বাস্তবিক ততটা বিপদ তার মাঝে নাই। প্রথমতঃ ছেলের সঙ্গে ছেলে হতে গেলেই যে একেবারে অধম ছেলে হতে হবে, এমন কোনও কথা নাই। হৃদয় বুঝবার জন্য সহানুভূতি বা মতানুবর্ত্তিতা

যেমন প্রয়োজন, তেমনি স্বাতন্ত্র্যও প্রয়োজন। ছেলেতে ছেলেতে যখন ভাব হয়, তখন কেউ তাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন কর্‌বার কল্পনা করে না;—স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখেই পরস্পর পরস্পরের মতানুবর্ত্তী হয়ে থাকে। শিক্ষককেও তেমনি নিজের স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখতে হবে। কেবল ছেলেকে ভোলাবার জন্য তার সব তাতেই আপন ইচ্ছা বলি দিলে চল্‌বে না। বরং এই স্বাতন্ত্র্যকে অবলম্বন করেই শিক্ষককে শিক্ষা দেওয়ার অবসর খুঁজে বের কর্‌তে হবে।

শিক্ষক যখন ছেলেদের দলে মিশবেন, তখন তিনি হবেন নেতা। এ কথা অবশ্য সকলে লক্ষ্য করছেন, ছেলেরা নেতার কতখানি ভক্ত। অতি ভাল ছেলেও নেতার ইঙ্গিতে তার বিবেকবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সুতরাং ছেলেদের মাঝে এই নেতৃভক্তিকে অবলম্বন করে তাদের হৃদয় জয় করবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। অথচ এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে, নিজের মাঝে স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি না থাকলে অপরের সুসহ স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করা কখনও সম্ভব নয়—নেতা ও অনুবর্ত্তীর সম্বন্ধ এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ছেলের দলে নেতা হতে হলে চাই তৎপরতা, উদ্ভাবনী শক্তি, আর চাই নিঃসংশয় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কাজ করা। সবাই বোধ হয় দেখেছেন, ছেলের দলে যে সব চেয়ে চট্‌পটে, যে নূতন নূতন ফন্দী বার কর্‌তে ওস্তাদ এবং যে নিঃসংশয়ে প্রভুত্ব কর্‌তে পটু, সে-ই নেতা হয়ে সবার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকে। যদি শিক্ষক এই তিনটী গুণের সাহায্যে ছেলেদের মাঝে একবার আধিপত্য স্থাপন কর্‌তে পারেন, তবে, তাঁর কাজ বহুদূর এগিয়ে গেল বল্‌তে হবে। তবে প্রথমতঃ উদ্ভাবনী শক্তি ও তৎপরতার পরিচয় দেওয়া

চাই। শিক্ষক ছাত্রদের চেয়ে বেশী ওস্তাদ—এই ধারণাটা একবার তাদের মাঝে বদ্ধমূল হয়ে গেলে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা কঠিন হয় না। কিন্তু সতর্ক থাক্‌তে হবে, দুর্জয় না করে যেন কেউ প্রভুত্ব না কর্‌তে যান।

আর এই আধিপত্য যখন কর্‌তে হবে, তখন চূড়ান্তভাবেই কর্‌তে হবে। একটু ইতস্ততঃ ভাব, লেশমাত্র সংশয় যদি কথায়-বার্ত্তায় চাল-চলনে প্রকাশ পায়, তবেই ছেলেদের নেতার ওপর শ্রদ্ধার ভাব শিথিল হয়ে যাবে। যাঁরা অতিরিক্ত সতর্কতায় পা গুণে গুণে ছেলের সঙ্গে চল্‌তে চাইবেন, তাঁরা বয়সের দরুণ একটা সম্ভ্রম তাদের কাছে পেতে পারেন, কিন্তু তাদের হৃদয় জয় কখনও কর্‌তে পারবেন না। অর্থাৎ তাঁদের চেয়ে তরুণ অথচ তৎপর ও নিঃসংশয় প্রকৃতির ব্যক্তির সঙ্গেই তাঁদের আত্মীয়তা বেশী হবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হবার কোনও সুযোগ না উপস্থিত হয়, এই দিকে শিক্ষকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিতে হবে। এ শুধু নেতৃত্বের প্রয়োজনে বল্‌ছি না—এটা শিক্ষার একটা মুলনীতি হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষকের কাছে অন্যায়ের ক্ষমা আছে, কিন্তু অবাধ্যতার ক্ষমা নাই—এই নীতিটী সর্ব্বদা অনুসরণ করে চল্‌তে হবে। এই জন্য ছেলে যাতে অবাধ্য হবার সুযোগ না পায়, কিম্বা অবাধ্য হলেও কোথায়ও তার ন্যায়সঙ্গত শাসন হতে রেহাই না পায়, এ দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। একদিনের অবাধ্যতার জেদ বজায় রেখে ছেলে যদি শিক্ষকের উপর জয়লাভ করে, তবে শিক্ষকের সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হয়ে গেল বল্‌তে হবে। এই জন্য আদেশ উপদেশের

সময় এ-ও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যে অন্যায় ব্যবহার দ্বারা শিক্ষক ছেলের চিত্তকে বিদ্রোহী করে তুলে তাকে অবাধ্য হবার অবকাশ না দেন। যা ছেলেদের কাছে রুচিকর নয়, এমন কাজও অনেক সময় তাদের দিয়ে করিয়ে নিতে হবে। এস্থলে কেবল রূঢ়তা করে ও ভয় দেখিয়ে তাদের মনুষ্যোচিত স্বাতন্ত্র্যবোধকে নষ্ট করে ফেল্‌লে আপাততঃ কাজের সুবিধা হলেও ভবিষ্যতে তারা নিস্তেজ ও নির্ব্বীর্য্য হয়ে যাবে। এইখানেই যথার্থ নেতৃত্বের পরিচয়—নেতাকে স্বীয় সম্মোহনশক্তির প্রভাবে অনুবর্ত্তীর চিত্তকে বশীভূত করে ফেল্‌তে হবে। এই সম্মোহন যাতে সফল হয়, একদিকে যেমন তার অনুকূল পারিপার্শ্বিক গড়ে তুল্‌তে হবে, অপরদিকে তেমনি নেতার ইচ্ছাশক্তির মাঝে অমোঘ বৈদ্যুতিক প্রেরণাও সঞ্চার কর্‌তে হবে।

জগতে সবাই শক্তির ভক্ত—বিশেষতঃ বালকদের তো কথাই নাই। এই শক্তি যদি উৎপীড়নে ব্যয়িত না হয়ে নেতৃত্বে ব্যয়িত হয়, তবে শাসন সম্পর্কে মস্ত বড় সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়। মা যে ছেলের আশ্রয়, তা এই শক্তিরই প্রকাশে। যে মা শক্তি পরিচালনা কর্‌তে পারেন না, তিনি ছেলেকে অফুরন্ত স্নেহ দিয়েও বশ কর্‌তে পারেন না। আবার যিনি এই শক্তির অযথা চালনা করে একে একটা আতঙ্কের ব্যাপার করে তোলেন, তিনিও সদ্‌বিবেচনার কাজ করেন না।

তাহলে মোট কথাটা দাঁড়ায় এই যে, বাইরে থেকেও ছেলের আশ্রয়স্বরূপ হয়ে যিনি তার হৃদয় জয় কর্‌তে চান, তাঁকে নেতৃত্ব-কৌশল শিখতে হবে। তারপর এই নেতৃত্বের পত্তন কর্‌তে হবে ছেলের অভাবের দিকে তাকিয়ে। ছেলেরা নিজের গরজেই কিছু না কিছু চায়। তাদের এই আপন ইচ্ছাটুকু খুসীমত খেলিয়ে

নেওয়াতেই হচ্ছে নেতৃত্বের ওস্তাদী। তাদের সু-ইচ্ছাগুলিকে যেমন সহজ আনন্দে পরিপুষ্ট কর্‌তে হবে, কু-ইচ্ছাগুলিকেও তেমনি সহজ আনন্দে দমন কর্‌তে হবে।

কিন্তু নায়কত্বের মাঝে শুধু ছেলের ইচ্ছাটাই তো সবখানি নয়, নায়কের নিজস্ব ইচ্ছাও তো একটা আছে। অনেকগুলি বৃত্তি আছে, যা নাকি ছেলের মাঝে স্ফুরিত হয়নি; অর্থাৎ সে সম্বন্ধে ছেলে কোনও অভাব অনুভব কর্‌ছে না। প্রশ্ন হচ্ছে, এই সমস্ত অভাব কি করে জাগানো যায়? এটা হল অভাবের মাঝে আচার্য্যের গরজের কথা, আর নেতৃত্বের অন্তরঙ্গ দিকটাই এর মাঝে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

এর দুটী উপায়ে হচ্ছে, ধৈর্য্য ও আত্মপ্রত্যয়। প্রথমতঃ ধৈর্য্যের কথাই বলি। যে বৃত্তিরই স্ফুরণ আমরা দেখতে চাই না কেন, তার ক্রমবিকাশের একটা ইতিহাস আছে। আমরা অনেক সময়ই তার পরিণত ভাবটাকেই আদর্শ মনে করে ছেলেদের মাঝে তাই ফুটিয়ে তুলতে চাই এবং হয়ত তদনুকূলে ব্যবস্থাও করি। কিন্তু আমি ছেলেদের কাছে যতটুকু দাবী কর্‌ছি, ততটুকু ওরা দিতে পারবে কিনা, কিম্বা সেই দাবীর জোরে যে বিধিব্যবস্থাগুলির প্রবর্ত্তন করলাম, সেগুলি ছেলেদের পক্ষে পীড়াদায়ক হবে কিনা, সেটা ধীরভাবে বিবেচনা কর্‌বার বিষয়। এ সম্বন্ধে একটা সহজ মীমাংসা এই দিক থেকে হতে পারে যে, প্রত্যেক মনোবৃত্তির একটা বহির্ব্যক্তিও আছে, যার উপর নাকি আমাদের আচারের ভিত্তি। বাইরে ভিতরে একটা যোগাযোগ আছে বলেই এ কথা আমরা বিশ্বাস করি, যেখানে স্বভাবতঃ মনোবৃত্তির উন্মেষ হয়নি, সেখানে তদনুকূল আচারের অনুশীলন করালে তা হতে বৃত্তিস্ফুরণ সম্ভব হতে পারে।

এই জন্ত শিক্ষার মাঝে আচারনিষ্ঠার একটা মুখ্য স্থান রাখা প্রয়োজন। কিন্তু তা বলে আচারের আড়ম্বর বা প্রাণহীনতা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। অনেক সময় যে আদর্শের মোহে আমরা শক্তি-অশক্তির কথা ভুলে যেতে পারি, এ কথাটা খেয়াল করতে হবে। আচারের মূলে যে ভাব রয়েছে, আচার্য্য তাতে তদ্‌গত হয়ে, স্বয়ং তাতে প্রতিষ্ঠ হয়ে তাঁর অন্তঃশক্তিপ্রভাবে ছেলেদের মাঝে আচারানুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুল্‌তে চেষ্টা কর্‌বেন এবং অশক্তির কথা স্মরণ রেখে আশা ও ধৈর্য্যের সহিত অতিব্যগ্রতাকে পরিহার করে মধ্যপথ অবলম্বন কর্‌বেন।

তারপর হচ্ছে আত্মপ্রত্যয়ের কথা। বল্‌তে পারি, নেতৃত্বের মাঝে যে সম্মোহনশক্তির প্রয়োজন, তার উৎসই হল সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। এই আত্মপ্রত্যয়বলে আচার্য্য আপনার মনোগত আদর্শকে যেমন অপরের মাঝে সফল করে তুল্‌তে পারেন, তেমনি কোথায়ও তার বিফলতা দেখলেও গম্ভীরবেদী হয়ে তা সয়ে যেতে পারেন। যেখানে মূলে একটা সত্যভাব মানুষের প্রাণের মাঝে সর্ব্বদা স্পন্দিত হচ্ছে, সেখানে অদৃষ্ট শক্তিও যে অনুকূল হবে—নিজের ভাবশুদ্ধির উপর এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাসও থাকা চাই। প্রাচীন কালে ঋষিরা অন্তরে সত্যকে অনুভব করে অপরকে তাই অনুভব করাবার ব্যাকুলতা নিয়ে যেমন উদাত্তকণ্ঠে ব্রহ্মচারীদের আহ্বান করে আন্‌তেন, তেমনি

আচার্য্য তাঁর বিদ্যাপীঠকে একটা সত্যভাবের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চাইবেন, প্রকৃতি কখনও তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতাকে বিপর্য্যস্ত কর্‌বেন না—ঠিক তাঁর ভাবের বাহন হবার যোগ্য যারা, তাদেরই তাঁর কাছে টেনে আন্‌বেন। নিজের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস না থাক্‌লে নিয়তির কাছে এই দাবী করা চলে না, তা আমরা জানি

এবং এ-ও জানি, আজকালকার প্রচলিত বিদ্যাপীঠে এই ভাবব্যূঢ় আত্মপ্রত্যয়ের একান্ত অভাব। জাতিকে জাগাতে হলে কেবল সংখ্যাবলে বলী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করলেই চলবে না—আত্মবলে বলী প্রতিষ্ঠানেরই মুখ্য প্রয়োজন।

ওঁ শ্রীগুর্ব্বর্পণমস্তু

শ্রীশ্রীনিগমানন্দের
জীবনী ও বাণী

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ডি, লিট (অন) কবিশেখর মহোদয় লিখিয়াছেন—

বহু গল্প, বহু উপন্যাস, বহু প্রবন্ধ আজকাল সপ্তাহে সপ্তাহে বঙ্গভাষার পাঠাগার অলঙ্কৃত করিতেছে ; কিন্তু একখানি নিগমানন্দের "জীবনী ও বাণী" পুস্তকে যে আনন্দ, যে উপদেশ, যে উপন্যাসের ন্যায় ঘটনাবৈচিত্র্য ও সারগর্ভ কথা পাইলাম, তাহা পূর্ব্বোক্ত শত শত রত্নমালার মধ্যে মধ্যমণিস্বরূপ। এই পুস্তকে যে সাধুকে দর্শন করিলাম, তাঁহাকে দেখিয়া সত্যই ঠাকুর দর্শনের পুণ্যলাভ হইল। যে সাধনা দেশ হইতে লুপ্ত প্রায়, এই পুস্তকে সেই সাধনার অমৃত-পথ দেখিতে পাইলাম। নিগমানন্দের বাণী দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের বাণীর মতই সরল, মর্ম্মস্পর্শী ও জীবন-পথ চিনাইবার পক্ষে আলোক-বর্ত্তিকা স্বরূপ। * * * এই বইখানি বাঙ্গালী গৃহস্থ মাত্রেরই ঘরে সযত্নে রাখার সামগ্রী। ইহা দেবমাল্যের মত পবিত্র, উৎকৃষ্ট কাব্যের মত রসোদ্দীপক এবং মধুচক্রের ন্যায় মধুর। প্রতি সন্ধ্যায় গৃহস্থ যদি পুত্রকন্যাগণ লইয়া সশ্রদ্ধভাবে ইহার দুই এক অধ্যায় পাঠ করেন, তবে তাঁহার গৃহের বায়ু নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইবে।

প্রবর্ত্তক—* * জিজ্ঞাসু মন এবং শ্রদ্ধাবান্ ইহাতে তৃপ্ত হইবে, অপ্রাকৃত সাধন-পথের পথিক যাঁরা, তাঁরা এই পুণ্যগ্রন্থে সন্নিবদ্ধ সদ্গুরুর দিব্য দর্শন ও অনুভূতিলব্ধ বাণীর মাঝে আলো ও সঙ্কেত পাইবেন। * *

আনন্দ বাজার পত্রিকা—* * * এই সুলিখিত ও সুখপাঠ্য পুস্তকখানি অধ্যাত্মরসপিপাসুদিগকে যথেষ্ট শান্তি দিবে।

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ উপদেশামৃত

ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয় দাস বাবাজী মহারাজ-পরিচালিত ত্রৈমাসিক পত্র সুদর্শন বলেন—

কালধর্ম্মে মহাপুরুষদের পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইলেও তাঁহাদের সিদ্ধ জীবনের অলৌকিক কাহিনী ও উপদেশামৃত একদিকে যেমন এই নশ্বর জগতে তাঁহাদিগকে অবিনশ্বর করিয়া রাখে, অন্যদিকে আবার ত্রিতাপে তাপিত নরনারীর জন্য অমৃতের সন্ধান দিয়া থাকে। বাংলার জাতীয় জীবন আজ চরম দুর্দ্দশায় উপনীত। মৃতপ্রায় এই অভিশপ্ত জাতিকে বাঁচাইতে হইলে, পাশ্চাত্য রাজনীতির কোন ইজ্‌মের দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে না। ভারতীয় জাতির মূল প্রেরণা আধ্যাত্মিকতা। অতএব আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা লইয়াই জাতিকে বাঁচাইতে হইবে। শ্রীশ্রীনিগমানন্দ উপদেশামৃত এইরূপ একখানা গ্রন্থ, যাহা হইতে আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা আমরা শুধু ব্যষ্টি জীবনে নহে, সমষ্টি জীবনেও পাইতে পারি। মনোরম ভাষায় ও অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে এই সকল উপদেশ বলা হইয়াছে। গ্রন্থ পাঠে কর্ম্মী কর্ম্মের প্রেরণায়, জ্ঞানী জ্ঞানের মহিমায় উদ্দীপিত হইবে এবং প্রেমিক ভগবৎপ্রেমের অপূর্ব্ব আস্বাদ লাভ করিবেন। প্রবাসী, গৃহী ও সন্ন্যাসীর আদর্শের কথা যেমন ইহাতে বলা হইয়াছে, আবার সমাজ-সংস্কারক এবং রাষ্ট্রনেতাও তাঁহাদের চলার পথের নির্দ্দেশ ইহাতে দেখিতে পাইবেন। অতএব এইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির নিত্য-পাঠ,—নিত্য-সঙ্গী হইবার উপযুক্ত বলিয়া বলা যাইতে পারে।